জাপানের ইতিহাস

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

এম. এ. (ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ডি. ফিল

প্রফেসার, ইতিহাস বিভাগ,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

কলকাতা-৭০০০৭৩

JAPANER ITIHAS (Bengali)
(History of Japan)
by Dr. Haraprasad Chattopadhaya

প্রথম প্রকাশ : ৩০শে জানুয়ারী ১৯৫৮

প্রকাশক :
এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

সরকার প্রদত্ত কাগজে মুদ্রিত

মুদ্রক :
শ্রীশঙ্করনারায়ণ হাজরা
মিতালী প্রিন্টার্স
৩৫, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৫

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শৈলেন নন্দী

সর্ববন্ধন-মুক্তা মাতৃদেবী
সরলা বালা চট্টোপাধ্যায়-এর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে
নিবেদিত।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

1. Sepoy Mutiny (1857), a social study and analysis
2. Indians in Africa, a socio-economic study
3. Indians in Sri Lanka, a historical study
4. Internal migration in India, a case-study of Bengal—In publishable form—publication undertaken by the History Department, Calcutta University

প্রথমেই বলে রাখি, 'জাপানের ইতিহাস' আমার কোন গবেষণা-প্রসূত গ্রন্থ নয়। দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের জাপানের ইতিহাস পড়াবার সুযোগ পেয়েছি। পাঠন কালে তাদের যত না তথ্য দিয়েছি, স্বয়ং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি ততোধিক। সেই অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ।

অধুনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাতৃভাষায় ইতিহাস আলোচনার লক্ষ্যণীয় প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই প্রবণতাকে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থটি রচনা করতে প্রবৃত্ত হই। একথা অনস্বীকার্য যে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে যত ভাবই গ্রহণ করি না কেন তাতে মনের ঠিক মত পুষ্টি সাধন হয় না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: 'এমন রোগী দেখা যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্ত আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্ত্তি করে, দেহ পুর্ত্তি করে না।' তাই আমাদের মাতৃভাষার রসনা দিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যাতে জাপানের ইতিহাসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পায়, তজ্জন্য অবসর গ্রহণের প্রাক্‌কালে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আধুনিক ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের এম. এ. পাঠ্যক্রম অনুসারে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। বি. এ. 'অনার্স'-এর ছাত্রছাত্রীদের নিকট ও গ্রন্থটি উপযোগী হবে।

গ্রন্থটি রচনায় ও প্রকাশনায় বন্ধুবর শ্রীমুরারি ঘোষের সহায়তা স্মরণ করি। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। অধ্যাপক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে সাহায্য পেয়েছি নানাভাবে। তিনি আমার অনুজতুল্য। তাঁর শুভ কামনা করি। সর্বশেষে 'এ. মুখার্জি' এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটি প্রকাশনার গুরু দায়িত্ব বহন করতে সম্মত হওয়ায় এবং স্বল্পকালের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত করায় আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

হোক্কাইডো দ্বীপ
ওটারু
সাপ্পোরো
হাকোদাতে
ভ্লাডিভোস্টক
আওমোরি
জাপান সাগর
সেনদাই
নীগাতা
মিতো
টোকিও
ফুজি পর্বত
ইয়োকোহামা
নাগোয়া
কামাকুরা
কোরিয়া
কিয়োটো
নারা
ইজুমো
কোবে
ওসাকা
ইসে
শিজুয়োকা
সুশিমা
হিরোশিমা
ইয়মাটো
শিমোনোসেকী
ফুকুওকা
শিকোকু
প্রশান্ত মহাসাগর
নাগাসাকী
কিয়ণ্ড
সাৎসুমা
কাগোশিমা
০
৫০
১৫০
২৫০
মাইল

কামচাটকা
শাখালীন
বাইকাল
মঙ্গোলিয়া
মানচুরিয়া
মানচুকুয়ো
অন্তঃ মঙ্গোলিয়া
ইথেল
মুকডেন
পিকিং বেজিং
লিয়াওটুং
পেনিনসুলা
পোর্ট আর্থার
কোরিয়া
সিওয়ুল
পুশান
টোকিও
জাপান সাগর
পীত নদী
হশিংটাও
চীন
নানকিং
হানকৌ
সাংহাই
ওকিনাওয়া
পেশকাডোরেস
ক্যানটন
হংকং
তাইওয়ান
(ফরমোসা)
ফিলিপিন দ্বীপ

সূচনা

জাপান এশিয়া মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। কত লক্ষ বৎসর পূর্বে, কে জানে কোন্ জন্মলগ্নে, প্রকৃতির কি খেয়ালে, প্রশান্তমহাসাগরের গভীরতম তলদেশ থেকে জাপান উত্থিত হয়েছিল, দূরপ্রাচ্যের তথা বিশ্বের ইতিহাস রচনায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। জাপান দেশ একটি দ্বীপপুঞ্জ। হোক্কাইডো (Hokkaido), হনশু (Honshu), শিকোকু (Shikoku), এবং ক্যুশু (Kyushu)—এই চারটি বৃহৎ দ্বীপ এবং সংলগ্ন-প্রায় সহস্রাধিক[১] ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্র দ্বীপ সমবেতভাবে জাপান দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত। জাপান চতুর্দিকে জলবেষ্টিত। জাপান-সাগর এবং পূর্ব-চীন সাগর জাপানকে এশীয় ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে। জাপান জাপান-সাগরকে বেষ্টন ক'রে আছে অর্ধচন্দ্রাকারে, 'যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।' জাপানের এই ভৌগোলিক অবস্থান ও বিচ্ছিন্নতা জাপানের ভাবীকালের ইতিহাসকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত ক'রেছে।

বর্তমানে (অক্টোবর, ১৯৮০) জাপান দ্বীপপুঞ্জের স্থলভূমির মোট পরিমাণ ৩,৭৭,৭০৮ বর্গ কিলোমিটার বা ১,৪৫,৮০০ বর্গমাইল।[১] এই স্থলভূমির কিঞ্চিদূর্ধ্ব ৭০ শতাংশ পর্বতময়, ১৫ শতাংশ চাষের উপযোগী এবং ১৮ শতাংশ বাসোপযোগী।[২] বাস-যোগ্য স্থানের অনুপাতে জন-সংখ্যা অত্যধিক। বর্তমানে (১৯৮০) জাপান দ্বীপপুঞ্জের মোট জনসংখ্যা ১১৭ মিলিয়ন।[৩] জন-সংখ্যার দিক থেকে জাপান বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম সপ্তম দেশ হিসাবে চিহ্নিত। যদিও জাপানের জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ২'৬ শতাংশ তথাপি জাপানের স্থলভাগ বিশ্বের স্থলভাগের মাত্র ০'২৭ শতাংশ।[৫] ফলে জাপানে গড়পরতা জনসংখ্যার ঘনত্ব এক বর্গমিটারে ৩১৪ অথচ সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার ঘনত্ব এক বর্গমিটারে মাত্র ৩১।[৬] জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বিশ্বের মধ্যে জাপানের স্থান চতুর্থ।[৭]

(১) মোট সংখ্যা ৩৯১৮। Time, special Issue, August 1, 1983 p. 19 দ্রষ্টব্য
(২) Kodansha Encyclopœdia of Japan (1980), Vol. 4, p. 2. দ্রষ্টব্য।
(৩) Time. তদেব।
(৪) Kodansha Encylo., তদেব। Vol. 6, p. 222 (৫) তদেব (৬) তদেব (৭) তদেব

এশিয়ার প্রান্তবাসী জাপানী জাতির কিংবদন্তিতে জাপানের দেব উৎপত্তির কথা প্রচলিত আছে। এই কিংবদন্তি অনুযায়ী জাপানের সম্রাট-বংশ সূর্য্য দেবী থেকে উৎপন্ন। (জাপানীরা সূর্যকে দেবীরূপে কল্পনা করেন।) স্বর্গ ও মর্ত সৃষ্ট হবার পর অনেকগুলি দেবতা মর্তে আবির্ভূত হন। তন্মধ্যে ছিলেন ইজানাগী (Izanagi no Mikoto) নামে এক দেবপুরুষ এবং ইজানামী (Izanami no Mikoto) নামে এক দেবী। কোন এক সময় যখন তাঁরা দুখণ্ড মেঘের সঙ্গে সংলগ্ন স্বর্গের এক ভাসমান সেতুর উপর দণ্ডায়মান ছিলেন তখন ইজানাগী তাঁর হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্রভাগ নিম্নস্থিত তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। সমুদ্র তৎক্ষণাৎ দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং ওনোকোরোজিমা[৮] নামে এক দ্বীপের উৎপত্তি হয়। অতঃপর দণ্ডটি সমুদ্র থেকে উত্তোলনের সময় দণ্ড থেকে চতুর্দিকে জল ঝরে পড়তে থাকে। যেখানে যেখানে জলবিন্দু পড়ে, সেইসব স্থানে এক একটি দ্বীপের উৎপত্তি হয়। জাপানীদের বিশ্বাস, এই ভাবেই সহস্রাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি হয় এবং জাপান দ্বীপপুঞ্জ গড়ে ওঠে। ইজানাগী ও ইজানামী ওনোকোরোজিমা দ্বীপে অবতরণ করেন এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। কালক্রমে তাঁরা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন।[৯] তাঁদের প্রথম সন্তান জাপান এবং সর্বকনিষ্ঠ সন্তান অগ্নিদেব। অগ্নিদেবের জন্মের পর ইজানামীর মৃত্যু হয়। শোক-কাতর ইজানাগী তখন পত্নীর উদ্ধারের জন্য পাতালপুরীতে[১০]প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি তাঁকে মৃত্যুর করাল কবলে এক বীভৎস আকারে দেখতে পান। লজ্জিতা পত্নী তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করতে ইজানাগীকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যখন ইজানাগী সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না তখন ইজানামী এবং যমপুরীর আরও আশীটি বীভৎস আকৃতির নারীমূর্তি সক্রোধে ইজানাগীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। ইজানাগী তখন প্রাণভয়ে আক্রমণকারিণীদের যমপুরী থেকে নির্গমনের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে স্বয়ং যমপুরী ত্যাগ করেন এবং কোনরূপে স্বীয় প্রাণরক্ষা করেন। এইভাবে জাপানী কিংবদন্তি অনুযায়ী মর্ত ও যমালয়ের পৃথক অবস্থান নিরূপিত[১১] হয়। অতঃপর যমপুরীর সংস্পর্শ হেতু অপবিত্রতা থেকে নিজকে শুদ্ধ করবার জন্য ইজানাগী নদীর জলে শরীর প্রক্ষালনে অগ্রসর হন। প্রক্ষালনের সময় তাঁর নাসিকা থেকে ঝড়ের দেবতা সুসানো মিকাটো, বামনেত্র

(৮) Onokorojima, Kodansha Encyclo. তদেব। Vol. 3, p. 364

(৯) কিংবদন্তিতে এরূপ বর্ণনা আছে যে ইজানাগী ও ইজানামী সম্পর্কে ভ্রাতা-ভগিনী ছিলেন। দ্রষ্টব্য রমেশনাথ ঘোষ, দাঁড়ে সুদূর জাপান (১৩২২ সাল)

(১০) Yomi no Kuni. Encyclo. তদেব। Vol. 3, p. 364 (১১) তদেব।

থেকে সূর্যদেবী অমতেরাশু ওমিকামি এবং দক্ষিণ নেত্র থেকে চন্দ্রমা দেবীর উৎপত্তি হয়।[১২] এই পুত্র ও কন্যাদ্বয়ের উপর যথাক্রমে সমুদ্র, দিবা ও রাত্রির শাসনের ভার অর্পিত হয়। কালক্রমে ঝড়ের দেবতা ও সূর্যদেবীর মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ফলে সূর্যদেবী সাময়িকভাবে এক গুহামধ্যে অন্তর্হিতা হন এবং সমগ্র জাপান অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। তখন অপরাপর দেবতাগণের সুকৌশলে সূর্যদেবীর পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং জাপান তমসা-মুক্ত হয়। জাপানী জীবনে এর গুরুত্ব হচ্ছে এই যে ঝড় ধ্বংসের প্রতীক এবং সূর্য-কিরণ প্রাণ-দায়ক। ঝড়ের প্রকোপ থেকে উদ্ধার পেতে হলে সূর্যদ্যুতি প্রয়োজন। অন্যথায় দেশে অজ্ঞানতার তমসা-বিস্তার এবং শস্যহানি অনিবার্য। তাই প্রাচীন জাপানে ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল সূর্য-দেবীর আরাধনা।

কিংবদন্তির পরবর্তী এক পর্যায়ে দেখা যায় যে সূর্যদেবী তাঁর পৌত্রকে জাপানের শাসনকর্তা রূপে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রেছেন। পৌত্রটি ক্যুশুর অন্তর্গত তাকাচিহো (Takachiho) পর্বতের শিখর দেশে অবতরণ ক'রে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। অবতরণের সময় তিনি সঙ্গে আনেন একটি দর্পণ, একটি তলোয়ার এবং এক ছড়া মাণিক্যের মালা। এই দর্পণ, তলোয়ার ও মালা আজও নাকি জাপানের রাজপ্রাসাদে সযত্নে রক্ষিত আছে। জাপানী রাজবংশে এগুলি জ্ঞান, বীর্য ও সহৃদয়তা গুণরাজির প্রতীকরূপে গণ্য। সূর্যদেবীর উক্ত পৌত্রের প্রপৌত্র ছিলেন জিম্মু, যিনি কিংবদন্তি অনুসারে জাপানের সর্বপ্রথম সম্রাট হিসাবে স্বীকৃত। জাপানী প্রবাদে জিম্মু বা জিম্মু টেন্নো (Jimmu Tenno) ৬৬০ খৃষ্টপূর্বাব্দে জাপানের রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রাজধানী স্থাপিত হয় কিয়োটোর (Kiyoto) দক্ষিণে ইয়ামটো (Yamato) প্রদেশে। এই তারিখ অনুসারে জাপান সরকার ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জাপানী রাজবংশের ২৬১০তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপিত করেন মহাসমারোহে।

জাপানীদের দুটি প্রাচীনতম গ্রন্থ কোজিকি (Kojiki, Record of Ancient Matters) এবং নিহন শোকি (Nihon Shoki, Chronicles of Japan)। কোজিকি রচিত হয় ৭১২ খৃষ্টাব্দে এবং নিহন শোকি, ৭২০ খৃষ্টাব্দে। এই দুইটি গ্রন্থে উপরোক্ত কিংবদন্তি লিপিবদ্ধ আছে। এদের কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে কি না, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা সংশয়মুক্ত নন। স্যার জর্জ স্যানসমের মতে উভয় গ্রন্থই হচ্ছে কতকটা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত

(১২) Susa-no-o-no-Mikoto. Amaterasu Omikami—J. W, Hall, Japan from pre-history to modern times, (Tuttle edition 8th printing 1978) P. 27, Richard storry, A history of modern Japan (Pelican) p. 25 মন্মথনাথ ঘোষ, তদেব

রচনা। এ দুটিতে কিংবদন্তি, প্রবাদ, এবং ইতিহাস এমন সুকৌশলে নির্বাচিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে জাপানী রাজবংশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।[১৩]

জাপানীদের পূর্বপুরুষ নির্ধারণে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। জাপানের আদিম অধিবাসী হিসাবে যারা পরিগণিত—যেমন ইয়ামতো (Yamato) এবং আয়নু (Ainu)—তারা যে জাপানী জাতির পূর্বপুরুষ ছিলেননা, এ বিষয়ে বর্তমানে কোন তর্ক ওঠেনা। জাপানী কিংবদন্তি অনুসারে যখন সম্রাট জিম্মু টেম্নোর প্রপিতামহ স্বর্গ থেকে তাকাচিহো পর্বতে অবতরণ করেন তখন জাপানে ইয়ামতো জাতির প্রাধান্য ছিল। বর্তমানে ইয়ামতো জাতির কোন অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। অনেকের ধারণা, ইয়ামতো নয়, খর্বকায় ও সর্বাঙ্গ-লোমাবৃত আয়নু জাতিই ছিল প্রকৃত পক্ষে জাপানের আদিম অধিবাসী। এদের মুখের ছাঁদ ককেশীয়। দৈহিক গঠনে এরা জাপানী থেকে স্বতন্ত্র। এরা অসভ্য এবং দেখতে বদর্য। ক্ষয়িষ্ণু আয়নু জাতি স্বল্প সংখ্যায় আজও হয়ত জীবিত থাকতে পারে হোক্কাইডো দ্বীপে। জাপানীদের সঙ্গে এদের কোন কালে বিবাহাদি সামাজিক সংযোগ ছিল না। 'কোরো-পক গুরু'[১৪] নামে অপর এক আদিম আধিবাসীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রকায় এই আদিম অধিবাসীর বসতি ছিল সম্ভবতঃ ইয়েজো-তে (Yezo)। বর্তমানে এরা নিশ্চিহ্ন।

উল্লিখিত আদিম অধিবাসীদের কেউই জাপানীদের পূর্বপুরুষ ছিল না। মূলতঃ কোন একটি বিশেষ জাতি জাপানীদের পূর্বপুরুষ ছিল, এমন কথা কেউই বলেন না। জাপানীরা মিশ্র জাতি। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চীন, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি এশীয় অঞ্চল থেকে এসে যে সব আগন্তুক জাপানে বসতি স্থাপন করে তারাই জাপানী জাতির পূর্বপুরুষ বলে পরিগণিত। এই সব এশীয় আগন্তুক জাপানে বসবাসকালে কালক্রমে জাপানী জাতির সঙ্গে এক দেহে লীন হয়ে যায়। জাপানীদের পূর্বপুরুষ মঙ্গোলিয়া থেকেও এসেছিল ব'লে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন। আবার, জাপানীরা যে খাস মঙ্গোলীয় নয়—এ মতবাদও প্রচলিত। জাপানীদের বিশ্বাস, তাদের সঙ্গে আর্য রক্তেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :[১৫] 'জাপানিদের মধ্যে মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয় দুই ছাঁদেরই

মুখ দেখতে পাই, এবং ওদের মধ্যে বর্ণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। আমার চিত্রকর বন্ধু টাইক্কানকে বাঙালি কাপড় পরিয়ে দিলে তাঁকে কেউ জাপানি ব'লে সন্দেহ করবে না। এমন আরো অনেককে দেখেছি।' প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন:[১৬] 'তারা (জাপানীরা) এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা ক'রেও আপনার রক্তের অবিমিশ্রতা নিয়ে গর্ব করে—জাপানের মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানিদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রণ হয়েছে, এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেছি এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। শুধু তাই নয়, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি কিন্তু জাপানীরা এই ঋণ স্বীকার ক'রতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। বস্তুত ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে, ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে, সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েছে। যে জাতির মধ্যে চলন-ধর্ম প্রবল, সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ ক'রে নিতে পারে। যার মন স্থবির, বাইরের জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে, কারণ তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বোঝা।'

প্রাচীনকালে জাপানে যুগপৎ তিনটি ধর্ম প্রচলিত ছিল—শিন্তো, বৌদ্ধ ও কনফিউশিয়ান ধর্ম। শিন্তো ধর্ম বা পূর্বপুরুষের উপাসনা জাপানীদের আদিম ধর্মরূপে পরিগণিত। এই ধর্ম সংস্কারমূলক, আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম জাপানী সম্রাটকে এবং জাপানী পূর্বপুরুষদের দেবতা জ্ঞানে মান্য করে। তাই প্রথম সম্রাট জিম্মু শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত নামে পরিচিত নন, তাঁর পূর্ণ পরিচয় জিম্মু টেন্নো নামে (টেন্নো—Tenno-শব্দের অর্থ দিব্য সম্রাট)। শিন্তো ধর্মের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুদেবতাবাদ। প্রাচীন জাপানীরা বহুদেবদেবীর (যথা সূর্যদেবী, অগ্নি দেবতা, বৃষ্টির দেবতা, ভূমিকম্পের দেবতা) তথা প্রেত এবং অলৌকিক শক্তির পূজা করতেন। এই ধরনের একাধিক দেবদেবীর ও অলৌকিক শক্তির পূজাকে জাপানীরা বলতেন কামি-র (Kami) উপাসনা। 'কামি' শব্দের অর্থ দেবতা বা অলৌকিক শক্তি। তাই শিন্তো ধর্মের অপর নাম কামি-র পথ (Way of kami বা way of god)। আবার, যেহেতু শিন্তো ধর্ম জাপানী পূর্বপুরুষ ও জাপানী সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রেরণা দেয়, সেই কারণে শিন্তো ধর্মের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে ইহা জাপানী জাতির মধ্যে দেশপ্রেম জাগরণের সহায়ক, স্বদেশানুরাগকে সুতীব্র ক'রে তোলবার উপায়।

---

(১৬) তদেব, ৯৪

আনুমানিক খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠশতকের মধ্যভাগে জাপানে বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত হয়। রক্ষণশীল শিন্তোধর্মাবলম্বীদের উপেক্ষা এবং প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম স্বল্পকালের মধ্যে জাপানে অন্যতম প্রধান ধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ভগবান বুদ্ধের বাণী জাপানে প্রচারিত হয় প্রত্যক্ষভাবে চীন থেকে কিংবা পরোক্ষভাবে চীনের মাধ্যমে কোরিয়া থেকে। স্বয়ং জাপানী সম্রাট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয়। ফলে শিন্তো তার প্রাধান্য হারায় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয় না। তোকুগাওয়া শোগুনদের শাসনাবসানে মেজীযুগের অভ্যুদয়ে শিন্তো পুনরায় হৃত গৌরব ফিরে পায় এবং রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে পুনরায় স্বীকৃত হয়।

প্রাচীন চীনের গৌরব কনফিউসিয়াস (Confucius, খৃষ্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯) ছিলেন একাধারে ধর্মপ্রচারক ও বাস্তবধর্মী রাজনীতিক। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ধর্মপ্রচারক আখ্যা না দিয়ে নীতিপ্রচারকরূপে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত। তিনি চীন জাতিকে তথা বিশ্ববাসীকে উপহার দেন অতীব উচ্চমানের কতকগুলি নৈতিক নিয়মাবলী। তিনি মনুষ্য চরিত্রে প্রধানতঃ পাঁচটি নৈতিকগুণের অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যথা দানশীলতা, পবিত্রতা, জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা এবং বিশ্বস্ততা, যেমন ভারতের মৌর্য সম্রাট অশোক মৌর্য তাঁর প্রচারিত 'ধম্মে' (ধর্মে) গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনুরূপ কতকগুলি ধর্মীয় বা নৈতিক নীতির অনুশীলনের উপর, যথা, দয়া, দানে, (দান) সচে (সত্যবাদিতা), সোচয়ে (শুচিতা), মাদবে (নম্রতা), বহু কয়াণে (বহু কল্যাণ) এবং অপ-আসিনবে (ভ্রষ্টতা থেকে বিরতি)। চীনের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রানুসারে রাজার সঙ্গে প্রজার, পিতার সঙ্গে পুত্রের স্বামীর সঙ্গে সহধর্মিণীর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কনিষ্ঠের এবং বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে পরস্পর কিরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত সে সবও কনফিউসিয়াস অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা ক'রে তাঁর পাণ্ডিত্যের তথা মানবিকতাবোধের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন সম্রাট অশোকের ধর্মেও অনুরূপ কতকগুলি আচরণবিধির নির্দেশ পাওয়া যায়, যথা অভিহিংসা ভূতানাম্ (প্রাণীদের প্রতি অহিংসা) মাতরি পিতরি শুশ্রূষা (পিতা-মাতার সেবা), থৈরা শুশ্রূষা (গুরুজনের সেবা), গুরূণাম্ অপচিতি (গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা), মিত—সংস্তুত—নাতিকানম্ বম্ভন সমনানাম্ দানং সংপটিপতি (বন্ধুবান্ধব, পরিচিত ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন তথা ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ-সন্ন্যাসীদের প্রতি উদারতা এবং সুসঙ্গত আচরণ প্রদর্শন। কনফিউসিয়ান ধর্ম বৌদ্ধধর্মের মত চীন এবং কোরিয়ার মাধ্যমে জাপানে প্রচারিত হয়।

শিন্তো, বৌদ্ধ এবং কনফিউসিয়ান ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও জাপানীরা মূলতঃ কর্তব্যের উপর দেশপ্রেমকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। অনেক বিদেশী পর্যটক বৌদ্ধধর্মের প্রতি জাপানীদের অনুরাগ দেখে এক সুপ্রসিদ্ধ জাপানী

পুরোহিতকে একদা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'মহাশয়, যদি বুদ্ধদেব স্বয়ং সেনাপতি হয়ে জাপান আক্রমণ করেন, তা হলে আপনারা কি করবেন?' প্রত্যুত্তরে পুরোহিত মহাশয় নাকি বলেছিলেন—'তাহলে বুদ্ধদেবের শিরচ্ছেদ ক'রে মুণ্ড দিয়ে জন্মভূমির পূজা করব।'[17] রুশ-জাপান যুদ্ধকালের কথা (১৯০৪—৫)। কোন এক জাপানী বৃদ্ধার একমাত্র যুবক সন্তানকে যুদ্ধে যোগদান করতে আহ্বান করা হলে সে তার মায়ের নিকট গিয়ে কাতরস্বরে নিবেদন করে যে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে নিঃসহায় অবস্থায় রেখে যুদ্ধে যোগদান করতে তার মন সায় দিচ্ছে না। সেই সঙ্গে যুবকটি জানতে চায় এক্ষেত্রে তার করণীয় কি। বৃদ্ধা মাতা কোন উত্তর না দিয়ে কক্ষান্তরে প্রবেশ করেন এবং পুত্রের নামে একটি চিঠি লিখে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করেন। ইত্যবসরে যুবকপুত্রটি তার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে যা দেখতে পান তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে যায়। বৃদ্ধার শেষ চিঠিতে যা লেখা ছিল তার মর্মকথা এইরূপ:[18] বৎস, তোমার মাতৃভক্তি প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই কিন্তু তোমার মন অতি ক্ষুদ্র দেখে আমি মর্মব্যথা পেয়ে আত্মহত্যা করলাম। তুমি জগতেএক নগণ্যা বৃদ্ধার জন্য তোমার ও তোমার পূর্ব-পুরুষদের এবং তোমার দেশস্থ সকলের অর্চনীয়া জন্মভূমিকে তুচ্ছজ্ঞান করছ। ধিক, তোমাদের বংশে, আর ধিক তোমার গর্ভধারিণীকে।

জাপান সভ্যতার প্রথম স্বাদ পায় চীনের কাছ থেকে। জাপান চৈনিক সভ্যতায় দীক্ষিত হয় খৃষ্টাব্দ সপ্তম-অষ্টম শতকে। স্যার জর্জ স্যানসমের[19] মতে, জাপান ঐ শতকে সর্বপ্রথম চীনের উচ্চতর সংস্কৃতি সম্পর্কে সজাগ হয়। আরনোল্ড টয়েনবীর (Arnold Toynbee)[20] সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, জাপান উচ্চতর সভ্যতার মঞ্চে প্রবেশ পথ পায় চীনের অভিভাবকতায়। উভয় ঐতিহাসিকেরই বিবেচনায় জাপান চীনের সভ্যতার আদর্শে অভিভূত হ'য়ে চীনকে অনুকরণ করে এবং কালক্রমে চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার প্রয়াস পায়। চীনের সংস্পর্শে এসে জাপান সর্বপ্রথম জানতে পারে ব্রোঞ্জ ও লোহের ব্যবহার, লিখন-প্রণালী, এবং ৫৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ চৈনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন তথা বৌদ্ধতত্ত্ব। জাপান চীনের শিক্ষানবীশ হয়েছিল স্বেচ্ছায়, বাহিরের কোন চাপে নয়, যেমন চাপ এসেছিল প্রাচীন বৃটেনের উপর রোমক ও নরম্যান শাসকদের নিকট থেকে। জাপান কিন্তু চীনকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে নি। চীনের নিকট থেকে জাপান যা কিছু গ্রহণ করেছিল তার

---

(১৭) মন্মথনাথ ঘোষ, সুপ্ত জাপান তদেব পৃ-৬৮
(১৮) মন্মথনাথ ঘোষ, নব্য জাপান, পৃ ৬২-৬৩
(১৯) Hall, তদেব, পৃ ৩৫
(২০) তদেব

সবটাই জাপান সম্পূর্ণরূপে আপন সম্পত্তি ক'রে নিয়েছিল, নিতে পেরেছিল। জাপানের মানস-প্রকৃতির মধ্যে যে প্রবল চলন-ধর্ম আছে তারই প্রাবল্যে চীন, কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিকট থেকে পাওয়া সভ্যতার সমস্ত উপকরণ জাপান অতি সহজেই আত্মসাৎ করতে পেরেছিল। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে প্রাথমিকভাবে চীন থেকে পাওয়া শাসন-প্রণালী, সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি তথা বৌদ্ধধর্ম জাপান তার সুবিধামত আপন ছাঁচে ঢেলে নিয়েছিল, খৃষ্টজন্মের নবম শতকের শেষের দিকে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাপানের রাজনৈতিক জীবনধারা অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম সম্রাট জিম্মু টেন্নোর উত্তরাধিকারীদের রাজধানী কিয়োটোর রাজপ্রাসাদে বন্দীপ্রায় অবস্থায় থাকাকালীন রাজনৈতিক চক্রান্তের অনুকূল আবহাওয়ায় দেশে সামরিক একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়। এই একনায়কতন্ত্রের সর্বপ্রথম নায়ক ছিলেন মিনামোটো জোরিটোমো (Minamoto Yoritomo), যিনি ১১৯২ খৃষ্টাব্দে ভূষিত হন শোগুন (Shogun) উপাধিতে। তখন সম্রাট ছিলেন গো-টোবা (Go-Toba)। এইভাবে প্রবর্তিত শোগুন-শাসনের স্থায়িত্বকাল ছিল ১১৯২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৬০৩ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত যাঁরা শোগুন উপাধিতে পরিচিত ছিলেন তাঁরা টোকুগাওয়া (Tokugawa) বংশীয়। টোকুগাওয়া শোগুনদের শাসনকাল ছিল নানা দিক থেকে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। এই কালে, বিশেষতঃ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে, জাপান বহির্জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন-প্রায় অবস্থায় থাকে, দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সর্বোপরি, ১৮৫৩—৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে কমোডোর পেরি (Commodore Perry) এসে জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক তথা রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই পেরি মিশনের প্রতিক্রিয়ায় একদিকে যেমন জাপানের বিচ্ছিন্ন জীবনের অবসান হয়, অন্যদিকে তেমনি শোগুন-শাসনের অবলুপ্তি ত্বরান্বিত হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ সাক্ষ্য হয়ে থাকে প্রায় সাত শত বছরের শোগুন শাসনের নাটকীয় পরিসমাপ্তির। জাপানের সর্বশেষ শোগুন ছিলেন যোশিনোবু (yoshinobu) অথবা কেকি (Keiki)। উক্ত বৎসরে তিনি পদত্যাগ করেন এবং পরের বৎসর তৎকালীন জাপানী সম্রাট মুৎসুহিতো-র (Mutsuhito) রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কিয়োটো থেকে এডো (Edo) তে (বর্তমান টোকিও)। জাপানের ইতিহাসে শুরু হয় এক নবযুগ, প্রসিদ্ধ মেজী যুগ (Meiji Era), যার স্থায়িত্বকাল ছিল ১৮৬৭—৬৮ খৃঃ থেকে ১৯১২ খৃঃ পর্যন্ত। শেষোক্ত বৎসরে সম্রাট মুৎসুহিতোর মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে অবসান হয় মেজীযুগেরও। মুৎসুহিতোর উত্তরাধিকারী যোশিহিতোর (yoshihito) রাজত্বকাল (১৯১২-

২৬) তাইশো যুগ (Taisho Era) নামে পরিচিত। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে য়োশিহিতোর মৃত্যু হলে সম্রাট হন হিরোহিতো, যাঁর রাজত্বকালে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনাচক্রে এই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে পরাজিত হয়ে সামরিক-ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধিকার ভুক্ত হয় (American Occupation)। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে জাপান যুক্তরাষ্ট্রের শাসন থেকে মুক্তিলাভ ক'রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রহিসাবে নতুন যাত্রা শুরু করে। জাপানের এ যাত্রাপথ তার দুর্নিবার অগ্রগতির রাজপথ।

প্রথম অধ্যায়

শোগ্‌ন যুগের উৎপত্তি

জাপানী পুরাণ অনুসারে, জাপানের প্রথম সম্রাট জিম্মু ছিলেন সূর্য-বংশোদ্ভূত। তাই তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতেন দৈব অধিকারে। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক নেতা ও ধর্মীয় গুরু, একাধারে সিজার এবং পোপ। তাঁর মৃত্যুর পর যাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁরাও দৈব অধিকারেই রাজত্ব ক'রে গেছেন।[১] জাপানীরাও তাঁদের সম্রাটের উপর দেবত্ব আরোপ ক'রে তাঁকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে দেশের সর্বময় অধীশ্বর হিসাবে মান্য করতেন। কিন্তু কালক্রমে জাপানী সম্রাটের দেশের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে, ক্ষমতা-লোলুপ কয়েকটি বংশের চক্রান্তে। এই সব বংশের বসতি ছিল রাজধানী কিয়োটোতে। এরা ছিল নিষ্কর জমির মালিক এবং এদের অধীনে থাকত যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বহু প্রজা ও অনুচর। এতদ্ব্যতীত এই সব বংশ সম্রাট-বিরোধী প্রচারেও বিরত ছিল না। তাদের বক্তব্য, সম্রাটের যখন দেব-অংশে জন্ম তখন তাঁর পক্ষে রাজকার্যপরিচালনা-রূপ জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত না থেকে নিজের তথা দেশবাসীর আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য রাজপ্রাসাদে আধ্যাত্মিক চিন্তায় কালাতিপাত করাই শোভন এবং যুক্তিযুক্ত। এই সব বংশ যে 'স্ট্র্যাটিজি' অবলম্বন ক'রে রাজক্ষমতা হরণে অগ্রসর হয় তা ছিল সম্রাটকে সিংহাসনে বহাল রেখে সুকৌশলে তাঁর অধিকার থেকে দেশের প্রকৃত শাসনভার ছিনিয়ে নেওয়া এবং সেইসঙ্গে সম্রাট যাতে রাজপ্রাসাদে অত্যধিক বিলাস-বাসনের মধ্যে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে জটিল রাজকার্য-পরিচালনায় ক্রমশ বিমুখ হন সেদিকে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এইরূপ একটি বংশের নাম ছিল সোগা (Soga)। এই বংশ জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যুবরাজ শোতোকু তাইশি-কে (Shotoku Taishi) সমর্থন করে এবং ফলে যুবরাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। [যুবরাজ হলেও প্রকৃতপক্ষে

---

(১) ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত নূতন জাপানী সংবিধান অনুসারে জাপানী সম্রাটের দৈব উৎপত্তির কিংবদন্তি আর বর্তমানে স্বীকৃত হয় না।

শোতোকুই দেশ শাসন করতেন।] তাঁর আত্মীয়া সম্রাজ্ঞী সুইকো (Empress Suiko) নাম-মাত্র রাজত্ব করতেন। ৬২১ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ৬২২ খৃষ্টাব্দে) শোতোকুর মৃত্যু হলে সোগা বংশ রাজক্ষমতা অধিকারে সচেষ্ট হয়, কিন্তু অপর একটি ক্ষমতালোলুপ বংশের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে অবৈধভাবে রাজক্ষমতা অধিকারের প্রয়াস ত্যাগ করতে বাধ্য হয। তখন ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ। ক্ষমতা দখলের আসরে এই প্রতিদ্বন্দ্বী বংশের নাম ফুজিয়ারা Fujiwara)। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এই বংশের নেতৃত্ব দেন ফুজিয়ারা কামাতারি (Fujiwara Kamatari)। প্রাক্ মেজী যুগে জাপানের ইতিহাসে কামাতারি 'একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং চৈনিক সভ্যতা ও শাসনতন্ত্রের গুণগ্রাহী। চীনের কেন্দ্রীয় শাসনপ্রণালীর আদর্শে তিনি জাপানেও অনুরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত করেন। প্রায় চারশত বৎসর ব্যাপী এই শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে, যদিও মধ্যে মধ্যে তার কিছুটা সংশোধিত হয়। এই দীর্ঘকাল জাপানেব প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে কামাতারির বংশধরদের হাতে। রাজবংশের বাইরে এই ফুজিয়ারা বংশই তখন ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ফুজিয়ারা বংশের আধিপত্যকালে খৃষ্টজন্মের অষ্টমশতকের গোড়ার দিকে বৌদ্ধ-প্রধান নারা নগরে রাজধানী স্থাপিত হয। পরে, ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় হেইযান-ক্যো (Heian-kyo) শহরে, যা বর্তমানে কিযোটো নামে পরিচিত। তখন জাপানেব সম্রাট ছিলেন কাম্মু (Kammu)। তাঁর রাজত্বকাল বিস্তৃত ছিল ৭৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৭৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে (যখন হেইয়ান-ক্যো শহরে রাজধানী স্থাপিত হয়) ১১৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কাল তা জাপানের ইতিহাসে হেইয়ান যুগ (Heian period) নামে পরিচিত। এই যুগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে সেকালে জাপানে প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্রাটের হাত থেকে ফুজিয়ারা বংশের অধিকারে আসে। ফলে, একদিকে যেমন সম্রাট ক্রমশঃ ক্ষমতাবিহীন শোভাবর্ধক রাষ্ট্রপ্রধানে পরিণত হন, অন্যদিকে তেমনি ফুজিয়ারা বংশের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হেইয়ান যুগ ফুজিয়ারা বংশের উত্থান ও পতন উভয়েরই স্বাক্ষীস্বরূপ। ফুজিয়ারা বংশের পতনে মিনামোটো (Minamoto) বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন ১১৮৫ খৃষ্টাব্দ।

ফুজিয়ারা বংশের ক্ষমতাচ্যুতির কারণ কি ? ফুজিয়ারা বংশ রাজবংশের মত দৈব উৎপত্তির দাবী করত। সেই সুবাদে ফুজিয়ারা বংশ রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ছিল ফুজিয়ারা নেতাদের হাতে রাজবংশের উপর প্রত্যক্ষ অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কৌশল। কোন ফুজিয়ারা নেতার ভাবী উত্তরাধিকারিণী কন্যাসন্তান বিবাহযোগ্যা হলে তাঁর বিবাহ দেওয়া হত তৎকালীন সম্রাটের সঙ্গে, যিনি-

স্বাভাবিক কারণেই তরুণ বয়স্ক হতেন। তাঁদের প্রথম পুত্রসন্তানের জন্মের পর পুত্রটি নাবালক থাকাকালেই সম্রাটকে তার অনুকূলে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হত। সম্রাটের পদত্যাগের বয়স ছিল গড়ে ৩১ বৎসর। সম্রাট পদত্যাগ করলেই বা পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেই নাবালক পুত্রটি উত্তরাধিকারসূত্রে রাজমুকুট ধারণ করতেন এবং তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হতেন ফুজিয়ারা বংশজ অগ্রগণ্য নেতা। এইভাবে শুধুমাত্র সিংহাসনে আরোহণ ব্যতীত আর সকল রকম রাজকীয় অধিকার ও ক্ষমতা রাজপ্রতিনিধির করায়ত্ত হত। ফলে সম্রাট পরিণত হতেন নাম-মাত্র রাষ্ট্রপ্রধানে, আর প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হত ফুজিয়ারা বংশ। নাবালক সম্রাট সাবালকত্ব অর্জন ক'রে প্রায় ৩১ বৎসর বয়স্ক হলেই তাঁকেও একই পদ্ধতিতে রাজপদ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হত। এইভাবে অক্ষুণ্ণ থাকত সিংহাসনের উপর ফুজিয়ারা বংশের প্রভাব। এতদ্ব্যতীত রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাসের মধ্যে থেকে সম্রাট যাতে অচিরে অকর্মণ্য ও মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েন সেদিকেও ফুজিয়ারা নেতারা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাসের দুর্বার মোহ যতই সম্রাটকে আচ্ছন্ন করত দিনের পর দিন, ততই ফুজিয়ারা নেতাদের রাজক্ষমতা গ্রাসের সুবর্ণ সুযোগ ত্বরান্বিত হত। এইভাবে নীতিহীন পন্থা অবলম্বন ক'রে ফুজিয়ারা বংশ জাপানের রাজনীতিতে প্রতিপত্তির চরমশিখরে ওঠে, ৯৬৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এইকালে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন মিচিনাগা (Michinaga)। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরব্যাপী—যে কালে আটজন নাম-মাত্র সম্রাট সিংহাসনারূঢ় হন—তিনি ক্ষমতার উচ্চাসনে আসীন থাকেন। অবশেষে ফুজিয়ারা বংশের রাজনৈতিক জীবনে সুদিনের অবসান আসন্ন হয়। রাজধানী কিয়োটোতে ফুজিয়ারা নেতৃবৃন্দের বাসস্থান ছিল প্রাসাদোপম। সেখানে নিজেদের ভোগবিলাসের সরঞ্জামের কোন অভাব ছিল না। ফলে তাঁরাও ধীরে ধীরে ভোগাসক্ত হয়ে প্রশাসনিক কার্যে ক্রমশঃ শিথিল ও অযোগ্য হয়ে পড়েন। শুরু হয় নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। ফুজিয়ারা নেতারাই প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হতেন। কিন্তু এইসব প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্ব স্ব ভার-প্রাপ্ত প্রদেশের প্রধান কর্মকেন্দ্রে উপস্থিত না থেকে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই রাজধানীতেই ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে পছন্দ করতেন। জীবনধারায় এরূপ প্রবণতার অনিবার্য পরিণতি হয় প্রদেশে অরাজকতা সৃষ্টি, রাজস্ব অনাদায় এবং ঘাটতি বাজেট। উপরন্তু প্রাদেশিক শাসনভার ক্রমশঃ ফুজিয়ারাবংশ-বহির্ভূত স্থানীয় নেতাদের অধিকারভুক্ত হয়, যাঁরা সুযোগ বুঝে বহু নিষ্কর ভূসম্পত্তি জবরদখল করেন। এই সব নিষ্কর জমির মালিকেরাই পরবর্তীকালে ডাইমিয়ো (Daimyo) বা জমিদার নামে পরিচিত হন। কালক্রমে তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

তাঁরা যুদ্ধ-নিপুণ অনুচর নিয়োগ করতে থাকেন। এইভাবে গঠিত হয় সামন্ত সৈন্য (Feudal army)। নিষ্কর সম্পত্তির জবরদখলকারী এই সব জমিদার দুটি গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন, যথা টেইরা (Taira) এবং মিনামোটো (Minamoto)। মিনামোটো গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি ছিল বর্তমান টোকিওর সন্নিকটস্থ কান্টো (Kanto) অঞ্চলে আর টেইরার আধিপত্য ছিল 'Inland Sea'এর উপকূলবর্তী প্রদেশসমূহে। ফুজিয়ারা নেতৃবৃন্দ তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় উক্ত দুটি সামরিক শক্তিসম্পন্ন জমিদার-গোষ্ঠী থেকে সামরিক সাহায্য পান। ফুজিয়ারা নেতাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয় তখন তাঁরা টেইরা ও মিনামোটোর জমিদারদের সামরিক সাহায্যের উপর পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নির্ভরশীল হন। ফুজিয়ারা বংশীয় বিবদমান শিবির-ভুক্ত নেতাদের গৃহযুদ্ধ উভয় পক্ষকেই সর্বস্বান্ত করে। ফলে দেশের প্রকৃত শাসনভার টেইরা গোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত হয়। এইভাবে ফুজিয়ারা বংশের রাজনৈতিক আধিপত্যের অবসান ঘটে।

'নেমিসিসে'র (Nemesis বা প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী) হাত থেকে ফুজিয়ারা বংশ শেষ অবধি নিষ্কৃতি পেল না। টেইরা গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্যও অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, বিপক্ষ মিনামোটো গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে। অচিরাৎ শুরু হয় টেইরা ও মিনামোটোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব (Gempei war) চলেছিল ১১৮০ থেকে ১১৮৫ পর্যন্ত। কান্টো-তে শুরু হয়ে এই যুদ্ধ বিস্তৃত হয় মধ্য ও পশ্চিম জাপানে। অবশেষে ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে শিমোনোসেকি প্রণালীতে (Shimonoseki straits) ডান-নো-উরা-য় (Dan-no-ura) এক জলযুদ্ধে মিনামোটো গোষ্ঠী জোরিটোমো-র (Yoritomo) নেতৃত্বে টেইরাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ক'রে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। তখন সম্রাট ছিলেন নাবালক আনতোকু (Antoku)। যুদ্ধ চলাকালীন টেইরা নৌবাহিনী তাঁকে বলপ্রয়োগে যুদ্ধস্থলে নিয়ে গেলে জলমগ্ন হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ডান-নো-উরার যুদ্ধে সাফল্যের পর জোরিটোমো দেশের কার্যতঃ প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে স্বীকৃত হন। তাঁর কর্ম-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় কামাকুরা-তে (Kamakura) যেখানে তিনি তাঁর সামরিক শাসন প্রবর্তিত করেন। এই শাসনই পরিচিত হয় বাকুফু নামে (Bakufu)। কথিত আছে, মিনামোটো গোষ্ঠী যাঁর নেতৃত্বে ডান-নো-উরা-র যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে জোরিটোমো ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর অনুজ জোসিৎশুনে (Yoshitsune)। জোসিৎশুনে জাপানের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট চরিত্র। পরে তিনি জোরিটোমোর অনুচরবর্গের হাতে প্রাণ হারান। টেইরা-মিনামোটোর পাঁচ বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধ জাপানী মানসপটে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এই গৃহযুদ্ধের কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হয় বহু

উপাখ্যান এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-যোগ্য নাটক। এই যুদ্ধ চলাকালীনই সর্বপ্রথম সামুরাই শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

ডান-নো-উরার যুদ্ধের পর কামাকুরা বাকুফুর অধিনায়ক মিনামোটো জোরিটোমো সম্রাটের কাছ থেকে এক নূতন খেতাব পাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পিত খেতাবের নাম শোগুন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ত্রয়োদশ বর্ষীয় সম্রাট গো-টোবা মিনামোটো জোরিটোমোর অনুরোধে তাঁকে শোগুন উপাধিতে ভূষিত করেন। শোগুন অর্থে সম্রাটের অধীন প্রধান সেনাপতি বা সামরিক অধিনায়ক (Generalissimo)। এইভাবে শুরু হয় শোগুনযুগ, যার স্থায়িত্বকাল ছিল ১১৯২ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত। মিনামোটো জোরিটোমো সর্বপ্রথম শোগুন, আর শোগুন যুগের অবসান ঘটে শোগুন যোশিনোবুর পদত্যাগের সঙ্গে। ১২ই অগাষ্ট ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্লাইভের নেতৃত্বে যেমন অনায়াসে সমসাময়িক মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী আদায় করেছিলেন, তেমনি সহজেই অথবা সহজতর পন্থাতে মিনামোটো জোরিটোমো জাপানী সম্রাট গো-টোবাকে প্রভাবান্বিত ক'রে শোগুন উপাধি আদায় ক'রে নেন। সূচিত হয় দ্বৈত-শাসন (Double or Dual Government)—কিয়োটোতে সম্রাটের বেসামরিক শাসন, আর কামাকুরায় (পরে এডোতে) শোগুনের সামরিক শাসন। আইনতঃ সম্রাট থাকলেন কায়া, এবং শোগুন ছায়া। কিন্তু কার্যতঃ সম্রাট হলেন ছায়া এবং শোগুন কায়া। 'The swan...float double, swan and shadow.

কিয়োটোতে প্রতিষ্ঠিত হল স্বয়ং সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে গঠিত সরকার (De jure government), আর কামাকুরায় শোগুন কর্তৃক গঠিত হল সম্রাট—বিরোধী সরকার (De facto government), যেমন ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে তথা ভারতের মারাঠা ইতিহাসে নজির পাওয়া যায় 'ডি জুরে' এবং 'ডি ফ্যাক্টো' সরকারের যুগপৎ অস্তিত্বের। ইউরোপের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে একদিকে ছিল মেরোভিঞ্জিয়ান রাজপদ (ডি জুরে), অপর দিকে কেরোলিঞ্জিয়ান মেয়র অব প্যালেস (ডি ফ্যাক্টো) অথবা ভারতের মারাঠা ইতিহাসে একদিকে ছিল মারাঠা ছত্রপতি (ডি জুরে), অপরদিকে মারাঠা পেশোবা (ডি ফ্যাক্টো)।

জিম্মু টেন্নো-বংশীয় সম্রাটদের শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব, ফুজিয়ারা বংশের সম্রাট-বিরোধী চক্রান্ত তথা ফুজিয়ারা শাসনকালে দেশে অরাজকতা এবং রাজনৈতিক ঐক্যের একান্ত অভাব, টেয়ারা-মিনামোটো সংঘর্ষ—সব কিছু মিলিতভাবে দ্বাদশ শতকের শেষ দশকে দেশে এমন এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটা সুদূর-

প্রসারী পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। মিনামোটো জোরিটোমোর আবির্ভাব এবং নেতৃত্ব এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে এবং দেশে ঐক্য এবং শান্তিশৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শোগুন শাসনের গোড়া-পত্তন করে।

মিনামোটো জোরিটোমো এবং তাঁর বংশধরেরা ১১৯২ থেকে ১১৯৯ পর্যন্ত শোগুন হিসাবে দেশ শাসন করেন। তারপর হোজো (Hojo) বংশের হাতে শাসন-ভার অর্পিত হয়। হোজো বংশীয়গণ অবশ্য স্বয়ং শোগুন উপাধি গ্রহণ না ক'রে মিনামোটো জোরিটোমোর বংশধরদের প্রতিনিধি (Regent বা shikken) হিসাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন ১১৯৯ থেকে ১৩৩৩ পর্যন্ত। হোজো শাসনকালে মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খান (Kublai Khan) দুইবার জাপান আক্রমণ করেন, প্রথমতঃ ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়-বার ১২৮১ খৃষ্টাব্দে। দুইবারই মোঙ্গলদের জাপান আক্রমণ ব্যর্থ হলেও হোজো প্রতিনিধি দেশবাসীর চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হন। মোঙ্গল আক্রমণের পর হোজোবংশের শাসন কিছুকাল প্রচলিত থাকে। ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন হোজোবংশীয় শোগুন-প্রতিনিধি সম্রাট গো-ডাইগো কে (Go-Daigo) সিংহাসনচ্যুত ক'রে নির্বাসিত করেন। সম্রাট গো-ডাইগো শোগুন-শাসন উচ্ছেদ ক'রে প্রাক্-শোগুন জাপানে সম্রাটের যে প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল তা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। পরিণামে তিনি ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন-চ্যুত হয়ে নির্বাসিত হন। কিন্তু দুই বৎসর পর তিনি হোজো শিবির থেকে দলত্যাগীদের সাহায্যে সিংহাসন পুনরধিকার করেন। ফলে শেষ হোজো-প্রতিনিধি সপরিবারে এবং প্রায় আটশত অনুচর সহ আত্মহত্যা (হরকিরি, hara-kiri) করেন। এই ঘটনার স্বল্পকাল মধ্যে মিনামোটো বংশোদ্ভূত নেতা আশিকাগা তাকাউজি (Ashikaga Takauji) গো-ডাইগো কে ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন থেকে অপসারিত ক'রে জিম্যোয়িন (Jimyoin) বংশীয় কাম্যোকে (Komyo) নূতন সম্রাট হিসাবে বরণ করেন। তারপর ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কোম্যোও আশিকাগাকে শোগুন উপাধিতে ভূষিত করেন।

আশিকাগা এবং তাঁর বংশধরেরা শোগুন হিসাবে দেশ শাসন করেন ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৭৩ পর্যন্ত। আশিকাগা শোগুনেরা তাঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন কিয়োটোর অন্তর্গত মুরোমাচি (Muromachi) জেলায়। এই কারণে তাঁদের শাসনকাল মুরোমাচি যুগ নামে পরিচিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা সত্ত্বেও এই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে তথা শিল্পকলার ও বিকাশ ঘটে। আশিকাগা শোগুনদের মধ্যে যোশিমিৎসু (Yoshimitsu, 1358–1408) এবং যোশিমাসা (Yoshimasa 1445–1490) সৌন্দর্য-বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আশিকাগা শাসনের শেষের দিকে দেশে শান্তি-শৃংখলার অবনতি ঘটে এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্যেরও অভাব দেখা যায়। শান্তি-শৃংখলা ও রাজনৈতিক ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্য এই সময় তিনজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সামরিক নেতার আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা হলেন ওডা নোবুনাগা (Oda Nobunaga, 1534—82), টোয়োটোমি হিডেযোশি (Toyotomi Hideyoshi, 1536—98) এবং টোকুগাওয়া ইয়েযাসু (Tokugawa Ieyasu, 1542—161)। এই তিন নেতার সম্পর্কে কথিত আছে যে নোবুনাগা প্রস্তরখনি থেকে প্রস্তর উত্তোলন করেন, হিডেয়োশি উত্তোলিত প্রস্তরগুলিকে আকৃতিবিশিষ্ট করেন এবং ইয়েযাসু সেগুলিকে যথাস্থানে স্থাপন করেন। এইভাবে নোবুনাগা ও হিডেযোশীর আরব্ধ কার্য ইয়েযাসুর হস্তে সমপূর্ণতা লাভ করে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এবং কার্যসিদ্ধির পদ্ধতিতে কিন্তু তাঁরা ছিলেন বিসদৃশ। জাপানীদের মধ্যে এই বিসদৃশ-সূচক একটি সুবিদিত গল্প প্রচলিত আছে। একদা উক্ত নেতা তিনজন একটি পাখী দেখতে পেয়ে তার গান শুনতে আগ্রহী হন। পাখীটি গান গাইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করায় নোবুনাগা উত্তেজিত হয়ে পাখীটিকে নিহত করবার সংকল্প গ্রহণ করেন, হিডেযোশি জেদ ধরেন যে পাখীটিকে গান শোনাতেই হবে এবং ইয়েযাসু স্থির করেন যে পাখীটি গান না গাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করবেন।[২] তিনজনই ছিলেন ডাইমিয়ো শ্রেণীভুক্ত। নোবুনাগা তাঁর হঠকারিতার জন্য তাঁরই এক সমর্থক কর্তৃক নিহত হন। হিডেযোশির জেদের বশে কোরিয়া আক্রমণ তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ হয়। ইয়েযাসুর ধৈর্য তাঁকে টোকুগাওয়া শোগুন-শাসনের স্থায়িত্বার গৌরব দান করে। তিনজনই সামরিক আধিপত্য স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। নোবুনাগা ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে আশিকাগা শোগুন যোশিয়াকি-কে (Yoshiaki) কিয়োটো থেকে অপসারিত ক'রে আশিকাগা শোগুন-শাসনের অবসান ঘটান এবং কিয়োটোতে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কিন্তু শোগুন উপাধি গ্রহণ করতে পারেন নি, কারণ ইতিমধ্যে-অনুমোদিত প্রথা অনুযায়ী শোগুন উপাধিধারীকে মিনামিটো বংশোদ্ভূত হতে হবে অথচ নোবুনাগা ছিলেন টৈরারা বংশ-জাত। নোবুনাগা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এক বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি কর্তৃক নিহত হন। তখন তাঁর অধীনস্থ সেনাপতি হিডেযোশি সর্বময় কর্তৃত্বলাভের সুযোগ পান। দেশে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে তিনি ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ডাইমিয়ো শ্রেণীকে স্বীয় অধীনে আনতে অগ্রসর

(২) Richard Storry, তদেব পৃ ৪৬

হন। তখন জাপানে সত্তরটি[৩] প্রধান প্রধান ডাইমিয়ো সংঘটন ছিল, যথা হোজো (Hojo), টাকেডা (Takeda), উয়েসুগি (Uesugi), টোকুগাওয়া (Tokugowa), মোরি (Mori), চোসোকাবে (Chosokabe), ওটোমো (Otomo), র্যুজোজি (Ryuzoji) এবং শিমাজু (Shimazu)। এদের মধ্যে উয়েসুগি, টোকুগাওয়া এবং মোরি ডাইমিয়ো শ্রেণীগুলি ছিল হিডেযোশির মিত্রপক্ষীয়। সুতরাং হিডেযোশী অবশিষ্ট ছয়টি ডাইমিয়ো গোষ্ঠীর আনুগত্যের স্বীকৃতি আদায়ে সচেষ্ট হন। শেষ অবধি তাঁরা সকলেই হিডেযোশির আধিপত্য স্বীকার করেন। ফলে হিডেযোশির নেতৃত্বে দেশে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। সম্রাট যথারীতি সিংহাসনে আরূঢ় থাকেন এবং সম্রাটের নামেই হিডেযোশি প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করেন। তিনি নোবুনাগার মত স্বয়ং শোগুন উপাধি গ্রহণ করতে পারেন নি, যেহেতু তিনিও মিনামোটো বংশোদ্ভূত ছিলেন না। সম্রাট তাঁকে কামপাকু (Kampaku, civil dictator) উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া আক্রমণকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর অধীনস্থ সেনাপতি ছিলেন টোকুগাওয়া বংশীয় ইয়েযাসু। তিনি ২১শে অক্টোবর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে বিপক্ষ দলকে সেকিগাহারা (Sekigahara) যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে দেশের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন সম্রাট তাঁকে শোগুন উপাধিতে ভূষিত করেন: শুরু হয় টোকুগাওয়া যুগ, যার স্থায়িত্বকাল বিস্তৃত ছিল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

(৩) Hall, Japan পৃ: ১৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

টোকুগাওয়া যুগ—(১৬০৩-১৮৬৭)—প্রশাসন, সমাজ ও অর্থনীতি
—শোগুন শাসনের অবসান।

প্রশাসন :

টোকুগাওয়া যুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাকুফু, মতান্তরে বাকুফু হান (Bakufu Han), নামে পরিচিত ছিল। বাকুফু শব্দের অর্থ শোগুনের সামরিক শাসন-ব্যবস্থা, আর হান শব্দের অর্থ ডাইমিয়োর জমিদারী (ফিউডাল ডোমেন)। টোকুগাওয়া যুগে শোগুন তথা ডাইমিয়ো উভয়ই বিদ্যমান থাকায় টোকুগাওয়া যুগের শাসনব্যবস্থাকে বাকুফু হান আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মিকাডো বা সম্রাট :

টোকুগাওয়া যুগে শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানে ছিলেন মিকাডো বা সম্রাট। সম্রাট ছিলেন রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতীক। তাঁর নামেই দেশ শাসিত হত। তবে, দ্বাদশ শতকের শেষ দশকে শোগুনের আবির্ভাবের পূর্বে সম্রাট যেমন তত্ত্বগতভাবে এবং কার্যতঃ উভয়দিক থেকেই শাসনক্ষেত্রে সর্বেসর্বা ছিলেন, শোগুন-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর, বিশেষতঃ টোকুগাওয়া-বংশীয় শোগুনের শাসন-ক্ষমতা প্রাপ্তির পর, সম্রাট আর কার্যতঃ প্রশাসনিক প্রধান থাকেন না। সম্রাট প্রধান থাকেন কেবলমাত্র তত্ত্বগতভাবে, আর কার্যতঃ প্রধান প্রশাসনিকের দায়িত্ব পান শোগুন। একটি অট্টালিকায় পোর্টিকোর (শোভাবর্ধক বারান্দা) যে প্রয়োজন অথবা একটি চার-চক্র-বিশিষ্ট গাড়ীতে পঞ্চম চক্রের যে সার্থকতা, শোগুন শাসন প্রণালীতে সম্রাটেরও ছিল প্রায় অনুরূপ প্রয়োজন ও সার্থকতা অর্থাৎ শোগুন শাসনব্যবস্থায় সম্রাট পরিণত হন একটি ক্ষমতাবিহীন শোভাবর্ধক অঙ্গমাত্রে। সম্রাট প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হলেও জাপানী জাতির শ্রদ্ধা ও সম্মান থেকে বঞ্চিত হন নি। 'সূর্যদেবীর' বংশোদ্ভূত সম্রাটের আসন ছিল জাপানী জাতির অন্তরের মণিকোঠায়। টোকুগাওয়া শোগুনেরাও তাদের শাসনকালের গোড়ার দিকে সম্রাটকে একেবারে অবহেলা না ক'রে তাঁর কাছে তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তাদির অনুমোদন প্রার্থনা করতেন।

সম্রাটও স্বীয় অসহায় অবস্থা উপলব্ধি ক'রে প্রার্থিত অনুমোদন দানে কদাপি অসম্মত হতেন না। কালক্রমে টোকুগাওয়া শোগুনেরা সম্রাটের সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করেই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় সম্রাটকে কিয়োটো রাজপ্রাসাদে প্রায় বন্দী-জীবন যাপন করতে হত। সম্রাটের রাজপ্রাসাদের বাইরে আসা কিংবা কারও পক্ষে রাজপ্রাসাদে সম্রাটের দর্শন পাওয়া ছিল শোগুন-শাসকের অনুমোদন-সাপেক্ষ। মারাঠা নেতা মাহাজাদি সিন্ধিয়ার অধীনে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের (১৭৫৯-১৮০৬) যে মর্যাদাহীন অবস্থা ছিল, প্রায় অনুরূপ অবস্থা ছিল জাপানী সম্রাটের, টোকুগাওয়া শোগুনের শাসনাধীনে।

শোগুন ঃ

শোগুন বা সেই-তাই-শোগুন (Sei-i-Tai-Shogun) বা তাইকুন (Tycoon) ছিলেন দেশের প্রকৃত শাসক। জাপানী সম্রাটকে সম্মুখে শিখন্ডীরূপে রেখে শোগুনই সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন। শোগুনের প্রধান কর্মকেন্দ্র প্রথমে ছিল কামাকুরায় অবস্থিত (Kamakura)। পরে কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় এডোতে (বর্তমান টোকিও)। সেখানে শোগুনের রাজকীয় পরিবেশে প্রশাসনিক সকল ব্যবস্থাই ছিল—আড়ম্বরপূর্ণ কোর্ট, বশংবদ পারিষদবর্গ, সশস্ত্র অনুচর ইত্যাদি। শোগুন নিজে ছিলেন ডাইমিয়ো শ্রেণীভুক্ত কিন্তু ডাইমিয়ো শ্রেণীর অগ্রণী অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ডাইমিয়ো। প্রথম সারির সর্বপ্রথম ডাইমিয়ো হিসাবে শোগুন জাপানে জমিদারীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ নিজ অধিকারে রেখেছিলেন এবং অবশিষ্ট অংশ অপর ডাইমিয়োদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিয়েছিলেন। শোগুনের শক্তির ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক তথা সামরিক। পদাধিকারবলে তিনি ছিলেন দেশের প্রধানতম জমিদার এবং জমি বণ্টনে একমাত্র অধিকারী। তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বীয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ক'রে বিপক্ষদলকে আদৌ মাথা তুলতে না দেওয়া। তাঁর অধীন ডাইমিয়োদের তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হত, এমন কি আনুগত্যের লিখিত প্রতিশ্রুতিও দিতে হত। তথাপি শোগুন তাঁদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং যাতে তাঁরা কখনও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে না পারেন তজ্জন্য উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থাও অবলম্বন করতেন। বিপক্ষ ডাইমিয়ো শ্রেণী (Tozama) যাতে বিদ্রোহ-মুখী না হতে পারেন তজ্জন্য শোগুন কতকগুলি ডাইমিয়ো-দমন সূচক (anti-feudal measures) পন্থা অবলম্বন করেন ঃ (১) প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী ডাইমিয়োগণ তাঁদের জমিদারী থেকে বঞ্চিত হন ; (২) শক্তিশালী এবং বিদ্রোহপ্রবণ ডাইমিয়োগণের জমি এমনভাবে বণ্টিত হত যাতে তাঁদের পরস্পরের জমিদারী সংলগ্ন না

হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হত। এইভাবে জমিদারী বণ্টনের ফলে বিদ্রোহমনোভাবাপন্ন ডাইমিয়োদের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও তাঁদের বিভিন্ন জমিদারীর অবস্থানের দূরত্ব হেতু দ্রুত সশস্ত্র অনুচর সংগ্রহ করা সম্ভব হত না কিংবা সমমনোভাবাপন্ন ডাইমিয়োদের পক্ষে জোট বেঁধে দ্রুত সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলাও সম্ভবপর হত না। ইতিমধ্যে অতি-সতর্ক শোগুন বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দিতেন ; (৩) শোগুনের নির্দেশে প্রত্যেক ডাইমিয়োকে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র এডোতে বৎসরের কিছুকাল অতিবাহিত করতে হত, তাঁকে শাসনকার্যে সাহায্য করবার জন্য। ডাইমিয়োদের কাছে শাসনকার্যে সহায়তা পাওয়া ছিল শোগুনের গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ডাইমিয়োগণকে বৎসরের বেশ কিছুকাল স্বীয় নিয়ন্ত্রাধীনে রাখা। শোগুনের 'রাজধানী'তে অবস্থানকালে ডাইমিয়োগণকে উন্নতমানের জীবনযাপন করতে হত, এমন কি নিজেদের জন্য দুর্গ বা বাসস্থান নির্মাণ করতে হত, যার ফলে অনেক সময় অর্থাভাবে ডাইমিয়োগণ বণিকশ্রেণীর কাছে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হত। এই অবস্থায় তাঁরা বিদ্রোহ-বিমুখ হয়ে পড়তেন। এতদ্ব্যতীত তৎকালীন নিয়ম অনুসারে স্ব স্ব জমিদারীতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ডায়মিয়োগণকে আনুগত্যের প্রমাণস্বরূপ এডোতে নিজ নিজ জামিন বা প্রতিভূ রেখে আসতে হত। কোন ডাইমিয়োর আনুগত্যের অভাব দেখা দিলে শাস্তি পেতেন তাঁর প্রতিভূ। ডাইমিয়োদের স্ত্রী-পুত্রেরাই প্রতিভূ হিসাবে গৃহীত হতেন। শোগুন-প্রবর্তিত এই বিধানকে বলা হত স্যানকিন কোটাই (Sankin Kotai) বা বিকল্প উপস্থিতি (Alternative attendance) ; (৪) ডাইমিয়োগণ কার্যতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—শোগুনের সমর্থক দল এবং বিপক্ষ দল। সমর্থকেরা অভিহিত ছিলেন ফিউডাই (Fudai) নামে, আর বিপক্ষ দল পরিচিত ছিলেন টোজামা (Tozama) নামে। এই বিপক্ষ দলের অবস্থান ছিল পশ্চিম জাপানে সাতসুমা, চোষু, টোজা ও হিজেন অঞ্চলে। শোগুন তাঁর সমর্থক ডাইমিয়োগণকে প্রশাসনে উচ্চপদে নিয়োগ করতেন। বিপক্ষদলীয় টোজামাদলকে প্রশাসনিক কোন দায়-দায়িত্ব দেওয়া হত না। শোগুনের নির্দেশ ছিল যে বিপক্ষদলের ডাইমিয়োগণ পরস্পরের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারবেন না। শেষ অবধি পশ্চিম জাপানের রাজনৈতিক আলোড়নে শোগুনের 'সিংহাসন' প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হয় ; (৫) বিভেদ-নীতি অনুসরণ ক'রে শোগুন ডাইমিয়োদের মধ্যে বংশগত বিরোধ সঞ্জীবিত রাখতে প্রয়াস পেতেন। ফলে বিদ্রোহ-প্রবণ ডাইমিয়োগণ শোগুন-বিরোধী কার্যকলাপে নিরুৎসাহ হয়ে পড়তেন।

কেন্দ্রীয় শাসন :

টোকুগাওয়া শোগুনের কেন্দ্রীয় শাসনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল

দুটি আইন সভা যথা কাউন্সিল অব এলডার্স (Council of Elders) এবং জুনিয়ার কাউন্সিল (Junior Council)। এই উভয় সভাই গঠিত ছিল শোগুন-সমর্থক ফিউডাইদলভুক্ত ডাইমিয়োগণ দ্বারা। কাউন্সিল অব এলডার্স (জাপানী নাম গোরোজু, Goroju) এর মোট সভাসংখ্যা ছিল চার বা পাঁচ।

এদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে একজন সভাপতি নির্বাচিত হতেন, মাত্র একমাসের জন্য। কাউন্সিলের সভ্যেরা যাবজ্জীবন সভ্য থাকতে পারতেন। শোগুনের প্রাসাদে সভার অধিবেশন বসত প্রত্যহ। শোগুন যদি নাবালক হতেন তাহলে এই সব সভ্যগণের মধ্যে একজন তাঁর প্রতিনিধি বা রিজেন্ট নিযুক্ত হতেন। সভ্যগণ শোগুনকে প্রশাসনিক উপদেশ দিতেন, বৃহৎ ডাইমিয়োদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, রাজকীয় অট্টালিকাগুলির তত্ত্বাবধান করতেন, এক কথায় শোগুনের পক্ষ থেকে দেশের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা তদারক করতেন। জুনিয়র কাউন্সিলের (জাপানী নাম ওয়াকাডোশিযোরি, Wakadoshiyori) সর্বপ্রথমে সভ্যসংখ্যা ছিল ছয়। পরে এই সভ্যসংখ্যা ছয় থেকে চার এর মধ্যে সীমিত হয়। সভ্যেরা আখ্যাত হতেন উপমন্ত্রীরূপে। এঁদের নির্দিষ্ট কর্তব্যের মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র ডাইমিয়োদের নিয়ন্ত্রণ করা, শাসনকার্যে নিযুক্ত কর্মচারিগণের কাজকর্ম তদারক করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত কাউন্সিল সভা দুটির মাধ্যমে শোগুন বৃহৎ তথা ক্ষুদ্র ডাইমিয়োদের স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতেন। শোগুনের লক্ষ্য থাকত যেন এদের কারও হাতে অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়।

প্রদেশ-জেলা-গ্রাম শাসন ঃ

তখন প্রদেশ, জেলা, শহর, এবং গ্রামেও যথাযোগ্য শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রদেশের শাসনভার অর্পিত ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপর। বৃহৎ ডাইমিয়োদের মধ্য থেকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করা হত। জেলার শাসনভার ন্যস্ত ছিল জেলাশাসকের উপর। জেলাশাসক নিয়োগ করা হত ক্ষুদ্র ডাইমিয়োদের মধ্য থেকে। প্রথম শ্রেণীর জেলা-শাসক পরিচিত ছিলেন গুন্ডাই (Gundai) নামে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলাশাসক অভিহিত হতেন ডাইকোযান নামে (Daikwan)। এই শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করত জেলার আয়তন এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের উপর। জেলাশাসকের প্রধান কর্তব্য ছিল ভূমি-চাষের তদারক করা, ভূমির উপর কর নির্ধারণ করা এবং নির্ধারিত কর আদায় করা। কর নির্ধারণের সময় কৃষকের করভার-বহনের ক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রতিটি জেলা গঠিত ছিল কতকগুলি গ্রাম নিয়ে। গ্রামে ছিল স্বায়ত্তশাসন। গ্রামের

প্রধান হতেন ডাইমিয়োর মনোনীত ব্যক্তি। গ্রাম-শাসনের জন্য গ্রামের ডাইমিয়োরাই একটি গ্রাম-সভা নির্বাচন করতেন। এই গ্রাম-সভার মুখ্য দায়িত্ব ছিল স্থানীয় কর আদায় করা।

শোগুনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে তখন পাঁচটি শহর ছিল, যথা এডো, কিয়োটো, ওসাকা, সাকাই এবং নাগাসাকি। এই সকল শহরের শাসকগণ শহরের প্রশাসনিক তথা বিচার-সংক্রান্ত উভয় প্রকার দায়িত্ব পালন করতেন।

বিচার-ব্যবস্থা :

টোকুগাওয়া বিচার-ব্যবস্থা খুব জটিল ছিল না। বিবাদের বা বিতর্কের বিষয়গুলির মীমাংসা করা হত সালিশীর (Arbitration) মাধ্যমে। তিন স্তরের আদালত ছিল, যথা জেলা আদালত, শহর আদালত, এবং ধর্মীয় আদালত (Temple court)। ধর্মস্থান-সংক্রান্ত বিষয় এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের অভিযোগ ছিল শেষোক্ত আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত। উক্ত আদালতগুলির শীর্ষস্থানে ছিল এডোতে অবস্থিত হাইকোর্ট (Hyojosho বা Chamber of Decisions)। দুজন শহর-শাসক (Town Magistrate) এবং চার জন (পরবর্তীকালে পাঁচজন) ওমেটসুকে (Ometsuke)—যাঁরা সেন্সর (Great censor) বা প্রথম শ্রেণীর ইন্‌স্‌পেকটর (Inspector) পদবীতে পরিচিত ছিলেন—নিয়ে হাইকোর্ট গঠিত হত। হাইকোর্ট ছিল গোরোজুর (Goroju) প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে।

পুলিশ ও গুপ্তচর :

পুলিশ এবং গুপ্তচর বিভাগকে বাদ দিয়ে কোন দেশের কোন যুগের শাসন ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ বলা চলে না। জাপানে শোগুন যুগের শাসনব্যবস্থাতেও উক্ত বিভাগ দুটিকে গুরুত্ব দেওয়া হত। পুলিশ এবং গুপ্তচর ছিলেন শোগুনের চক্ষু ও কর্ণ বিশেষ। ওমেটসুকে (প্রথম শ্রেণীর ইন্‌সপেক্টর) এবং মেটসুকে (দ্বিতীয় শ্রেণীর ইন্‌সপেক্টর) দ্বারা পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ দুটি নিয়ন্ত্রিত হত। সাধারণতঃ গুপ্তচরের বৃত্তির জন্য সমাজের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করা হত। শোগুন সরকার কিন্তু তাদের নিরাপত্তার কোন দায়িত্ব নিতেন না।

শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :

উপরে আলোচিত শোগুন শাসন-ব্যবস্থা ছিল মূলতঃ ফিউডাল প্রকৃতির। মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রচলিত ফিউডাল শাসন-ব্যবস্থা থেকে মধ্যযুগের জাপানে প্রচলিত শোগুন শাসন-ব্যবস্থার যেমন মূলগত

পার্থক্য চোখে পড়ে, তেমনি চোখে পড়ে কিছু সাদৃশ্যও। প্রথমতঃ, ইউরোপের ফিউডাল রাষ্ট্র ছিল জমিদারদের সৃষ্টি। শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত রাজা বা সম্রাট হতেন জমিদার শ্রেণীভুক্ত, অবশ্যই প্রধানতম জমিদার। উদাহরণস্বরূপ মধ্যযুগীয় জার্মানীর অন্তর্গত স্যাক্সনির (Saxony) রাজা প্রথম অটোর (Otto) নাম উল্লেখযোগ্য। অটো মূলতঃ ছিলেন স্যাক্সনির জমিদার, অবশ্য প্রধানতম জমিদার। সেই সুবাদে তিনি নির্বাচিত হন স্যাক্সনির রাজা হিসাবে। পরে তিনি ৯৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথম অটো নামে জার্মানীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং খ্যাত হন মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের (Holy Roman Empire) দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে। মধ্যযুগীয় জাপানে কিন্তু সম্রাট (বা মিকাডো) জমিদার বংশীয় ছিলেন না। সম্রাট ছিলেন 'সূর্যদেবীর' বংশোদ্ভূত জিম্মু টেন্নোর বংশধর এবং রাজত্ব করতেন উত্তরাধিকার সূত্রে তথা দৈব অধিকারে। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগের ইউরোপে ফিউডাল রাজাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত। মধ্যযুগীয় জাপানেও মিকাডো দেশের অধীশ্বর হলেও, প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল শোগুনের হস্তে। মিকাডো ছিলেন নাম-মাত্র সম্রাট। তৃতীয়তঃ, ফিউডাল রাষ্ট্রের রূপ বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের রূপ। জাপানী ফিউডাল রাষ্ট্র ও বিকেন্দ্রীভূত ছিল, কারণ শাসন-ক্ষমতা বিভক্ত ছিল শোগুন, তাঁর অধীনস্থ ডাইমিয়ো এবং বিভিন্ন বিভাগীয় প্রশাসনিক কর্মচারীদের মধ্যে। শোগুন স্বয়ং সম্রাটের মতই আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতেন এবং মোটামুটি স্বাধীনভাবে প্রশাসন পরিচালনা করতেন। তাঁর অধীনস্থ ডাইমিয়োগণও ছিলেন স্ব স্ব এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বিশেষ। এই দিক থেকে বিচার করলে শোগুন যুগের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ছিল না। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ইহা সুস্পষ্ট হবে যে মধ্যযুগীয় জাপানে ফিউডাল যুগোপযোগী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও কার্যতঃ সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল শোগুনের হস্তে। তিনিই ছিলেন 'নৈবেদ্যের সন্দেশ'। তাই ইয়েযাশু-প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থাকে 'কেন্দ্রীভূত ফিউডাল' শাসন (Centralised feudalism) বললে অত্যুক্তি হবে না। শোগুন-শাসনকালে জাপানে ডাইমিয়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে হট্‌স্পার (Hotspar) এবং গ্লেনডাওয়ার (Glendower) এর অভাব ছিল না। তাই শোগুনকে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিদ্রোহপ্রবণ ডাইমিয়োগণের বিরুদ্ধে দমননীতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। শোগুনের এই নীতি ছিল একাধারে দমননীতি ও ভারসাম্যনীতির নিপুণ সমন্বয় (A system of checks and balances)। চতুর্থতঃ, মধ্যযুগের ইউরোপে ছিলেন দুটি রাষ্ট্রপ্রধান—পশ্চিম ও পূর্ব রোমসাম্রাজ্যের অধীশ্বরদ্বয়; মধ্যযুগীয় জাপানেও ছিলেন দুটি রাষ্ট্রপ্রধান —নাম-মাত্র প্রধান মিকাডো ও কার্যতঃ সর্বেসর্বা শোগুন; মধ্যযুগের

ইউরোপে ছিল দুটি রাজধানী—রোম ও কনস্ট্যান্টিনোপল; মধ্যযুগীয় জাপানেও ছিল দুটো রাজধানী-কিয়োটো ও এডো।

সমাজ : সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ :

শোগুন যুগে জাপানী সমাজ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা সম্রাট বংশ, কুগে (Kuge) বংশ, শোগুন-শাসক বংশ, ডাইমিয়ো সম্প্রদায়, সামুরাই সম্প্রদায় এবং সর্বনিম্নে সাধারণ শ্রেণী—যেমন কৃষক, কারিকর, বণিক এবং অস্পৃশ্য হিনিন (Hinin) ও এতা (Eta)। কারিকর ও বণিক একত্রে চোনিন (Chonin) নামে অভিহিত ছিলেন। সর্বোচ্চ সামাজিক পদমর্যাদাসম্পন্ন সম্রাট বংশের নিম্নেই ছিল কুগে বংশ। কুগেরা ছিলেন কোর্ট নোবল (Court noble) বা রাজসভার সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও উচ্চপদস্থ সভাসদবর্গ। এঁদের পূর্বপুরুষেরা সম্রাটের অধীনে মন্ত্রীহিসাবে নিযুক্ত হতেন। শোগুন যুগে কিন্তু কুগেরা রাজকার্যে নিযুক্ত হতেন না। তবে তাঁদের আনুগত্যের মূল্য বাবদ শোগুনেরা তাদের রাজকোষ থেকে বৃত্তি দিতেন এবং কুগে বংশের সঙ্গে বিবাহাদি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন। কুগেদের নীচে ছিলেন ডাইমিয়ো বা জমিদার সম্প্রদায়। কুগেরা যেমন ছিলেন কোর্ট নোবল, ডাইমিয়োরা তেমনি পরিচিত ছিলেন টেরিটোরিয়াল নোবল (Territorial noble) বা দেশের বিভিন্ন জমিদারীর (Daimyates) ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ জমিদার নামে। এঁরা কেরো (Karo) নামে এক শ্রেণীর অনুচরের মাধ্যমে জমিদারী শাসন করতেন। ডাইমিয়োদের মধ্যেও উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদ ছিল। ডাইমিয়োরা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় তিনশত এবং এঁদের অধীনে ছিলেন প্রায় চার লক্ষ সশস্ত্র প্রহরী, যাঁরা পরিচিত ছিলেন সামুরাই (Samurai) নামে। ফুজিয়ারা বংশের প্রশাসনিক দুর্বলতা ও অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে যে সব স্থানীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি জবর-দখল করেন তাঁরাই ছিলেন টোকুগাওয়া যুগের ডাইমিয়ো সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের তাইকোয়া (Taikwa) সংস্কারের ফলে জাপানে ধান চাষের উপযোগী জমি শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা হয়। তখন ১৫ শতাংশ জমি ছিল আবাদের উপযোগী। অবশিষ্ট ৮৫ শতাংশ জমি ছিল অনাবাদী। এই অনাবাদী জমির জবর-দখলের পরিণামে ডাইমিয়ো শ্রেণীর উদ্ভব হয় পরবর্তীকালে। অনাবাদী জমি ছিল নিষ্কর। ডাইমিয়োরা শুধুমাত্র যে জমিদার ছিলেন তা নয়। তারা শোগুনকে শাসন-কার্যেও সহায়তা করতেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে। ডাইমিয়োদের বাহুবলের উৎস ছিল সামুরাই বা যোদ্ধার বংশ। সংজ্ঞা অনুসারে ডাইমিয়ো

ছিলেন ভূস্বামী বা জমিদার যাঁর ভোগদখলীভূত জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল দশ হাজার[1] বা তদধিক কোকু (Koku) ধান্য শস্য (এক কোকু = প্রায় পাঁচ বুশেল)। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দেশের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮·৫ মিলিয়ন কোকু[2]। ডাইমিয়োদের মধ্যে মাত্র ২২ জন[3] ছিলেন বৃহৎ ডাইমিয়ো (Great daimyo), যাঁদের মোট শস্যোৎপাদনের পরিমাণ ছিল দু লক্ষ কোকু[4] অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক। ডাইমিয়োদের মধ্যে অর্ধেকেরও অধিকের জমিতে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার কোকুর কম[5]। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে ডাইমিয়োদের মোট সংখ্যা ছিল ২৯৫[6]। পরবর্তীকালে এই সংখ্যা হ্রাস পায়। অষ্টাদশ শতকে ফিউডাই (Fudai) শীর্ষক ডাইমিয়োদের সংখ্যা ছিল ১৪৫[7] এবং টোজামা (Tozama) অভিহিত ডাইমিয়োদের সংখ্যা ছিল ৯৭[8]। ১৪৫ জন ফিউডাই এর জমিতে বাৎসরিক মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ছিল ৬·৭[9] মিলিয়ন কোকু এবং ৯৭ জন টোজামার জমিতে মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ছিল ৯·৮[10] মিলিয়ন কোকু। ফিউডাই ও টোজামার মোট সংখ্যা পরে কিছু পরিবর্তিত হয়। টোকুগাওয়াদের পতনের প্রাক্কালে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭৬ এবং ৮৬ (মোট ২৬২)।[11] তখন ডাইমিয়োগণ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হন। টোজামা ডাইমিয়োগণ শোগুনের বিপক্ষে আন্দোলনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সামুরাইগণ ছিলেন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, জাপানী ক্ষত্রিয়, শোগুন ও ডাইমিয়োদের বেতনভোগী সশস্ত্র অনুচর। আদিতে সামুরাইগণ ছিলেন কৃষকসম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু তাঁদের অস্ত্রধরবার অধিকার ছিল। ফলে তাঁরা যুদ্ধকালে স্বীয় প্রভুকে সাহায্য করতে পারতেন। পরবর্তীকালে সামুরাই সম্প্রদায় পুরোপুরি একটি সামরিক শ্রেণীতে পরিণত হন। শোগুন যুগে সামরিক রীতি অনুসারে সামুরাইকে দিবারাত্রি দুটি তরবারি ধারণ ক'রে থাকতে হত। সামুরাইগণ আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। কোন কারণে প্রভুর বিরাগভাজন হলে তাঁরা আত্মহত্যা ক'রে আত্মসম্মান রক্ষা করতেন। যে প্রণালীকে আত্মঘাতী হতেন তাকে বলা হত হারিকিরি[12] (উদর কর্তন। হারি অর্থে উদর, কিরি অর্থে কর্তন।) কোনও সামুরাই বিশেষ নিজ কর্মদোষে সমগ্র সামুরাই সম্প্রদায়ের কলঙ্কের কারণ হয়ে উঠলে তিনি স্বেচ্ছায় হারি কিরি সম্পন্ন ক'রে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামুরাইগণ স্বেচ্ছাক্রমে হারি কিরি

---

(১) Hall, Japan তদেব পৃ. ১৪৮ (২) তদেব (৩) তদেব. পৃ. ১৭২ (৪) তদেব (৫) তদেব. পৃ. ১৭৩ (৬) তদেব ১৭০ (৭) তদেব পৃ. ১৬৭ (৮) তদেব

(৯) তদেব। পৃ. ১৬৭। (১০) তদেব। (১১) Clyde and Beers, the Far East, পৃ. ২৮ (১২) Hari-kiri--story. Japan, পৃ. ৮০ দ্রষ্টব্য।

করতেন। যাঁরা স্বীয় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করতেন না তাঁরা তাঁদের প্রভু কর্তৃক হারি কিরি দণ্ডে দণ্ডিত হতেন। অপরাধী সামুরাই খুব উচ্চপদস্থ হলে তাঁকে রাজপ্রাসাদে হারি কিরি সম্পন্ন করবার সুযোগ দেওয়া হত। সাধারণতঃ ধর্মমন্দির কিংবা প্রভুর বাগানবাড়িতে সামুরাইগণ হারি কিরি করতেন। হারি কিরির পর আত্মঘাতী সামুরাই-এর বিষয়সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করতেন। কালক্রমে এইভাবে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবার আইন পরিবর্তিত হয়। ফলে আত্মঘাতী সামুরাই-এর বিষয়সম্পত্তি তাঁর আত্মজনেরাই ভোগ করবার অধিকার লাভ করেন।

যে সমস্ত সামুরাই-এর প্রভু (Lord) থাকত না তাঁরা পরিচিত হতেন রোণিন (Ronin, masterless Samurai) নামে। নানা কারণে রোণিন শ্রেণীর উদ্ভব হত। কোন নিঃসন্তান প্রভুর মৃত্যু হলে, কোন প্রভু শোগুনের আদেশে তাঁর জমিদারী থেকে বঞ্চিত হলে বা কোন প্রভুর জমিদারী কোন কারণে হস্তান্তরিত হলে, তাঁদের অধীন সামুরাইগন প্রভুহীন হয়ে পড়তেন এবং তখন রোণিন নামে গণ্য হতেন। প্রভু কর্তৃক বিতাড়িত সামুরাইও রোণিন নামে পরিচিত হতেন।

টোকুগাওয়া শাসনকালে জাপান দুইশত বৎসরের ও অধিক বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। এই দীর্ঘ দুই শতাধিক কাল ছিল মধ্যযুগীয় জাপানের ইতিহাসে শান্তির যুগ (Tai-hei, great peace)। তখন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সামুরাই শ্রেণী সমাজের চক্ষে হয়ে পড়েন নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পূর্ববৎ ডাইমিয়োদের উপরই ন্যস্ত থাকে। ফলে তাঁরা সমাজে প্রয়োজনহীন তথা পরনির্ভরশীল (Functionless, parasitic) শ্রেণী হিসাবে পরিচিত হন। কালক্রমে সামুরাইগণকে দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবনধারণ প্রণালী পরিবর্তিত করতে বাধ্য হতে হয়। অনেক সামুরাই চোনিন সম্প্রদায়ভুক্ত হন। ক্রমশঃ সামুরাইগণ দেশের প্রশাসনে লিপ্ত হন এবং সেই সঙ্গে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। তাঁরা বসবাস শুরু করেন শহরাঞ্চলে এবং পরিচিত হন এক আমলাতান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী (Bureaucratic elite) হিসাবে।

টোকুগাওয়া যুগের গোড়ার দিকে বণিকশ্রেণীর কোন সামাজিক কৌলিন্য ছিল না। বণিকেরা অধিক সুদে অর্থ বিনিয়োগ করতেন। জাপানের সম্ভ্রান্ত-বংশীয়েরা কিন্তু চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কুসীদজীবীদের ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। তাই সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে বণিক সম্প্রদায়ের কোন সামাজিক সংযোগ ছিল না। প্রাক্-টোকুগাওয়া শোগুন যুগে যখন বহির্বিশ্বের সঙ্গে—প্রধানতঃ পর্তুগাল, স্পেন ও ডাচ[১৩] দেশের সঙ্গে—জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তখনও

(১৩) ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ বাণিজ্যপোত ঝড়ে দক্ষিণ দ্বীপ টানেগাশিমা (Tanegashima) নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অবতরণ করেন। স্পেনদেশীয় ও ডাচ বণিকগণ জাপানে আসেন যথাক্রমে ১৫৯২ এবং ১৬০০ খৃষ্টাব্দে। Hall. Japan পৃঃ ১৩৬।

বণিক শ্রেণীর অন্যতম অর্থনৈতিক বৃত্তি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বণিকদের তখন অবশ্য সম্পূর্ণরূপে অবাধ বিচরণ ছিল না, কারণ শোগুন সরকার স্বয়ং বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং বণিকশ্রেণীকে পণ্যবাহী গোষ্ঠী 'Mover of goods) ব্যতীত অন্য কিছু মনে করতেন না। টোকুগাওয়া শোগুনের ক্ষমতাহীন হবার পর জাপানের এই বহির্বাণিজ্যে ছেদ পড়ে দুই শতাধিক কাল কিন্তু দেশের অর্থনীতিতে বণিকশ্রেণীর ভূমিকা ক্রমশঃ গুরুত্ব লাভ করে। সেই সুযোগে বণিকশ্রেণী সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভে সচেষ্ট হয়। কালক্রমে শোগুন, ডাইমিয়ো ও সামুরাই সকলকেই বণিকের দ্বারস্থ হতে হয় আর্থিক সাহায্যের জন্য। গঠিত হয় শোগুন-বণিক মৈত্রী, যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় বণিকের ব্যবসায়-সহায়ক বহু গিল্ড (Guild বা Tokumidonya) এবং বণিক-সভা (Kabunakama)। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে শোগুন যোশিমুনে (Joshimune) বণিক সভাগুলিকে আইন-সিদ্ধ করেন, অনুজ্ঞাপত্র মঞ্জুর ক'রে। শোগুন তনুমার (Tanuma) শাসনকালে এই অনুজ্ঞাপত্র মঞ্জুরের নীতি প্রসারলাভ করে। ওসাকা এবং এডো দুটি ব্যবসায়-কেন্দ্রে পরিণত হলে বণিক-সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে, বিশেষতঃ চাউল ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায়ে, জোয়ার দেখা যায়। অষ্টাদশ শতক থেকে উক্ত দুটি শহরাঞ্চলে একাধিক বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে ওঠে, যথা, মিৎসুই সংস্থা, (Mitsui house), কোনোইকে (Konoike) সংস্থা, সুমিটোমো (Sumitomo) সংস্থা প্রভৃতি। মূলতঃ অষ্টাদশ শতক নাগাদ জাপান একটি শহর-কেন্দ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করে। এই শহর-কেন্দ্রিক অর্থনীতির বিস্তার বণিকশ্রেণীর সামাজিক তথা অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

(জাপানী ঐতিহ্য অনুসারে জাপানী সমাজ নির্ভরশীল দুটি স্তরের উপর—একটা কৃষক সম্প্রদায়, অপরটা চাউল। বর্তমান জাপান শিল্প বিপ্লবের ফলে একটি শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হয়েছে কিন্তু মধ্যযুগে জাপান ছিল মূলতঃ কৃষি-প্রধান দেশ। তাই মধ্যযুগের অর্থনীতিতে জাপানী কৃষকের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টোকুগাওয়া যুগের শেষের দিকে জাপানের সমগ্র জনসংখ্যার তৃতীয়-চতুর্থাংশ ছিল কৃষক-সম্প্রদায়। তখন জমির আয়তন ছিল ক্ষুদ্র। একখণ্ড আবাদী জমির আয়তন হত অর্ধেক চো বা চোবু (Cho or chobu = ২.৪৫ একর)। এই আয়তনের জমিতে বাৎসরিক উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ছিল পাঁচ কোকুরও কম (১ কোকু koku = ৪.৯৬ বুশেল)। জমি নিবিড়ভাবে আবাদ করা হত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান ছিল প্রধান। ধান ব্যতীত কৃষকেরা উৎপন্ন করত জোয়ার, যব, গম, সয়াবীন, শাকসব্জী এবং চা। সপ্তদশ শতকের পূর্বে যখন মুদ্রার প্রচলন হয় নি তখন জমির খাজনা বাবদ কৃষককে দিতে হত উৎপন্ন চাউলের ৪০ শতাংশ থেকে ৫০

শতাংশ। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে যখন বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রা প্রচলিত হল তখন কৃষককে মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা দিতে হত। কৃষকের হাতে সর্বসময়ে মুদ্রা মজুত থাকত না। তাকে বাজারে চাউল বিক্রয় ক'রে প্রয়োজনীয় মুদ্রা সংগ্রহ করতে হত। যদি তখন চাউলের বাজার-দর মন্দা থাকত তাহলে কৃষককে লোকসান স্বীকার ক'রেও অধিক পরিমাণ চাউলের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় মুদ্রা সংগ্রহ করতে হত। এতে কৃষক পরিবারে চাউলের অভাব ঘটত। ঋণ গ্রহণ ব্যতীত তখন তার উপায়ান্তর থাকত না। ন্যায্য খাজনা ব্যতীত কৃষকের নিকট থেকে অবৈধভাবে আদায় করা হত নানাবিধ উৎপন্ন দ্রব্য এবং বিনা মজুরীতে বা স্বল্প মজুরীতে কায়িক শ্রম। ফলে কৃষককে অনটন এবং কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে হত, দারিদ্র্যকে জীবনসঙ্গী ক'রে অন্তিমদিনের প্রতীক্ষায় থাকতে হত। করভার বহনের জন্যই যেন কৃষকের জন্ম —এরূপ ধারণা টোকুগাওয়া কৃষক-সমাজে প্রচলিত ছিল। টোকুগাওয়া যুগের গোড়ার দিকে কৃষক তার জমি ছেড়ে শহরাঞ্চলে যাবার অনুমতি পেত না, অনুমতি পেত না ইচ্ছামত ফসল উৎপন্ন করবারও। খাদ্যদ্রব্যে আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের খাতিরে কৃষকের ফসল উৎপন্নের ব্যাপারে বহু বাধা-নিষেধ আরোপ করা হত। পরে অবশ্য এই সব বাধা-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়। তখন কৃষক শহর-মুখী হয় জীবিকার সন্ধানে, অনুমতি পায় নিজ প্রয়োজনমত ফসল উৎপাদনে এবং সুযোগ পায় শিল্প-সংক্রান্ত দ্রব্যাদির উৎপাদনেও যথা গুটি পোকার জন্য তুঁতপাতা, তুলা, দড়ির জন্য শন, পাট, নীলগাছ প্রভৃতি। এতে অবশ্য সাধারণভাবে কৃষকের আর্থিক অবস্থার কোন লক্ষ্যণীয় উন্নতি হয় নি। সাধারণ কৃষক পরিবার করভারে পূর্ববৎ জর্জরিত থেকে যায়। কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু অংশ ছিল অসাধারণ অর্থাৎ সাধারণ কৃষক পরিবারের তুলনায় মোটামুটি সম্পন্ন। এই অসাধারণ শ্রেণীভুক্ত কৃষক পরিবারের হাতে জমির পরিমাণ সাধারণ কৃষক পরিবারের দখলে জমির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ছিল। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে আইয়ো (Iyo) প্রদেশে এক গ্রামের মোড়লের জমির পরিমাণ ছিল ৩৪ চো, যা থেকে মোড়ল পেতেন বৎসরে ১৬৫ কোকু চাউল।[১৪] মূলতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গতির তারতম্য ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অবশ্য অভাব-অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করত। স্বল্পসংখ্যক কৃষক পরিবারে কিছুটা স্বচ্ছলতা ছিল। এই স্বল্পসংখ্যক পরিবারের পূর্বপুরুষদের সেনক বৃত্ত ছিল। মধ্য পঞ্চদশ শতক থেকে মধ্য ষোড়শ শতক পর্যন্ত জাপানী সমাজে একটি উক্তি প্রচলিত ছিল—অস্ত্রশস্ত্র না থাকলে জমি রক্ষা করা যায় না (no arms, no land)।[১৫] মূলতঃ তখন জমির মালিক এবং সৈনিকের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষিত

(১৪) Japan Reader, vol 1, পৃষ্ঠা ৪৩
(১৫) তদেব। পৃষ্ঠা ৪৪

হত না।[১৬] সৈনিকও জমির মালিকানা পেতেন। এই ধরনের সৈনিক-জমিদারের বংশধর ছিল উপরোক্ত স্বচ্ছল শ্রেণীর কৃষক পরিবার। সঙ্গতি সম্পন্ন কৃষক জমি আবাদের জন্য এক শ্রেণীর মজুর নিয়োগ করতেন যারা কথিত হত গেনিন (Genin) নামে।[১৭] গেনিনের মোট সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয় কিন্তু যে যুগে জমির মালিকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে জমি চাষের রীতি প্রচলিত ছিল (Landlord management), সে যুগে গেনিনেরা ছিল চাষের জন্য উপযুক্ত মজুর সংগ্রহের প্রধান উৎস স্বরূপ। জমির মালিকেরা গেনিনকে তাদের পরিবারের একজন সভ্য ব'লে মনে করতেন। কোনও প্রকার সামাজিক বা পারিবারিক বা জাতিগত সম্পর্কবিহীন ব্যক্তিও তখন কোন জাপানী পরিবারের সভ্য হিসাবে গৃহীত হতেন। এটি ছিল তৎকালীন জাপানী পরিবারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জাপানী কৃষক-সমাজের আকৃতি তখন ছিল পিরামিডের মত—শীর্ষস্থানে সম্পন্নতম কৃষক, মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত কম সম্পন্ন কৃষক এবং সর্বনিম্নে গেনিন শ্রেণীর মজুর।

টোকুগাওয়া যুগে সাধারণ কৃষকের জীবন ছিল কষ্ট-ক্লিষ্ট। 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি' কোনমতে 'শ্রান্ত শুষ্ক বুকে' কৃষক তার প্রাণ বাঁচিয়ে রাখত। রবীন্দ্রনাথের মানসপটে হয়ত বা জাপানী কৃষকের ম্লান মুখটাও উদিত হয়েছিল যখন তিনি লিখেছিলেন—"স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি' করিতেছে পান লক্ষ মুখ দিয়া বেদনাবে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার।"[১৮] ফিউডাল যুগে সাধারণ জাপানী কৃষকের উপর স্বার্থোদ্ধত ফিউডাল লর্ডের অত্যাচার কোন ঐতিহাসিকই অস্বীকার করেন নি। ফিউডাল লর্ডের অধীন কর্মচারীরা এবং খাজনা আদায়কারীরা কৃষকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যেন সে জন্তু-জানোয়ারের ঊর্ধ্বে নয়। এক নির্দয় শকট-চালক যেমন গুরুভার বহনে অসমর্থ অশ্ব বা বলদকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করতে কুণ্ঠা বোধ করে না, তেমনি উপরোক্ত লর্ডের প্রতিনিধিগণও সাধ্যাতীত খাজনা দিতে অসমর্থ কৃষককে নির্যাতন করতে দ্বিধাবোধ করত না। সরিষা বা তিল জাতীয় বীজ থেকে বেশী পরিমাণ তেল পেতে হলে অধিক চাপের প্রয়োজন হয়। জাপানী লর্ড এবং তাঁর অনুচরেরাও অনুরূপ মনে করতেন যে অধিক চাপ সৃষ্টি না করলে কৃষকের নিকট থেকে অধিক খাজনা আদায় করা সম্ভব হবে না। অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের ফলে সুফলনের বৎসরেও কৃষকের হাতে উদ্বৃত্ত শস্য থাকত না এবং যে বৎসর ফসল আশানুরূপ হত না সে বৎসর কৃষক অনশন-প্রায় অবস্থার সম্মুখীন হত। এরূপ পরিস্থিতিতে চোনিন শ্রেণীর দ্বারস্থ হয়ে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ ব্যতীত কৃষকের উপায়ান্তর থাকত না।

(১৬) তদেব
(১৭) তদেব, পৃঃ ৪৭

আবার, ঋণগ্রস্ত হবার পর চড়া সুদের গুরুভার বহনে অপারগ হয়ে অনেক কৃষক জমি বিক্রয় ক'রে বা জমি বন্ধকী রেখে বিক্রয়-লব্ধ বা বন্ধকী-লব্ধ অর্থে ঋণ পরিশোধ ক'রে অন্য জেলায় বা শহরাঞ্চলে অভিপ্রয়াণ করত, নতুন পথে জীবিকার সন্ধানে। বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্। দারিদ্র্যের চাপে অনেক কৃষক শিশুসন্তান হত্যা (Mabiki) করতেও দ্বিধা বোধ করত না।[১৮] পরিণামে ক্ষেতের কাজের জন্য অল্পবয়সী মজুরের অভাব দেখা দিলে এক শ্রেণীর লোক (যাদের বলা হত Child merchents) শহর থেকে শিশু-মজুর হরণ ক'রে গ্রামাঞ্চলে বিক্রয় করত।[১৯]

কেবলমাত্র ফিউডাল লর্ড এবং তাঁর অনুগত অনুচরেরা নয়, প্রকৃতিও যেন ষড়যন্ত্র ক'রে কৃষকের জীবনকে নানাভাবে বিপন্ন ক'রে তুলেছিল। যে বৎসর সুবৃষ্টির অভাবে আবাদ সুষ্ঠুমত হত না বা একেবারেই হত না, তার পরের বৎসর দেখা দিত দুর্ভিক্ষ, মড়ক যা কৃষকের জীবনে আনত এক গুরুতর বিপর্যয়। বৎসরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৬৭৫, ১৬৮০, ১৭৩২, ১৭৮৩-৮৪, ১৭৮৭, এবং ১৮৩৩-৩৭ খৃষ্টাব্দ। অজন্মার ফলে মহামারী আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় কুড়িবার।[২০] দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষক সমাজে মড়ক দেখা দেয়। আবাদ করবার যথোপযুক্ত চাষীর অভাবে আবাদী জমি থেকে যায় অনাবাদী।

দেখা যাচ্ছে, টোকুগাওয়া জাপানে কৃষক শ্রেণী নানাভাবে বিপন্ন হয়েছে। জমিদারের নির্মম ব্যবহার, অতিরিক্ত খাজনা আদায়, চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ, জমি বিক্রয় ক'রে বা বন্ধকী রেখে লব্ধ অর্থে ঋণ পরিশোধের পর শহরাঞ্চলে অভিপ্রয়াণ, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক—এই সব কিছু মিলে সে যুগে কৃষি-জীবনকে জর্জরিত ক'রে তুলেছিল। বিপদ যখন আসে, একক আসে না, আসে দল বেঁধে। 'When sorrows come, they come not single spies But in battalions'. ('সেকস্‌পিয়ার, হ্যামলেট)। টোকুগাওয়া যুগে কৃষকজীবনেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কৃষি ব্যবস্থাকে ভিত্তি ক'রেই তৎকালীন জাপানে সামন্ত প্রথা গড়ে ওঠে। মূলতঃ সব দেশেই কৃষি-ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থাই সমাজতন্ত্রের ভিত্তি। অথচ পরিণামে কৃষকই সমাজ-তান্ত্রিক শোষণের প্রধান শিকার হয়ে দাঁড়ায়। টোকুগাওয়া জাপানেও একই চিত্র—সামন্তপ্রথার বন্ধন জালে কৃষকের আবদ্ধ হওয়ার চিত্র। এর উপর ছিল খাদ্যাভাব ও মড়ক। ফলে অনেক কৃষক-গ্রাম হয়েছিল উজাড়।

'নির্যাতনের প্রতিবাদে, বিশেষতঃ অতিরিক্ত খাজনা দাবীর প্রতিবাদে জাপানী

(১৮) তদেব. পৃ ২৪। Sansom, Japan, a short cultural histroy, তদেব। পৃ ৫২০ দ্রষ্টব্য।

(১৯) Japan Reader I, তদেব। পৃ ২৪

(২০) Hall, Japan, তদেব। পৃ ২০২

কৃষক বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পশ্চাৎপদ হত না। টোকুগাওয়া শাসনের ইতিহাসে বহু কৃষক বিদ্রোহের উল্লেখ আছে, যদিও সে সব বিদ্রোহের (Jacquery, hyakusho ikki) পশ্চাতে কোন 'আইডিয়োলজি বা কোন স্থায়ী সংগঠন ছিল না।[২১] কৃষক বিদ্রোহ প্রত্যক্ষভাবে শোগুন শাসনের অবসান ঘটায় নি। তথাপি কৃষক বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে জাপানী কৃষক অত্যাচারের মুখে একেবারে উদাসীন বা নিষ্ক্রিয় ছিল না। ১৬০৩—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১১৫৩ বার কৃষকদের বিদ্রোহ ঘোষণার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২] এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রথম একশত বৎসরে (১৬০৩—১৭০৩) ১৫৭ বার, পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরে (১৭০৩—৫৩) ১৭৬ বার এবং অবশিষ্ট ১১৫ বৎসরে গড়ে ৬টির অধিক বার কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[২৩] বিদ্রোহী কৃষকদের অভিযোগ প্রকাশের একটা পদ্ধতি ছিল। যেমন, কৃষকেরা দলবদ্ধ হয়ে তাদের জমিদারের দুর্গের সম্মুখে সমবেত হয়ে তাদের অভিযোগ পেশ করত। দুর্গাভিমুখে অভিযান কালে তারা সম্পন্ন ব্যক্তিদের তথা তাদের জমিদারের কর্মচারীদের সম্পত্তি ধ্বংস করতে করতে অগ্রসর হত। এই অভিযান সফল হলে জমিদার কৃষকদের সব দাবী মেনে নিতেন এবং কৃষকেরাও বিজয়ের নিশান উড়িয়ে স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্তন করত। যদি অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত তাহলে জমিদারের সশস্ত্র প্রহরী কর্তৃক দুর্গতোরণ থেকে বিতাড়িত হয়ে কৃষকদের শূন্যহস্তে প্রস্থান করতে হত। এই সব অভিযানে যারা নেতৃত্ব দিত তাদের গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হত। তাদের গ্রাম থেকে নির্বাসিত করা হত, এমন কি তাদের শিরশ্ছেদনও করা হত।[২৪]

কৃষকদের অভিযোগ ছিল জমিদারের বিরুদ্ধে, বণিকের বিরুদ্ধে এবং গ্রামে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে। জমিদার নানা অজুহাতে জমির খাজনা বৃদ্ধি করতেন। বণিক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের নামে কৃষকের জমি বেদখল করতেন, আর সরকারী কর্মচারী ছিলেন কৃষক নির্যাতনের সরকারী হাতিয়ার। স্যানকিন কোটাই (Sankin kotai) প্রথানুযায়ী জমিদারদের বৎসরের কয়েক মাস শোগুনের রাজধানী এডোতে বাস করতে হত। এডোতে অনুপস্থিতি-কালে তাঁদের জমিদারীর শাসনভার ন্যস্ত থাকত তাঁদের কর্মচারীদের উপর। এইসব কর্মচারী ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে কৃষকদের নিকট থেকে উচ্চহারে খাজনা আদায় করত। স্বাভাবিক কারণেই এই শ্রেণীর কর্মচারীর বিরুদ্ধেও কৃষকদের অভিযোগ ছিল এচিগো (Echigo) প্রদেশের অন্তর্গত মাকিনো (Makino) নামক জমিদারীতে এই শ্রেণীর কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

---

(২১) তদেব, পৃ ২০২। Japan Reader I, তদেব পৃ ৪৮

(২২) Japan Reader I, তদেব। পৃ ৪৯

(২৩) তদেব। (২৪) তদেব, পৃ ৫০

একাধিকবার কৃষকবিদ্রোহে পর্যবসিত হয়, বিশেষতঃ ১৮২৮-৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।[২৪] ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ৫ মিলিয়ন একর, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১½ মিলিয়ন একরে।[২৫] এই বৃদ্ধি বিগুণেরও অধিক। অথচ সে অনুপাতে কৃষকশ্রেণীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি। এই বৃদ্ধি না হওয়ার কারণগুলির মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে দুর্ভিক্ষ, মড়ক, অনাহার, বন্যা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি। আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেল অথচ কৃষকদের জনসংখ্যা মোটামুটি অপরিবর্তিত থেকে গেল বা হ্রাস পেল। ফলে কৃষকদের উপর চাষের চাপ বর্ধিত হল। স্বাভাবিক কারণেই কৃষকশ্রেণী হয়ে ওঠে বিদ্রোহমুখর। এতদ্ব্যতীত চাউল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি কৃষকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিপন্ন ক'রে তোলে। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে টোকুগাওয়া যুগে মোট ১০১ বার কৃষকবিদ্রোহ সংঘটিত হয়।[২৬] এর মধ্যে কেবলমাত্র চাউলের মূল্য বৃদ্ধির জন্যই বিদ্রোহ (Rice Riot) দেখা দেয় এডো এবং ওসাকা অঞ্চলে, প্রথমে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এবং পুনরায় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে।[২৭] অনেক সময় দেখা যেত যে রাজস্বের ঘাটতি মেটাবার জন্য অথবা এডোতে শোগুনের প্রাসাদে এবং দুর্গাদিতে অগ্নি বা ভূমিকম্পজনিত ক্ষয়ক্ষতি মেরামতের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য শোগুন প্রায়শঃই ওসাকা ও এডোর ডাইমিয়ো ও ধনী বণিকশ্রেণীর উপর তাদের আয় অনুপাতে বাধ্যতামূলক কর (Forced levies, Goyokin) ধার্য করতেন। ডাইমিয়োগণ তখন কৃষকদের পকেট থেকে অতিরিক্ত কর আদায় ক'রে শোগুনকে খুশী করতেন। এই ধরনের বাধ্যতামূলক কর আদায় ছিল কৃষকবিদ্রোহের অন্যতম কারণ। গ্রামাঞ্চলে প্রশাসনিক দুর্নীতি ও কৃষককে বিদ্রোহের মুখে ঠেলে দেয়। কেবলমাত্র প্রশাসনিক দুর্নীতির জন্যই টোকুগাওয়া যুগে মোট ৬২টি কৃষক বিদ্রোহের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৮] টোকুগাওয়া যুগে রোণিনদের (প্রভুবিহীন যোদ্ধা) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যতদিন তারা প্রভুর অধীনে ছিল ততদিন তাদের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব ছিল প্রভুর উপর। কিন্তু প্রভুবিহীন হওয়ায় তারা আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং সমাজে একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী হিসাবে পরিগণিত হয়। এই রোণিন শ্রেণী কৃষককে সমাজে নিম্ন-পর্যায়ভুক্ত মনে করলেও কৃষকবিদ্রোহে ইন্ধন যুগিয়েছিল। কৃষক বিদ্রোহের সুযোগে নিজেদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করাই ছিল রোণিনদের

---

(২৪) তদেব। পৃ ৫০—৫১

(২৫) তদেব। পৃ ৫১

(২৬) তদেব

(২৭) তদেব। (২৮) তদেব। পৃ ৫২

উদ্দেশ্য। বিরুদ্ধ শোষিত শ্রেণীর সহযোগিতা এবং ঐক্য ছিল কৃষকবিদ্রোহের অন্যতম কারণ। আবার, ঋণ পরিশোধের জন্য অনেক কৃষককে জমি বিক্রয় করতে হত। ফলে পূর্বে যারা ছিল জমির মালিক, তারা পরিণত হয় জমিহীন প্রজায়। যে গ্রামে এ হেন জমিহীন প্রজার সংখ্যাধিক্য ঘটত, সেখানে তারা জোট বেঁধে জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান তুলত, জমি ফিরে পাবার দুরাশায়। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের পর এই ধরনের জমিদার-প্রজার দ্বন্দ্ব (Tenancy dispute) কৃষক বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে ইজুমো (Izumo) প্রদেশে অজন্মার ফলে কান্ডো (Kando) এবং ঈশি (Iishi) জেলা দুটির অন্তর্গত ওজু (Ozu), মিতোয়া (Mitoya) এবং তাকুয়া (Takuwa) গ্রামগুলিতে ভীষণ রকম গোলযোগের সৃষ্টি হয়। পূর্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল অঞ্চলে প্রতি দশ গো ধান-জমির উপর এক নূতন কর ধার্য হয়, যার পরিমাণ ছিল তিন কোকু। অনাবাদী জমির উপরও নূতন কর ধার্য হয়—প্রতি দশ চো-র উপর পাঁচ কোকু। এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রামগুলির ডাইমিয়োর শহরস্থিত প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রামবাসীদের উপর ফুমাই (Fumai) নামে এক প্রকার কর ধার্য হয়। গ্রামবাসীদের উপর সানশিমাই (Sunshimai) নামে আর এক প্রকার অতিরিক্ত কর ধার্য হয়। এটি ছিল চাউলের উপর কর। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের শুরু থেকেই চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র চাষীদের দারুণ অন্নাভাব ঘটে—অনেককেই ভাতের ফেন ভিক্ষা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে বাধ্য হতে হয়। বিদ্রোহ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ওজু গ্রামের অন্নক্লিষ্ট কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ডাইমিয়ো মোরিহিরোয়া গামপাই (Morihiroya Gampai)-এর দুর্গ আক্রমণ ক'রে, আসবাবপত্রাদি ভেঙে, গুদামঘর থেকে ৫৩৩ গাইট চাউল উদ্ধার ক'রে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেয়। তৎপরে বিদ্রোহী কৃষকেরা দলবদ্ধ হয়ে ডাইমিয়োর নিকট এক আবেদনপত্র পেশ করে। সেই আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত দাবিগুলি সন্নিবেশিত ছিল: (১) কর-বৃদ্ধি করা চলবে না। (২) ঋণ পরিশোধের জন্য পাঁচ বৎসর সময় দিতে হবে। (৩ খাদ্যাভাব দূর করবার জন্য প্রতি ১০০ কোকুতে ১০ কোকু ফসল ঋণ দিতে হবে, যে ঋণ পাঁচ বৎসরে পরিশোধ হবে। (৪) চাউল থেকে মদ প্রস্তুত করা চলবে না। (৫) আবাদের উদ্দেশ্যে পশু (Livest_ck ক্রয়ের জন্য কর্জ দিতে হবে ইত্যাদি।[২৯] ইতিমধ্যে ঈশি (Iishi) জেলাতেও কৃষকেরা নিতা জেলার চাষীদের সহযোগিতায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অন্ততঃ সাত হাজার কৃষক এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা মিতোয়া গ্রামের এক ধনী ব্যবসায়ীর বিষয়-

(২৯) তদেব। পৃ ৫৩-৫৫

সম্পত্তি ধ্বংস করে দেয়। তাঁর গ্রাম থেকে প্রায় এক হাজার কৃষক জন লুণ্ঠন ক'রে মত্ত অবস্থায় স্থান ত্যাগ করে।[৩০]

শহরাঞ্চলের উত্থান : শোগুন যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শহরাঞ্চলের উত্থান। প্রধানতঃ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং ধর্মীয় স্থানগুলি শহরে পরিণত হয়। বাণিজ্যিক শহরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাগাসাকি, সাকাই প্রভৃতি। ধর্মস্থানে যে সব শহর গড়ে উঠেছিল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারা, ইশিয়ামা (Ishiyama) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ডাইমিয়োদের জমিদারীতে তাঁদের দুর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এডো এবং আরও কতকগুলি শহর যেগুলি castle town নামে খ্যাত। প্রধান প্রধান রাজপথের দুই পার্শ্বেও শহর গড়ে ওঠে। প্রধানতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ-স্পৃহা, মুদ্রার প্রচলন এবং বাণিজ্যের প্রসার শোগুন যুগের জাপানে শহর-সুলভ পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায়। গ্রাম ছেড়ে অনেকেই যে শহরমুখী হয় তার প্রমাণ মেলে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে। তৎকালীন কয়েকটি মুখ্য শহরের জনসংখ্যা ছিল এইরূপ[৩১] : এডো—দশ লক্ষ ; ওসাকা ও কিয়োটো—প্রত্যেকটিতে চার লক্ষ ; কানাজাওয়া (Kanazawa) এবং নাগোয়া (Nagoya)—প্রত্যেকটিতে ১ লক্ষ ; নাগাসাকি এবং সাকাই—প্রত্যেকটি প্রায় ৬৫ হাজার। জাপানের মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ তখন দশ হাজারের অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহরগুলির অধিবাসী ছিল।[৩২] একদিকে গ্রামাঞ্চলের অবক্ষয়, অপর দিকে শহর জীবনের পুষ্টি সাধন, যেন গ্রাম্য ধমনী থেকে রক্ত শুষে শহরাঞ্চলকে স্বাস্থ্যমণ্ডিত করার প্রয়াস। ফলে সমাজে কৃষক অপেক্ষা বণিক পেল অধিকতর গুরুত্ব, অর্থনৈতিক জীবনে কৃষি গেল পিছিয়ে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পেল অগ্রাধিকার। মধ্যযুগের জাপানে তিনটি শহর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র : কিয়োটো যা ছিল সম্রাটের বাসস্থান, এডো যা ছিল শোগুনের কর্মকেন্দ্র এবং ওসাকা, প্রধানতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

টোকুগাওয়া যুগে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা : টোকুগাওয়া যুগে স্থলপথে জাপানের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মালপত্রাদি দ্রুত পরিবহন করা একপ্রকার দুঃসাধ্য ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। দ্রুত পরিবহনের প্রধান অন্তরায় ছিল যানবাহনোপযোগী পথঘাটের অভাব এবং নদীতে বন্যার প্রকোপ। এতদ্ব্যতীত দেশটি পর্বতময় হওয়ায় দ্রুত পরিবহন সহজেই বিঘ্নিত হত। চলার পথ বন্ধুর ও সংকীর্ণ হওয়ায় একটি মালবাহী ঘোড়ার পক্ষে দু বস্তার অধিক চাউল বহন করা সম্ভব হত না। এই সব অসুবিধা দূরীভূত করবার জন্য ব্যবসায়ীরা সরল পথ ত্যাগ করে বক্র পথে মাল

---

(৩০) তদেব। পৃ. ৫৫

(৩১) Hall, Japan তদেব। পৃ. ২৮০ (৩২) তদেব।

পণ্যাদি পাঠাতে সচেষ্ট হন। এই বক্র পথ ছিল জলপথ। প্রথমে গ্রামাঞ্চল বা ব্যবসায় কেন্দ্র থেকে মালপত্রাদি বন্দর-সংলগ্ন শহরে আনীত হত। তারপর সেখান থেকে নৌকোয় সেইসব মালপত্র বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে প্রেরিত হত। জলপথেও পরিবহনের গতি গোড়ার দিকে ছিল মন্থর। টোকুগাওয়া যুগে পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় দেশের বিভিন্ন অংশে মালপত্র, বিশেষতঃ চাউল পাঠানো যেমন ব্যয়সাধ্য ছিল, তেমনি ছিল দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। সাধারণত জলপথে চাউল পাঠানো হত জাপান সাগর বেয়ে উত্তর জাপান থেকে ওসাকা পর্যন্ত। অধিকতর দূরে প্রেরিত হত শিমোনোশেকি প্রণালী ও ইনল্যান্ড সাগর বেয়ে এডো পর্যন্ত। নাগাসাকিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটাতে বাণিজ্যোপযোগী মালপত্রাদি হোক্কাইডো থেকে জলপথে নাগাসাকিতে আনীত হত। এতদ্ব্যতীত ওসাকা থেকে এডো পর্যন্ত এক বাণিজ্যসুলভ পথ উন্মুক্ত হয়।

টোকুগাওয়া যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার

টোকুগাওয়া শোগুন শাসনকালের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বশ্রেণীর জাপানীদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার। এই প্রসার খৃষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক থেকে পরিলক্ষিত হয়। সে যুগ ছিল আশিকাগা যুগ (১৩৩৩—১৬০৩)। কয়েকটি বিশেষ কারণে জাপানে তখন সাংস্কৃতিক প্রসার ঘটে। প্রথমতঃ, বেসামরিক ও সামরিক শ্রেণীদ্বয়ের একত্র প্রচেষ্টা জাপানে সংস্কৃতি প্রসারের পথ প্রশস্ত করে। শোগুন, ডাইমিয়ো ও সামুরাই সম্মিলিতভাবে জাপানকে সুসংস্কৃত দেশ হিসাবে পরিচিত করতে আত্মনিয়োগ করে। শোগুন শিক্ষাগারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন সহজাত প্রবৃত্তিবশঃ কিংবা বিশেষ কোন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। দেশে যদি একবার শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, যদি জনসাধারণের মনে সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প এবং সঙ্গীত বিষয়ে অনুরাগ জন্মানো যায় তাহলে জনসাধারণ শোগুনের বিরুদ্ধ সমালোচনা থেকে বিরত থাকবে। ফলে শোগুন তাঁর অপহৃত ক্ষমতা ভোগে কোন শ্রেণীর নিকট থেকেই বাধার সম্মুখীন হবেন না। বিশেষ বাধার আশঙ্কা ছিল সামুরাই সম্প্রদায়ের নিকট থেকে। শোগুন যুগ যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মুক্ত থাকায় সামুরাইদের পেশাগত করণীয় কিছুই ছিল না। তাদের অলসদিনগুলি যাতে শোগুনবিরোধী কার্যকলাপে অতিবাহিত না হয়ে শিক্ষা-প্রসূত আনন্দ-রসে সিক্ত থেকে অতিক্রান্ত হয় সেদিকে সতর্ক লক্ষ্য রেখে শোগুন জাপানে শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগী হন। শিক্ষা-সংস্কৃতির একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বা মাদকতা আছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই সামুরাই শ্রেণী সংস্কৃতি প্রসারে শোগুনের সহযোগিতা করে। শিক্ষাপ্রসার

কার্যে লিপ্ত থাকলে অন্ততঃ অলস জীবনের প্রাত্যাহিক গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব—এই আশা সামুরাইগণকে শিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট উৎসাহিত করে। শোগুনের বশংবদ ডাইমিয়ো শ্রেণীও উদাসীন না থেকে শিক্ষাপ্রসারে সহযোগিতা করেন। দ্বিতীয়ত, চীন সভ্যতার অনুপ্রবেশ জাপানে শিক্ষাপ্রসারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, কিয়োটোর প্রান্তস্থিত জেন (Zen) নামক মঠের সন্ন্যাসীদের প্রভাব ও শিক্ষাপ্রসারে সহায়ক হয়। ফলে শোগুন যুগের জাপানে সাহিত্য ও ইতিহাস রচনা, স্থাপত্যশিল্প, চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতচর্চা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আশিকাগা যুগের পরবর্তী টোকুগাওয়া যুগে শিক্ষাসংস্কৃতির প্রসার বৃদ্ধিলাভ করে। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এডোতে স্থাপিত হয় প্রথম বাকুফু কালেজ। ডাইমিয়োগণ একাধিক হান (Han) স্কুল ও কালেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। শিক্ষার্থীদের জন্য কনফিউসীয় শিক্ষা-ভিত্তিক বহু পুস্তক প্রণীত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এমন কোন ডাইমিয়োর জমিদারী ছিল না যেখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই শিক্ষাপ্রসার যে কেবল সম্ভ্রান্তবংশীয়দেয় মধ্যে সীমিত ছিল তা নয়। জনসাধারণও শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জাপানে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ জন ছিলেন লিখনপঠন-সক্ষম।[৩৩]

টোকুগাওয়া-শোগুন যুগে অর্থনৈতিক অবস্থা

শোগুন যুগে জাপানের অর্থনীতি ছিল কৃষি-ভিত্তিক। ব্যবসা বা শ্রমশিল্পের পরিবর্তে কৃষিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ফলে তখন ব্যবসা বা শ্রমশিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার সম্ভব হয় নি। উন্নতমানের সার ব্যবহারের ফলে কৃষিজাত শস্যাদির (তুলা, চাউল, চা, তামাক পাতা, মালবেরি ইত্যাদি) উৎপাদন ক্রমশঃ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৬০০—১৭৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য তখন কৃষিবিদ্যার উপর গ্রন্থ ও প্রকাশিত হয়, যথা মিয়াজাকি আনতেই (Miyazaki Antei) প্রণীত নোগিও জেনশো (Nogyo Zensho)।[৩৪] কৃষির উন্নতি হয় কিন্তু কৃষকের অবস্থার উন্নতি হয়নি। করভারে জর্জরিত, ঋণগ্রস্ত এবং নিপীড়িত কৃষকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। 'We pity the plumage but forget the dying bird'. অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে টোকুগাওয়া শাসনকালে জাপানের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও কৃষক ছিল অবহেলিত। গোড়ার দিকে কৃষকের কোন ব্যক্তিস্বাধীনতাও ছিল না। তার উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল। ফলে

(৩৩) James B. Crowley, Modern East Asia—Essays in Interpretation P. 80

(৩৪) Hall, Japan তদেব। পৃ ২০১

তার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল অনেকাংশে মধ্যযুগীয় ইউরোপের সার্ফদের মত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য, কৃষক নিজ গ্রাম ত্যাগ ক'রে জীবিকা উপার্জনের জন্য অন্যত্র যাবার অনুমতি পেত না। ইচ্ছামত সে যে কোন প্রকার ফসলও আবাদ করতে পারত না। খাদ্যে আঞ্চলিক প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে ডাইমিয়ো স্থির ক'রে দিতেন কখন কি ফসল চাষ করতে হবে। ক্রমশঃ অবশ্য এ সব বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়। তাতে অবশ্য কৃষকের আর্থিক দুর্গতি হ্রাস পায় নি।

সপ্তদশ শতকে যখন শহর গড়ে উঠতে লাগল এবং বাজারে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চাউলের পরিবর্তে মুদ্রা প্রচলিত হল তখন অন্তর্দেশীয় ব্যবসাও শুরু হল। টোকুগাওয়া শাসনের শেষের দিকে পেরী মিশনের ফলে জাপানে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যেরও পথ প্রশস্ত হয়। এতে সমাজের উপর-তলার মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেলেও নীচের-তলার মানুষের অর্থাৎ কৃষক-সম্প্রদায়ের সংসার স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পায় নি। বিত্তশালী এবং বিত্তহীন —এই দুই শ্রেণীতে তৎকালীন জাপানী সমাজ দ্বিধাবিভক্ত থাকে।

টোকুগাওয়া-শোগুন শাসনের অবসান—কারণ বিশ্লেষণ

জাপানের ইতিহাসে সামন্তযুগ বা মধ্যযুগের স্থায়িত্বকাল ছিল ১১৯২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগ শোগুন শাসনের যুগ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। সর্বপ্রথম শোগুন ছিলেন মিনামিটো জোরিটোমো এবং সর্বশেষ শোগুন কেইকি (Keiki) বা জোশিনোবু। সর্বশেষ শোগুনবংশ ছিল টোকুগাওয়া বংশ (১৬০৩—১৮৬৭), যোশিনোবু ছিলেন টোকুগাওয়া বংশের সর্বশেষ প্রতিনিধি। তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শোগুন শাসনের অবসান ঘটে। এই অবসানের কারণ কি?

শোগুনশাসনের পতনের কারণ বিশ্লেষণে জাপানী ইতিহাসে অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। G. C. Allen, Sir George Sansom এবং W. Elliot Griffis-এর মতে আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও দুরবস্থা শোগুন যুগের অবসানের প্রধান কারণ। Allen অর্থনৈতিক সংকটকেই প্রধান কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বিদেশী শক্তিবর্গের জাপানের বন্দরে প্রবেশ লাভ এবং ফলে জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন শোগুন শাসন-পতনের প্রধান বা মুখ্য কারণ, একথা ঠিক নয়। তাঁর মতে এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তজ্জনিত বৈদেশিক চাপ সৃষ্টি একটি অপ্রধান বা গৌণ কারণ মাত্র ছিল। মেজী যুগের অন্যতম প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Prince Matsukata-র উক্তি উল্লেখ ক'রে

Allen অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলাকেই মুখ্য কারণ হিসাবে গণ্য করেছেন।[৩৫] Sir George Sansom-এর মতে আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণই ছিল প্রধান কারণ, বিদেশী চাপ নয়।[৩৬] এই আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণ বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে স্যানসম[৩৭] লিখেছেন যে সমগ্র জাপান তখন অশান্তির পুরী। সম্ভ্রান্ত, অসম্ভ্রান্ত সকল সম্প্রদায়ের কাছেই যেন শোগুন শাসন অসহ্য হয়ে উঠেছে। ডাইমিয়ো, সামুরাই, বণিক, কৃষক, শিক্ষাবিদ—সকলেই তখন 'বক্ষুবধ, পরিবর্তনমুখী এবং জাপানের বন্ধ দরজা উন্মুক্ত ক'রে বহির্বিশ্বের সঙ্গে নূতনভাবে সম্পর্ক-স্থাপনে অধীর আগ্রহী। এই পশ্চিম-মুখী দরজা উন্মোচনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় শোগুন-শাসনের অবসানে।[৩৮] গ্রিফিসের মতে বিদেশী এবং বৈদেশিক চিন্তাধারা ছিল দ্বৈতশাসনের পতনের উপলক্ষ মাত্র, প্রকৃত কারণ নয়। যা পূর্বেই অনিবার্য হয়ে ওঠে বৈদেশিক চাপ তা ত্বরান্বিত করে মাত্র। আসল কারণ আভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক নয়। Reischauer কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণকে মুখ্য কারণ হিসাবে গণ্য করেন না। তাঁর মতে বহির্বিশ্বের চাপই পতনের প্রকৃত কারণ। পেরীর অভিযান না ঘটলে শোগুন-শাসন আরও শতবর্ষ স্থায়ী হ'তে পারত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। অর্থনৈতিক সংকটকে তিনি পতনের কারণ হিসাবে গুরুত্ব দেন নি। তাঁর মতে যদি অর্থনৈতিক সংকটই পতনের প্রকৃত কারণ হত তাহলে অষ্টাদশ শতকেই শোগুন শাসনের অবসান ঘটত, কারণ ঐ সময় জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থায় গুরুতর অবনতি ঘটে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আর্থিক অবস্থার অধিকতর অবনতি ঘটে নি, অথচ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ শোগুন শাসনের অবসান আসন্ন হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে তাঁর মতে পতনের অন্য কোন কারণ ছিল-তা ছিল বৈদেশিক চাপ।[৩৯] Allen-এর গবেষণা-প্রসূত সিদ্ধান্ত হচ্ছে অষ্টাদশ

---

(৩৫) G. C. Allen, A Short Economic History of Modern Japan (Unwin. University Books, paperback) 9th impresion, 1968, দ্রষ্টব্য পৃ: ২০, ২৩

(৩৬) Sir George Samson, Japan—A Short Cultural History, দ্রষ্টব্য। 'What opened the doors was not a summons from without but an explosion from within. (৩৭) দ্রষ্টব্য। পৃ: ৫২৮

(৩৮) William Elliot Griffis, The Mikado's Empire (1895), পৃ: ২৯১ : 'The foreigners and their ideas were the occasion, not the cause, of the destruction of the dual system of government, which would certainly have resulted from the operation of causes already at work before the foreigners arrived. Their pressure served merely to hasten what was already inevitable. The causes operated mainly from within, not from without ; from impulse, not from impact ; and they were largely intellectual.'

(৩৯) Fairbank, Reischauer and Craig—East Asia : The Modern Tranformation, পৃ: ১৯০—৯১, ১৮৮

শতকে নয়, ঊনবিংশ শতকেই জাপান গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক আরনোল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) সভ্যতার সংকটের তিনটি প্রধান লক্ষণ বা কারণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যথা (১) সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর মধ্যে সৃজনী-শক্তির অভাব, (২) সংখ্যাগরিষ্ঠের অর্থাৎ শাসিত শ্রেণীর শাসক শ্রেণীর প্রতি আনুগত্যের তথা অনুকরণ-প্রবণতার অভাব এবং (৩) সামাজিক একতার অভাব। এই তিনটি কারণে যখন কোন সভ্যতা বিনষ্ট হয় তখন বুঝতে হবে সভ্যতা আত্মঘাতী হয়েছে। যেহেতু এই লক্ষণগুলি আভ্যন্তরীণ, সেইজন্য টয়েনবি মনে করেন যে, আভ্যন্তরীণ কারণেই সাধারণতঃ সভ্যতা তথা সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়। তিনি বহিরাক্রমণের প্রতিক্রিয়াও চিন্তা করেছেন। এই বহিরাক্রমণ হচ্ছে তাঁর ভাষায় 'murder' (হত্যা) স্বরূপ। তবে 'murder' অপেক্ষা আত্মহত্যাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন সভ্যতার বিনাশের হেতু হিসাবে। তাঁর ভাষায় 'Civilizations perish through suicide, not by murder.' আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও কুশাসন পরিণতি লাভ করে এক মারাত্মক বিস্ফোরণে। সেই সুযোগে বহিঃশত্রু যে আঘাত হানে তার প্রত্যক্ষ ফল সভ্যতা বা সাম্রাজ্যের বিনাশ। টয়েনবি সভ্যতার সংকটের যে তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন সেগুলি টোকুগাওয়া সভ্যতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতকের শোগুন শাসকেরা সৃজনীশক্তিবিহীন ছিলেন। তাঁদের ক্ষমতার উৎস ছিল শুধুমাত্র সামরিক শক্তি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অর্থাৎ কৃষকশ্রেণী শোগুন সরকারের প্রতি আস্থাবান বা অনুগত ছিল না। তৎকালীন জাপানী সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হওয়ায় একতার অভাব ঘটেছিল। কাজেই আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণ টোকুগাওয়া শাসনকে পরিণামে পতনোন্মুখ করে তোলে। শোগুন সভ্যতা মূলতঃ হয় আত্মঘাতী। Challengeএর তুলনায় Response যথোপযুক্ত না হওয়ায় এই আত্মহত্যার পথ সুগম হয়ে ওঠে।

মোট কথা, আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি-প্রসূত বিস্ফোরণ এবং বহির্চাপ—এই কারণদ্বয় মিলিতভাবে শোগুন শাসনের পতন ঘটায়। আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বহির্চাপের বিস্তৃত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

আভ্যন্তরীণ অবস্থা

(১) শিন্টো ধর্মের পুনরুত্থান :

শোগুন শাসকেরা চীন থেকে আগত বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মকেই রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ

কিন্তু জাপানের নিজস্ব ধর্ম শিন্টোর প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরে শিন্টোকেই রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দিতে আগ্রহী ছিলেন। শিন্টো ধর্মানুযায়ী সম্রাটই হচ্ছেন দেশের প্রকৃত শাসক। অথচ শোগুনেই কার্যতঃ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে বিরাজমান ছিলেন। কাজেই জনসাধারণের চক্ষে শোগুনে শাসনের কোন ধর্মগত বা ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি ছিল না। শোগুন অবৈধভাবে সম্রাটের ক্ষমতা অপহরণ করেছেন—এই চিন্তা জনগণকে শোগুন বিরোধী ক'রে তোলে। ফলে জনগণ সম্রাটের অপহৃত ক্ষমতার পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অষ্টাদশ শতকের প্রচারক প্রখ্যাত নোবুনাগা মোটুরি (Nobunaga Motoori)। তিনি জাপানের জাতীয় জীবনে চৈনিক ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বর্জন ক'রে প্রাচীন জাপানী ভাবধারা এবং শিন্টো ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শোগুন-বিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে শোগুন-বিরোধী Sonno jo-i শ্লোগান জনপ্রিয় হয় মোটুরির-ই প্রচারকার্যের ফলে।

(২) শোগুনের প্রশাসনিক অযোগ্যতা :

শোগুন-শাসনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে শোগুন-শাসকেরা ক্রমশঃ আরামপ্রিয় এবং শাসনকার্যে উদাসীন হয়ে ওঠেন, যেমন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটেরা জীবনে বিলাসিতাকে প্রাধান্য দিয়ে শাসনে অপটু হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম তিনজন শোগুন—ইয়েয়াসু (Ieyasu, ১৬০৩—১৬০৫), হিদেতদ (Hidetada, ১৬০৫—১৬২৩) এবং ইয়েমিটসু (Iemitsu, ১৬২৩—১৬৫১)—অবশ্য জাপানের মধ্যযুগের ইতিহাসে শক্তিশালী শাসকহিসাবেই সুপরিচিত। কিন্তু পরবর্তী শোগুনেরা ধীরে ধীরে শক্তিহীন হয়ে পড়েন। পরবর্তী চারজন শোগুন - ইয়েতসুনা (Ietsuna, ১৬৫১—১৬৮০,) সুনায়োশি Tsunayoshi, ১৬৮০—১৭০৯), ইয়েনোবু (Ienobu, ১৭০৯-১৭১২) এবং ইয়েতসুগু (Ietsugu, ১৭১৩—১৬) —পূর্ববর্তী শাসকদের মত ততটা দক্ষ ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের অনুগত কর্মচারীদের উপর শাসনের দায়িত্ব অর্পণ ক'রে নিজেরা নিশ্চিন্তমনে আরামে কালাতিপাত করতেন। তাঁদের এই অবস্থা অনেকটা ছিল 'বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান' অবস্থার অনুরূপ। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে শোগুন কাউন্সিল সভার প্রবীণ সদস্য হোট্টা মাসাটোশির (Hotta Masatoshi) হত্যার পর শোগুন সুনাযোশি শাসনকার্য থেকে একেবারে হাত গুটিয়ে নিয়ে তাঁরই আস্থাভাজন, প্রধান কঞ্চুকী ইয়ানাগিজাওয়া যোশিয়াসুকে (Yanagizawa Yoshiyasu, ১৬৫৮—১৭১৪) দেশ শাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব

দেন। শাসনকার্যে বিমুখ শোগুন ক্রমশঃ মনোনিবেশ করেন সাংস্কৃতিক চর্চায় এবং বৌদ্ধধর্মাচরণের শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে। সুনায়োশির শাসনকালে প্রশাসনিক শিথিলতা এবং অনিয়ন্ত্রিত অর্থব্যয় দেশে সর্বপ্রথম সঙ্কটের সৃষ্টি করে—প্রশাসনিক সঙ্কট তথা অর্থনৈতিক সঙ্কট। এমন কি তখন মুদ্রার মূল হ্রাসেরও প্রয়োজন হয়। অষ্টম শোগুন হিসাবে এডো প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হন য়োশিমুনে (Yoshimune, ১৭১৬—৪৫)। তিনি অবশ্য দেশ-শাসনে কিছুটা সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন এবং বজ্রমুষ্ঠিতে শাসনভার গ্রহণ করেন। দেশ তখন অতীব অর্থনৈতিক সংকটের কবলে। তাই তিনি আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রবর্তিত সংস্কার কার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রশাসনিক ব্যয়-সংকোচ, ব্যবসা-নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি, কৃষির উন্নতিসাধন এবং চাউলের উৎপাদন-বৃদ্ধি। য়োশিমুনের জীবিতাবস্থায় এইসব সংস্কারমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ায় দেশের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা দেয় কিন্তু তাঁর মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁর প্রবর্তিত উন্নতিমূলক সমস্ত ব্যবস্থাই ভেঙে পড়ে। পরবর্তী দুজন শোগুন—ইয়েশিগে (Ieshige, ১৭৪৫—১৭৬০) এবং ইয়েহারু (Ieharu, ১৭৬০—১৭৮৬)—স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে দেশশাসন না ক'রে পুনরায় অনুগত কর্মচারীদের উপর শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে দেশে দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। একাদশ শোগুন ইয়েনারি (Ienari, ১৭৮৭-১৮৩৭) টোকুগাওয়া শোগুনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল দেশ-শাসনের সুযোগ পান কিন্তু তাঁর শাসনকালে দেশ নিদারুণভাবে অর্থসংকটের কবলে পতিত হয়। তখন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে; দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও আর্থিক অনটনে জনসাধারণের দুর্গতি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। চাউলের অভাবে দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দেয়। পরবর্তী অর্থাৎ দ্বাদশ শোগুন ইয়েয়োশির (Ieyoshi, ১৮৩৭—১৮৫৩) শাসনকালে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সকলপ্রকার অন্তিম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দেশে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় বৈদেশিক শক্তির চক্রান্তে জাপানের সমস্যা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। বৈদেশিক শক্তির চাপে শেষ অবধি শোগুন-শাসনের অবসানও ঘটে। এই অবসান মূর্ত হয়ে ওঠে সর্বশেষ তিনজন শোগুনের শাসনকালে—ইয়েসদ (Iesada, ১৮৫৩—১৮৫৮), ইয়েমোচি (Iemochi, ১৮৫৮—৬৬), এবং য়োশিনোবু বা কেইকি (Yoshinobu বা Keiki, ১৮৬৬—৬৭)। সর্বশেষ শোগুন য়োশিনোবুকে দেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিবিক্ষোভের কাছে নতি স্বীকার ক'রে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পদত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। প্রায় নাটকীয়ভাবে দীর্ঘস্থায়ী (১৬০৩—১৮৬৭) টোকুগাওয়া শোগুন-শাসনের উপর যবনিকা পড়ে। (শোগুন

শাসকদের প্রশাসনিক অযোগ্যতা, বিলাস-প্রবণতা এবং দেশের দুর্গতি ও দুরবস্থার প্রতি ঔদাসীন্য তথা জনগণের রুদ্র রোষ এবং বিদ্রোহ সামগ্রিকভাবে শোগুনশাসনের মূলে কুঠারাঘাত করে এবং শোগুন যুগের সমাধি রচনা করে।)

(৩) দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যা শোগুন-শাসন স্থায়িত্বের অনুকূল ছিল না :

অসম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শোগুন যুগের জাপানের সামাজিক কাঠামো তখন ভঙ্গুর-প্রায় হয়ে উঠেছিল। শহর পত্তন এবং শহরে সভ্যতার বিস্তার তথা মুদ্রার প্রচলন ধনী শ্রেণীর নিকট স্বাগত হলেও কৃষিজীবীদের নিকট অনিষ্ট-মূলক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে চাউলের পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন কৃষকের পারিবারিক জীবনে খুবই অশান্তি ও অনটন আমন্ত্রণ করে। এ বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সম্প্রদায়ের রুদ্র রোষ পড়ে শোগুনের উপর স্বাভাবিক কারণেই। ডাইমিয়োগণের জমি থেকে আয় হ্রাস পাওয়ায় অথচ শহরে জীবন যাপনের ফলে জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁদের অর্থসংকটে পড়তে হয়। স্বাভাবিক কারণেই ডাইমিয়োগণ তাঁদের আর্থিক দুরবস্থার জন্য শোগুনকে দায়ী করেন এবং শোগুন-শাসনের অবসান কামনা করেন। অপরদিকে সামুরাই শ্রেণীও দারুণ আর্থিক অস্বচ্ছলতার সম্মুখীন হন। সামাজিক শ্রেণীবিভাগ আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দীর্ঘ দুইশত বৎসরেরও অধিককাল জাপানের সঙ্গে বহির্বিশ্বের কোন সংযোগ না থাকায় জাপানকে বিদেশের সঙ্গে কোন যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় নি। ফলে সামুরাইদের যোদ্ধা হিসাবে প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। ডাইমিয়োদের কাছে তাঁরা অযথা ভার স্বরূপ হয়ে পড়েন, পরজীবী এবং অপ্রয়োজনীয় শ্রেণীহিসাবে গণ্য হন। ক্রমশঃ সামুরাইদের বেতন ও ভাতা হ্রাস পায়। ফলে তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। এক কথায় দেশময় একটা শোগুন-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। উদ্ভূত অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য শোগুনে যে কৌশল অবলম্বন করেন তা শেষ অবধি অপকৌশলে পরিণত হয়। ডাইমিয়ো ও সামুরাই শ্রেণী যাতে শোগুন-বিরোধী আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত থাকেন সেইজন্য শোগুন তাঁদের আকৃষ্ট করেন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের প্রতি ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে দেশময় একটা সাংস্কৃতিক জাগরণ দেখা দেয়। সাহিত্যচর্চা, বিশেষতঃ ইতিহাস রচনা, প্রসার লাভ করে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মিটোর (Mito) প্রিন্স কোমন (Prince Komon) রচনা করেন ডাই নিহন শি (Dai Nihon Shi, জাপানের ইতিহাস)। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাই সেন্যো (Rai Sanyo) রচনা করেন নিহন গাই শি (Nihon Gwai Shi, শোগুনের উত্থান ও পতনের ইতিহাস

এবং সেইকি (Seiki, জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস)। এই সব রচনায় শোগুনের অবৈধভাবে ক্ষমতাসীন হওয়ার কাহিনী এবং রাজবংশের শোচনীয় অবনতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এই সব গ্রন্থ এবং প্রাচীন জাপানের ইতিহাস পাঠ ক'রে জাপানীরা দৃঢ়নিশ্চয় হন যে সম্রাট শোগুন কর্তৃক প্রতারিত হয়েছেন এবং দেশের প্রকৃত শাসক জিম্মুটেন্নোর বংশধরগণ, শোগুন নন। এই দৃঢ়নিশ্চয়তার ফলশ্রুতি হয় শোগুন-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি। শোগুন যে উদ্দেশ্য নিয়ে দেশে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে মদত দিতে চেয়েছিলেন তা শুধু ব্যর্থ হয়নি, পরন্তু তা শোগুন-শাসনের পরিপন্থী হয়। সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠের ফল হয় দুটি—জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। এই সময় আদর্শবাদী চৈনিক দার্শনিক ওয়াং ইয়াং মিঙের (Wang yang-ming, ১৪৭২—১৫২৯) তত্ত্বগত শিক্ষাপ্রচার শোগুন-বিরোধী আন্দোলনে মদত যোগায়। তাঁর মূল শিক্ষা হল 'আত্মানম্ বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজকে জানতে চেষ্টা কর বা আত্মপরীক্ষা কর। স্বীয় প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না জন্মালে কাহারও নিজ মঙ্গল-অমঙ্গলের বোধ জন্মে না। চৈনিক দার্শনিকের এ হেন শিক্ষা জাপানের জনগণকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে অনুপ্রেরণা দেয়। ফলে জাপানী মনে শোগুন-শাসনেব বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে এবং দেশে শোগুন বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। জাপান এইভাবে এক বিরাট পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এই পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে অর্থনৈতিক সংকট তথা বহির্জগতের সঙ্গে পুনঃসংযোগস্থাপন।

(৪) অর্থ নৈতিক সঙ্কট

স্যার রবার্ট পীল (Sir Robert Peel) ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা গঠন করেন ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে। পীলের এই দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বকাল ১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইংলণ্ড তখন এক নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটের কবলে। জনসাধারণের দারুণ দুর্দশা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অপরিসীম মন্দা, অভূতপূর্ব বেকার অবস্থা; হ্রাসমান রাজস্ব, ক্রমবর্ধমান ঘাটতি বাজেট—সব কিছুর মিলনে তৎকালীন ইংলণ্ডে যে সংকটের উদ্ভব হয় তার বর্ণনা-প্রসঙ্গে পীল বৃটিশ হাউস অব কমান্স-এ এক বিবৃতিতে বলেন—'অর্থমন্ত্রী (চান্সেলার অব এক্সচেকার) তখন এক অতল-স্পর্শ জলাশয়ের তীরে একটি শূন্য-গর্ভ সিন্দুকের উপর উপবেশন ক'রে অর্থাভাব পূরণের জন্য বাজেট-রূপ মৎস্য শিকারে বৃথাই সচেষ্ট ছিলেন। এর চেয়ে দুঃখদায়ক চিত্র আর কি হতে পারে?'[৪০] টোকুগাওয়া শাসনকালে,

(৪০) 'Can there be, asked Peel in 1841, a more lamentable picture than that of a Chancellor of the Exchequer, seated on an empty chest, by the pool of bottomless deficiency, fishing for a budget?' J.A.R. Marriott, England since Waterloo দ্রষ্টব্য পৃ. ১৬১

বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা বহুলাংশে পীল-বর্ণিত ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক অবস্থার অনুরূপ ছিল।

মেজি যুগের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ প্রিন্স মাৎসুকাটা অর্থনৈতিক সঙ্কটকেই টোকুগাওয়া শাসনের অবসানের মুখ্য কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক অ্যালেন (Allen) ও এই মতের সমর্থক। উভয়েরই একই বক্তব্য—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বহু বৎসর যাবৎ জাপানে এক অর্থনৈতিক সংকট বিদ্যমান ছিল। এই সংকট-প্রসূত বিক্ষোভ ও আন্দোলন শোগুন শাসনের পতন অনিবার্য ক'রে তোলে। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে অর্থাৎ প্রথম তিনজন শোগুনের শাসনকালে জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের মাথায় স্বচ্ছল ছিল, বলা যেতে পারে। উক্ত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই স্বচ্ছলতার অভাব প্রথম পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ পঞ্চম শোগুন সুনাযোশির শাসনকালে (১৬৮০—১৭০৯) প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অর্থসংকট দেখা দেয়। অনিয়ন্ত্রিত প্রসাসনিক ব্যয় তথা অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্প-জনিত ক্ষয়ক্ষতির মেরামত বাবদ প্রচুর অর্থব্যয রাজস্বে ঘাটতি সৃষ্টি করে। এই সময় মুদ্রার মূল্য হ্রাসেরও প্রয়োজন হয়। অষ্টাদশ শতকে সাময়িকভাবে আর্থিক উন্নতি দেখা দেয়। এই সময় চাউল ও খনিজ সম্পদ থেকে কিছু রাজস্ব উপার্জিত হয়। এতদ্ব্যতীত বন্দর এবং শহরাঞ্চলে যে সব বণিক ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের নিকট থেকেও কিছু রাজস্ব আদায় হয়। ফলে কিছু পরিমাণে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হয়। তখন বহির্বাণিজ্য না থাকায় শোগুন সরকার আমদানী ও রপ্তানি কর থেকে বঞ্চিত ছিল। অষ্টাদশ শতকের এই সাময়িক অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার পর দেখা দেয় ঊনবিংশ শতকের দীর্ঘস্থায়ী ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট। সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। ১৮০৪ - ১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শোগুন সরকারের মোট আয় ছিল বৎসরে এক মিলিয়ন রায়ো (Ryo, ১ রায়ো=১ ইয়েন)। যতদিন এই আয় বিদ্যমান ছিল ততদিন ঘাটতি দেখা দেযনি। কিন্তু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালে যুদ্ধ জাহাজ ক্রয়, জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন, দুর্গ নির্মাণ এবং জাপানের উপকূল অঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বাবদ সরকারের প্রচুর অর্থব্যয় হতে থাকে, বিশেষতঃ (১৮৩০—৪৩) খৃষ্টাব্দের মধ্যে (টেম্পো যুগ, Tempo era)। এই কালে ব্যয় বৃদ্ধি পায় ১৫ লক্ষ রায়ো থেকে ২৫ লক্ষ রায়ে।[৪১] ফলে বাজেটে ঘাটতি পড়ে। অধিকন্তু রাজস্ব বিভাগের শিথিল শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করতে

(৪১) E. Honjo, The social and economic history of Japan. পৃঃ ২৫২

থাকে। কৃষকেরা অতিরিক্ত করভারে নির্যাতিত হয়ে একাধিকবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৬০৩—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১১৫৩ বার কৃষকবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৮৩৩—৩৭ খৃষ্টাব্দের বৎসরগুলি ছিল অজন্মার বৎসর। বহু কৃষক পরিবার তখন গ্রাম ত্যাগ ক'রে শহরাভিমুখী হয়। ১৮১৯—৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৯ বার জাপানী ইয়েনের মূল্য হ্রাস করা হয়, যা অর্থনৈতিক সংকটের ইঙ্গিত বহন করে। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাপন দুর্বিষহ ক'রে তোলে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পর বহির্বাণিজ্য শুরু হওয়ার ফলে চাউল, চা, এবং কাঁচা রেশম প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হতে থাকে। ফলে দেশের মধ্যে এই সব দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৯—৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চায়ের মূল্য বৃদ্ধি পায় দ্বিগুণ, কাঁচা রেশমের মূল্য বৃদ্ধি পায় তিনগুণ এবং সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পায় বারগুণ। অপর দিকে, বিদেশ থেকে সস্তাদরে কার্পাস বস্ত্র, কার্পাস সুতা ইত্যাদি আমদানী হওয়ার জাপানে উৎপন্ন ঐ জাতীয় দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য হ্রাস পায়। পরিণামে যে সমস্ত জাপানী পরিবার ঐ জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় ক'রে জীবিকা অর্জন করত তারা বিপন্ন হয়ে পড়ে। ডাইমিয়ো ও সামুরাই শ্রেণী ও অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। ডাইমিয়োর জমিদারীর আয় যথেষ্ট হ্রাস পায় অথচ ব্যয়ের বহর হ্রাস পায়নি। পূর্বে আলোচিত সানকিন কোটাই বিধানের ফলে ডাইমিয়োর ব্যয় অধিকতর বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ ডাইমিয়োকে তখন বণিক শ্রেণীর নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ওয়ারি (Owari) জমিদারীর বার্ষিক আয় চাউলের হিসাবে ছিল দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোকু। তখন ঐ জমিদারীর ডাইমিয়োদের ঋণের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ সাতাশ হাজার রায়ো। যদি মোটামুটি ধরা যায় যে এক কোকু চাউলের মূল্য ছিল এক রায়ো, তাহলে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট আয়ের অর্ধেকের কিঞ্চিদধিক।[৪২] ১৮৪৯—৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ওয়ারির ডাইমিয়োদের চাউলের হিসাবে মোট ঋণ দাঁড়িয়েছিল ১'৮ মিলিয়ন কোকু।[৪৩] সাতসুমার ডাইমিয়োদের আর্থিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয় ছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁদের ঋণের পরিমাণ ছিল ১'৩ মিলিয়ন রায়ো। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫ মিলিয়ন রায়ো। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সাতসুমার ডাইমিয়োগণ ওসাকার বণিকদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন

(৪২) Hall তদেব। পৃ ২০৬।
(৪৩) তদেব

৪০ মিলিয়ন রায়ো।[৪৪] সামুরাই শ্রেণীর অবস্থা ডাইমিয়োদের অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর সংকটময় হয়েছিল। তাঁদের এমন কোন সঙ্গতি ছিল না যাতে তাঁরা তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে পারেন। তাই সামুরাইদেরও বণিক শ্রেণীর নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। বণিক শ্রেণীও সুযোগ বুঝে সামুরাই বংশের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়, পোষ্য-সন্তান গ্রহণ এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। ফলে, একদিকে যেমন বণিক শ্রেণী সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অন্যদিকে তেমনি সামুরাই-বণিক মৈত্রী শোগুন-শাসন পতনের পথ সুগম করে।

টেম্পো যুগে (১৮৩০—৪৩) দেশব্যাপী এক ঘোরতর সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ১৮২৪—৩২ খৃষ্টাব্দে অজন্মা, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর জাপানে দুর্ভিক্ষ এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ জাতীয় জীবন পর্যুদস্ত করে তোলে।[৪৫] মোট কথা, উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে শোগুন-শাসিত জাপানে অর্থনৈতিক প্রশাসন একেবারে ভেঙ্গে পড়ায় এক ভয়াবহ সংকটের উদ্ভব হয়, যে সংকটরূপ ঝড়ের সম্মুখে শোগুনের 'সিংহাসন' উচ্ছিষ্ট পাতার মত উড়ে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়। ডাইমিয়ো, সামুরাই, কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীই স্ব স্ব কারণে তখন বিক্ষুব্ধ। অসম করস্থাপন, প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি ও অমিতব্যয়িতা, ঘাটতি বাজেট, রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বৃদ্ধি, ইয়েনের মূল্যহ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া শোগুন-যুগকে অন্তিমকালে পৌঁছে দেয়। তখন সকল শ্রেণীর মানুষই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে এক আমূল পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে উদগ্রীব। শোগুন-শাসনের রুদ্ধ দ্বারের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষ দরজা ভঙ্গ ক'রে বাহিরে এসে এক নূতন পরিবেশের আশায় অধীর হয়ে ওঠে। সেই রুদ্ধদ্বার অর্গল-মুক্ত করে কমোডোর পেরী ১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দ। এ যেন জাপানী জনগণের বন্দীজীবন থেকে মুক্তির স্বাদলাভ।)

বহির্চাপ

পেরী অভিযান :

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

(৪৪) তদেব
(৪৫) তদেব। পৃ. ২০৬

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিলার্ড ফিলমোর (Millard Fillmore) জাপান সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য নৌ-বিভাগের অভিজ্ঞ পদস্থ কর্মচারী তথা বিচক্ষণ কূটনীতিক ম্যাথ্যু সি পেরীকে (Matthew C. Perry) মনোনীত করেন। সুতরাং পেরী ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। তাঁর চারটি কৃষ্ণবর্ণ রণতরী সম্বলিত নৌবহর (Susquehanna) ঐ বৎসর জুলাই মাসে এডো উপসাগরে (Edo Bay) ইউরাগা-র (Uraga) অনতিদূরে নোঙ্গর করে। সমস্ত এডো শহর তখন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এক আসন্ন বিপদের আশঙ্কায়। আমেরিকা জাপান আক্রমণ করতে এসেছে মনে ক'রে ত্রস্ত এডোবাসীরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। যখন এডো শহর এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল এক অভূতপূর্ব ভয়-ভীতি ও আর্তনাদের কবলে, তখন কমোডোর পেরী তাঁর সঙ্গে আনীত প্রেসিডেন্ট ফিলমোরের একটি চিঠি শোগুনের দরবারে পেশ করেন। চিঠিটি গ্রহণ করেন তৎকালীন শোগুন যোশিনোবুর পক্ষ থেকে তাঁর দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। হোয়াইট হাউসের উক্ত চিঠিতে তিন দফা অনুরোধ লিপিবদ্ধ ছিল—(১) যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজের জন্য জাপানের উপকূলে তৈল গ্রহণের সুযোগ দান; (২) অবাধ বাণিজ্যের অনুকূল একটি বাণিজ্যিক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করণ; এবং (৩) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের মৈত্রী স্থাপন। চিঠির উত্তর পেতে কিছু বিলম্ব হবে জানতে পেরে পেরী সাময়িকভাবে চীনের উপকূলে নোঙ্গর করেন। শোগুন ইত্যবসরে সম্রাট কোমিয়ো, ডাইমিয়ো এবং পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবগুলি আলোচনা করেন। বিদেশের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে সম্রাট, ডাইমিয়োগণ, বিশেষতঃ মিটোর ডাইমিয়ো, বিরোধিতা করেন কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা এই সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ ও সম্মতি দান করেন। ফলে ভিন্ন মতাবলম্বী দুইটি দলের সৃষ্টি হয়—জয়তো (Joito) বা বিরোধীদল এবং কাইকোকুটো (Kaikokuto) বা সম্মতিদানে ইচ্ছুক দল। শোগুন বিরোধীদলকে অগ্রাহ্য ক'রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে মনস্থির করেন। ইতিমধ্যে পেরী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে পুনরায় এডোতে উপস্থিত হন। তখন শোগুন তাঁর সঙ্গে একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করেন—কানাগাওয়া সন্ধিপত্র (Treaty of Kanagawa)। দুইশত বৎসরেরও অধিককাল জাপান বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সম্রাট ও ডাইমিয়োদের বিরোধিতা সত্ত্বেও শোগুন নিজ দায়িত্বে সেই বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে বিদেশের নিকট জাপানকে উন্মুক্ত ক'রে যে উদারপন্থী কূটনীতির পরিচয় দেন তা অদূর ভবিষ্যতে শোগুন সরকারের অবসানের পথই প্রশস্ত করে। কানাগাওয়া সন্ধির শর্তগুলি ছিল—(১) নাগাসাকি সমেত আরও দুটি বন্দর বিদেশীয় অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয়

জাহাজের জন্য উন্মুক্ত করা হবে, জাহাজ মেরামতের জন্য, এবং জাহাজে তৈল কয়লা ইত্যাদি গ্রহণের জন্য; (২) শিমোডাতে (এডো থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত) যুক্তরাষ্ট্রের একজন কনসাল নিযুক্ত হবেন; (৩) বিপদগ্রস্ত জাহাজের নাবিকদিগকে আশ্রয় দেওয়া হবে; (৪) জাপানে অন্যান্য বৈদেশিক শক্তিবর্গ যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা (Most-favoured-nation treatment) যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরাও ভোগ করতে পারবেন। পরে ইংলণ্ড, রাশিয়া, এবং হল্যাণ্ড ও জাপানের সঙ্গে অনুরূপ শর্ত-সম্বলিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করেন যথাক্রমে ১৮৫৪, ১৮৫৫ এবং ১৮৫৫-৫৭ খৃষ্টাব্দে।

কানাগাওয়া সন্ধির সর্তানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র সরকার টাউনসেণ্ড হ্যারিশকে (Townsend Harris) কনসাল হিসাবে জাপানে প্রেরণ করেন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে। হ্যারিশ শিমোডোতে উপস্থিত হন ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে। পরে তিনি ২৯শে জুলাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে Harris Treaty নামে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করেন। এই সন্ধিপত্রের শর্তগুলি ছিল—(১) যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে নিয়মিতভাবে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে; (২) পূর্বের তিনটি বন্দর ব্যতীত আরও চারটি জাপানী বন্দর যুক্তরাষ্ট্রের নিকট উন্মুক্ত হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ঐ সব বন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি পাবে; (৩) ঐ সব বন্দরে আমদানী ও রপ্তানী করা দ্রব্যাদির উপর শুল্ক আরোপিত হবে এবং ঐ শুল্কের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে; (৪) জাপানে অবস্থানকারী যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকেরা জাপানী আইনের আওতাধীন হবেন না, তাঁরা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের আইনের অধীন বা আঁতর্রাষ্ট্রিক (Extraterritorial) আইনের অধীন; (৫) জাপানে বৈদেশিক মুদ্রা চালু হবে এবং জাপান থেকে জাপানী মুদ্রা রপ্তানী হবে। সহজেই অনুমেয় যে হ্যারিস সন্ধির সকল শর্তগুলিই ছিল জাপানের স্বার্থের প্রতিকূল।

সম্রাট ও ডাইমিয়োদের মতের বিরুদ্ধে শোগুন এইভাবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক স্থাপন করেন। পরিণামে দেশে একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশ থেকে বৈদেশিক শক্তি বিতাড়ণ। আন্দোলনকারীদের শ্লোগান ছিল সোন্নো-জো-ই (Sonno-jo-i, Reverence the Emperor and exclude the foreigners) অর্থাৎ সম্রাটকে ভক্তি, শ্রদ্ধা কর এবং বৈদেশিক শক্তিবর্গকে দেশ থেকে বিতাড়িত কর। এই শ্লোগান তুলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধী দল বিদেশের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্কস্থাপনকে দেশের স্বার্থবিরোধীরূপে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ১৮৬২ ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের দুটি ঘটনার পর আন্দোলনকারীরা শ্লোগান তোলেন বিদেশী শক্তিকে বিতাড়িত করবার জন্য নয়, শোগুন যুগের অবসান ঘটাবার জন্য। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে

সাতসুমার ডাইমিয়োর নির্দেশে সাতসুমার রাজধানী কেগোসিমায় রিচার্ডসন নামে এক ইংরাজ নিহত হন। ফলে কেগোসিমাকে বৃটিশ নৌবহরের তোপের মুখে পড়তে হয়। দুর্বল শোগুন সরকার কেগোসিমাকে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে নি। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন শিমোনোশেকি প্রণালী দিয়ে কয়েকটি বিদেশী জাহাজ পাড়ি দেয় তখন চোষুর ডাইমিয়োর নির্দেশে তাঁর অনুচরবর্গ জাহাজগুলির উপর গুলিবর্ষণ করে। পরিণামে শিমোনোশেকিকে বৈদেশিক শক্তির প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। শোগুন সরকার চোষুর ডাইমিয়োকে কোন সাহায্যই দিতে পারে নি। এই দুটি ঘটনা প্রমাণিত করে যে, (১) শোগুন ছিলেন সামরিক শক্তিতে দুর্বল এবং (২) জাপানে অবস্থিত আমেরিকা, বৃটিশ, ডাচ প্রভৃতি বৈদেশিক শক্তিবর্গ এত অধিক ক্ষমতাবান ছিল যে তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত শক্তি শোগুন সরকারের ছিল না। তখন চোষু এবং সাতসুমা বিরোধীদলকে নেতৃত্ব দিয়ে শ্লোগান তোলে যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিদেশী বিতাড়ণ নয়, দুর্বল শোগুন শাসনের আশু অবসান ঘটান। চোষু ও সাতসুমা এখন থেকে শোগুন বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে থাকে। সাতসুমা ও চোষু উভয়েই পেরী অভিযানের শুরু থেকেই জাতীয় নেতৃত্ব দাবী করে। ফলে গোড়ার দিকে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ, চোষু নেতৃবর্গ এডো ও কিয়োটোর মধ্যে মধ্যস্থতা ক'রে সম্রাট ও শোগুনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি নোবু গাট্টাই (Nobu Gattai, the union of Court and Shogunate) নামে অভিহিত। চোষুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সাতসুমা চোষুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে চোষু প্রকাশ্যভাবে সম্রাটের সমর্থক হিসাবে কার্যকলাপ শুরু করে। এর প্রতিবাদে সাতসুমাও প্রকাশ্যভাবে শোগুনের সমর্থক হয়। কিন্তু ১৮৬২ এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা দুটির পর সাতসুমা ও চোষু পরস্পরের মধ্যে বৈরীভাব বিসর্জন দিয়ে সম্মিলিতভাবে শোগুন শাসনের অবসান ঘটাতে উদ্যোগী হয়। শুধুমাত্র যে উক্ত ঘটনা দুটি শোগুনকে জনগণের চক্ষে হেয় ও দুর্বল প্রতিপন্ন করে তা নয়। কানাগাওয়া ও হ্যারিশ সন্ধিপত্র দুটিতে প্রথমতঃ স্বাক্ষর দেন শোগুন স্বয়ং, সম্রাট নন।[৪] যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু সন্ধিপত্র দুটিকে বৈধ হিসাবে গ্রহণ করে নি যতদিন না স্বয়ং সম্রাট স্বাক্ষর দেন। যুক্তরাষ্ট্র যে শোগুনকে দেশের আইনসম্মত শাসক হিসাবে স্বীকৃতি দেয় নি ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। ফলে দেশবাসীর চক্ষে শোগুন হেয় প্রতিপন্ন হন। শোগুনের 'সিংহাসন' নড়ে ওঠে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সম্রাট কোমেই-এর (যিনি যুক্তরাষ্ট্রের

সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হন নি) মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন মুৎসুহিতো। মুৎসুহিতো ছিলেন সংস্কারমুক্ত, উদারনীতিক চতুর্দশবয়স্ক সম্রাট। তিনি জাপানের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন, শোগুন শাসনের ও বিরোধী ছিলেন। সুতরাং মুৎসুহিতোর সিংহাসন প্রাপ্তিতে সাতসুমা, চোষু, হিজেন, টোজা প্রভৃতির শোগুন-শাসন বিরোধী আন্দোলন অধিকতার জোরদার হয়। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী পক্ষ তৎকালীন শোগুন যোশিনোবুর নিকট একটি স্মারকপত্র পেশ করেন যাতে তাঁকে পদত্যাগ করতে এবং প্রশাসনিক যাবতীয় ক্ষমতা সম্রাটের হস্তে প্রত্যর্পণ করতে অনুরোধ করা হয়। এডোর অন্তর্গত ইউয়েনো পার্ক (Ueno Park) নামক স্থানে বিরোধী দল ও শোগুনের সমর্থকদের মধ্যে সামান্য সংঘর্ষের পর শোগুন যোশিনোবু পদত্যাগ করেন। জাপানের ইতিহাসে তিনি সর্বশেষ শোগুন হিসাবে পরিগণিত। শোগুন শাসনের সূচনা ১১৯২ খৃষ্টাব্দে এবং পরিসমাপ্তি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কাল তা বাকুমাৎসু নামে অভিহিত (Bakumatsu—বাকু অর্থে শেষ, মাৎসু অর্থে বাকুফু অর্থাৎ শোগুনযুগের পরিসমাপ্তি)[৪৬]। ১৮৬৮ থেকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাল মেজী যুগ (Meiji era) নামে প্রসিদ্ধ।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে নেপালে স্বৈরাচারী রাণা-শাসনের অবসানে নেপালের মহারাজা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সেই সঙ্গে বহির্বিশ্ব থেকে নেপালের দীর্ঘস্থায়ী বিচ্ছিন্ন অবস্থার ও অবসান ঘটে। নেপালের ইতিহাসে এই পট-পরিবর্তন স্মরণ করিয়ে দেয় জাপানের ইতিহাসে উপরোক্ত রাজনৈতিক বিবর্তনের কথা। ১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে শোগুন-শাসনের অবসান যেন জাপানী রাণা-শাসনের অবসান, যার ফলে জাপানী সম্রাট প্রকৃত ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে জাপানের বিচ্ছিন্নতার ও অবসান ঘটে।

(শোগুন-শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য যে কৃতিত্ব তা কি সমাজের কোন একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর এককভাবে প্রাপ্য কিংবা এই কৃতিত্ব সর্বশ্রেণীর যৌথভাবে প্রাপ্য? কোন কোন ঐতিহাসিক (যেমন Hall) মনে করেন যে যদিও কৃষক এবং বণিক সম্প্রদায় শোগুন-শাসন অবসানের আন্দোলনে যোগদান করেছিল, নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রধানতঃ সামুরাই শ্রেণী।[৪৭] ঐতিহাসিক লাটুরেটের (Latourette) মতে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের আন্দোলনের কৃতিত্ব নিম্নশ্রেণীর সামুরাইদেরই প্রাপ্য, সম্ভ্রান্তশ্রেণীর নয়।[৪৮] এলবার্ট ক্রেইগ (Albert Craig) কিন্তু শোগুন

(৪৬) Fairbank, তদেব। পৃ ২০৩

(৪৭) Hall, Japan. তদেব। পৃ ২৬৬

(৪৮) Latourette, History of Japan. পৃ ৯২

শাসনের অবসান এবং মেজী যুগের অবতারণার জন্য আন্দোলনকে কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর সামুরাইদের আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করতে চান না।[৪১] বস্তুত উক্ত আন্দোলনকে কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর সামুরাইদের আন্দোলন হিসাবে বর্ণনা করতে কিছু অসুবিধা আছে। কারণ, নিম্নশ্রেণীর সামুরাই ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর সামুরাইগণও আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, যথা যোশিদা শোয়িন (Joshida Shoin), কিডো কোয়িন (Kido Koin), টাকাসুগি শিনসাকু (Takasugi Shinsaku), কুসাকা গেনজুই (Kusaka Genjui), ইনৌ কোরু (Inoue Kaoru), মেবারা ইসসি (Maebara Issei), হিরোজাওয়া সানেওমি (Hirozawa Sanecomi), ওমুরা মাসুজিরো (Omura Masujiro) প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ছিলেন বুদ্ধিজীবী (Sonno jo-i intellectuals)। সামুরাই শ্রেণী ব্যতীত কৃষক শ্রেণীও আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। বণিক সম্প্রদায়ের অর্থসাহায্য ব্যতীত আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হত কি না সন্দেহ। ডাইমিয়োগণেরও, বিশেষতঃ চোষু ও সাতসুমার ডাইমিয়োগণের, ভূমিকা অনস্বীকার্য। মোট কথা, আন্দোলনের সূচনা ও সাফল্য সর্বশ্রেণীর সহানুভূতি ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলশ্রুতি।

(৪১) Journal of Asian Studies. Vol XVIII, No. 2. feb 1959, পৃঃ ১৮৭-১৯৭ দ্রষ্টব্য

তৃতীয় অধ্যায়
—মেজী যুগ (১৮৬৮—১৯১২)

—সম্রাটের পুনর্বাসন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক বিবর্তন, মেজী সংবিধান (১৮৮৯), মেজী চিন্তাধারা, মেজীযুগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।

শোগুনযুগ অবসানের পর জাপানে যে যুগ শুরু হয় তার নাম মেজীযুগ—বুমেই কাইকা নো জিডাই (Bummei Kaika no Jidai বা Age of Enlightenment)। মেজী শব্দের অর্থ সভ্যতা এবং জ্ঞানদীপ্তি। শোগুনোত্তর যুগে জাপানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা প্রবাহিত হয় এক নূতন খাতে, যে জীবনধারা ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাই মেজীযুগের অভ্যুদয়ে জাপানী জীবনে পাশ্চাত্য ছাপ ধীরে ধীরে স্পষ্ট থেকে সুস্পষ্ট হতে থাকে।

(১) মেজীযুগের অপর নাম পুনর্বাসনের যুগ (Age of Restoration)

মেজীযুগের আবির্ভাবের গোড়ার কথা সম্রাটের পুনর্বাসন ও তাঁর হৃত ক্ষমতার পুনরুদ্ধার। সেইজন্য মেজী যুগ Age of Restoration (Meiji Ishin) নামে অভিহিত। শোগুন যুগে সম্রাটের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কিয়োটোর প্রাসাদ, যেখানে তিনি ক্ষমতাহীন অবস্থায় প্রায় বন্দী জীবন যাপন করতেন। শোগুনের বাসস্থান ছিল এডো শহরে যা ছিল তৎকালীন কর্মমুখর প্রশাসনিক মুখ্যকেন্দ্র। সম্রাটের প্রশাসনিক সমস্ত ক্ষমতাই শোগুন অপহরণ ক'রে নিজকে জাপানের মুকুটহীন সম্রাট হিসাবে জাহির করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শোগুন শাসনের অবলুপ্তির পর সম্রাটের আসন স্থানান্তরিত হয় এডো প্রাসাদে। অনেকের মতে সম্রাট এখন থেকে তত্ত্বগতভাবে এবং কার্যতঃ উভয়রূপেই দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে দেশ শাসনে প্রকৃত সম্রাট-সুলভ ভূমিকা গ্রহণ করেন। শোগুন শাসনের অবসানে সম্রাটের রাজধানী কিয়াটো থেকে এডোতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সম্রাটের স্বক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা (Restoration) ঘটেছিল কি না এবং সম্রাট কার্যতঃ স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন কিনা, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। হারবার্ট নরম্যানের[১] মতে

(১) E. Herbert Norman, Japan's emergence as a modern state পৃ. ১২

রেস্টোরেশনের অর্থ হচ্ছে শোগুন যুগের দ্বৈতশাসনের অবলুপ্তি এবং পূর্বাবস্থার অর্থাৎ প্রাক্ শোগুন যুগের অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দ্বৈতশাসন বিদ্যমান থাকাকালীন সম্রাট ছিলেন আইনতঃ (de jure) শাসক, আর কার্যতঃ (de facto) শাসনাধিকার ছিল শোগুনের হস্তে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দ্বৈতশাসন অবসানের ফলে শোগুনপদ অবলুপ্ত হয় এবং পূর্বাবস্থার প্রত্যাবর্তন ঘটে অর্থাৎ সম্রাটই আইনতঃ তথা কার্যতঃ উভয়রূপেই দেশ শাসনের অধিকারী হন। সুতরাং নরম্যানের মতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যথার্থ 'Restoration' ঘটে। নরম্যানকে সমর্থন ক'রে স্যানসম (Sir George Sarsom) এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পরিবর্তনের ফলে সামন্ততন্ত্র অবলুপ্ত হয় এবং সম্রাটের একাধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এই পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা চলে না (There was no Revolution but only Restoration)। বেসুরো মত প্রকাশ করেন হেরল্ড ভিনাক।[২] তিনি বলেন, রেস্টোরেশনের ফলে সম্রাটের ব্যক্তিগত ক্ষমতা (Personal authority) প্রতিষ্ঠিত হয়নি অর্থাৎ শোগুন কর্তৃক অপহৃত শাসন ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের করায়ত্ত হয়নি। সে ক্ষমতার অধিকারী হন পশ্চিম জাপানের সাতসুমা, চোষু, টোজা ও হিজেনের নেতৃবৃন্দ। এই সব নেতৃবৃন্দ টোকুগাওয়া শোগুনের পরিবর্তে সম্রাটের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ভিনাককে সমর্থন করেছেন কুইগলি (Quigley) ও টারনার (Turner) এবং লাটুরেট (Latourette)। কুইগলি ও টারনারের[৩] মতে রেস্টোরেশনের ফলে সম্রাট ক্ষমতা ফিরে পাননি, ফিরে পান আত্মমর্যাদা। (The Restoration of 1868 meant a restoration of the Emperor to dignity, not to power)। লাটুরেটের মতে রেস্টোরেশনের ফলে সম্রাট তত্ত্বগত হিসাবে ক্ষমতা ফিরে পান সত্য কিন্তু কার্যতঃ তাঁর ব্যক্তিগত শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। পূর্বে ছিল টোকুগাওয়া শোগুনের শাসন। তৎপরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় শোগুন বিরোধী সাত-চো-টো-হি (সাতসুমা-চোষু-টোজা-হিজেন) শাসন। কাজেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সম্রাটের অবস্থা যথাপূর্বং থেকে যায়। Reischauer[৪] এর মতে, রেস্টোরেশন সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসন ঘোষণা করলেও প্রকৃত শাসনভার তাদেরই হস্তে ন্যস্ত থাকে যাঁরা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

(২) Harold Vinacke, History of the Far East in modern times, পৃঃ ৯৭

(৩) Quigley and Turner, New Japan : Government and Politics

(৪) Fairbank etc, তদেব পৃঃ ৪৪৪

মূল কথা হচ্ছে, রেস্টোরেশনের পর মুৎসোহিতো স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণের সুযোগ পেলেও সে সুযোগ নিতে ভরসা পান নি। তার প্রধান কারণ, তাঁর শাসনকার্যে অনভিজ্ঞতা। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা-রহিত স্বল্প বয়স্ক সম্রাটের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে দেশ শাসনের গুরুভার বহন করা সম্ভবপর হয়নি। তাই তাঁকে সাতসুমা ইত্যাদি গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল থাকতে হয়। প্রশাসনিক ব্যাপারে এই সব নেতৃবৃন্দই হন সম্রাটের প্রতিনিধি। ফলে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় এক অলিগার্ক গোষ্ঠীর নিকট থেকে অপর এক অলিগার্ক গোষ্ঠীর নিকটে। তবে ইহাও অনস্বীকার্য যে পূর্বসূরীর বন্দীদশামুক্ত মুৎসুহিতোর ব্যক্তি স্বাধীনতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। জনচিত্তের উপর তাঁর প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। সম্রাটের এডো-স্থিত রাজপ্রাসাদ প্রকৃত প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাজাজ্ঞা অনুশাসন প্রভৃতি ঘোষিত হতে থাকে সেখান থেকেই। সম্রাট আর পূর্বের মত উপেক্ষিত থাকেন নি। তিনি আর পূর্বের মত ক্ষমতাবিহীন অবস্থায় শুধুমাত্র সিংহাসনের শোভাবর্ধনের জন্য চিহ্নিত হন নি। তত্ত্বগতভাবে এবং কার্যতঃ উভয়রূপেই তিনি দেশের অধীশ্বর হিসাবে বরণীয় ও স্বীকৃত হন, যদিও তিনি স্বহস্তে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে ভরসা পান নি। তাই তাঁরই নামে, তাঁরই পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনার ভার অর্পিত হয় সাতসুমা ইত্যাদি গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের উপর। তখন উক্ত গোষ্ঠী-চতুষ্টয়ের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চোষুর কিডো (Kido) এবং ইটো (Ito Hirobumi), সাতসুমার সাইগো (Saigo) এবং ওকুবো (Okubo), টোস্তার ইতাগাকি (Itagaki) এবং হিজেনের ওকুমা (Okuma)। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই সব নেতারা যে সরকার গঠন করেন তার নাম হয় সাত-চো-হি-তো সরকার। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য প্রথমতঃ তিনটি বিভাগ সৃষ্ট হয়। প্রথম বিভাগের প্রধান ছিলেন রাজপরিবারভুক্ত। দ্বিতীয় বিভাগ গঠিত ছিল রাজসভার সদস্য (কুগে) ও ডাইমিয়োদের নিয়ে। তৃতীয় বিভাগ গঠিত ছিল পাঁচ জন কুগে এবং পনের জন সামুরাই নিয়ে। এই তিন বিভাগের উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দেই শাসন-ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় যখন উক্ত তিনটি বিভাগের সমগ্র ক্ষমতা অর্পিত হয় দুই কক্ষ সম্বলিত একটি আইন সভার উপর (Daijokwan)। এই কক্ষ দুটি ছিল কাউন্সিল অব স্টেট এবং এসেম্বলী। এই দুই কক্ষের মধ্যে প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পিত হয় কাউন্সিলের উপর।

একই বৎসরে অর্থাৎ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাসন-সংক্রান্ত একটি শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথ ঘোষিত হয় একটি সনদের আকারে (Charter

Oath of five articles)। সনদের অনুচ্ছেদগুলি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যথা (১) দেশের বিস্তৃত অঞ্চল থেকে জন প্রতিনিধি আহ্বান ক'রে একটি আইন সভা গঠিত হবে এবং নিরপেক্ষ আলোচনার মাধ্যমে শাসনবিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ; (২) শাসক ও শাসিত উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতায় শাসনকার্য পরিচালিত হবে ; (৩) সকল শ্রেণীর নাগরিক—সরকারী কর্মচারী, সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ—যাতে ধর্মবিমুখ এবং অসন্তুষ্ট না হন তজ্জন্য তাদের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশা দান করতে হবে ; (৪) অতীতের কুরুচির পরিচায়ক রীতিসমূহ বর্জিত হবে এবং সকলের আচরণ ন্যায় ও নৈতিক ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হবে ; (৫) জাপান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে জ্ঞান ও শিক্ষণীয় বিষয় অন্বেষণ করা হবে।

(২) মেজীযুগের আবির্ভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া ঃ

(ক) সামন্ততন্ত্রের অবসান ঃ

শাসন-পদ্ধতি যাতে কেন্দ্রীভূত হয় সেই উদ্দেশ্যে জাপানের নব-গঠিত সাত-চো-হি-তো সরকার সামন্তপ্রথা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বপ্রথম চোষু নেতা কিডো ও সাতসুমা নেতা সাইগো ডাইমিয়ো হিসাবে পদত্যাগ ক'রে জমি ও প্রজা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করেন। অন্যান্য ডাইমিয়োগণও তখন তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ ক'রে স্ব স্ব জমিদারী বিষয়ক দলিল পত্রাদি সম্রাটের হস্তে অর্পণ করেন। এইভাবে প্রথমে প্রথা-বহির্ভূত পদ্ধতিতে সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হয়। পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথানুযায়ী সম্রাট স্বয়ং আদেশ জারি ক'রে সামন্ত প্রথার অবসান ঘটান।

সামন্ত প্রথার অবসান বিভিন্ন শ্রেণীর উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ডাইমিয়োগণের জন্য পেনসনের ব্যবস্থা হয়। স্থির হয় যে প্রতি ডাইমিয়ো তাঁর জমিদারী থাকাকালীন প্রাপ্য জমির আয়ের এক-দশমাংশ পেনসন হিসাবে পাবেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিমাসে পেনসন দেওয়ার পরিবর্তে সর্বসাকুল্যে মোট প্রাপ্য পাওনা এককালীন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডাইমিয়োগণকে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া হয়। তাঁদের ঋণের কিছু অংশ সরকার বাতিল ক'রে দেন এবং অবশিষ্ট অংশ পরিশোধের দায়িত্ব সরকার স্বয়ং গ্রহণ করেন। সামুরাইগণের ভরণপোষণের দায়িত্ব থেকেও ডাইমিয়োগণ মুক্তি পান। এই দায়িত্ব অর্পিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ডাইমিয়োগণের অবস্থার উন্নতিই হয়েছিল, বলা চলে।

কিন্তু সামুরাইদের চিরাচরিত জীবনযাপনের মান বজায় রাখার উপযোগী উপার্জনের সংস্থান হয়নি। তাদের বৃত্তি হ্রাস পায়। ফলে সামুরাই সম্প্রদায়কে—১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মোট সাড়ে চার লক্ষ সামুরাই পরিবারের বসতি ছিল—অস্ত্র ত্যাগ ক'রে বণিকের মানদণ্ড ধারণ করতে হয়। কিন্তু বণিকের বৃত্তিতে তাদের অপটুতা তাঁদিকে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ক'রে প্রশাসনিক পদের প্রার্থী হতে বাধ্য করে।

জমিদারী প্রথার অবসানের ফলে কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জাপানী জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ ছিল কৃষকসম্প্রদায়-ভুক্ত। জমিদারী প্রথার অবলুপ্তির পর কৃষক জমিদারকে খাজনা দেওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়। এর অর্থ এই নয় যে কৃষক এখন থেকে নিষ্কর জমি ভোগদখলের সুযোগ পায়। এখন থেকে কৃষককে খাজনা দিতে হয় সরকারের খাজাঞ্চিখানায়। আবার, এই খাজনা দেয় ছিল চাউলের মাধ্যমে নয়, মুদ্রার মাধ্যমে। মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা দেওয়া কৃষকের পক্ষে কষ্টদায়ক হয়। ফলে অনেক কৃষকই জমি ত্যাগ ক'রে শহরে আশ্রয় নেয় মজুর হিসাবে জীবিকা অর্জনের জন্য। যারা স্ব গ্রামেই থেকে যায় তারা জমি বিক্রয় ক'রে বিক্রীত জমি অপরের প্রজা হিসাবে আবাদ ক'রে প্রাণধারণ করে। এইভাবে জাপানে চালু হয় প্রজার সাহায্যে ভূমিচাষের ব্যবস্থা। জমিদারী প্রথা থাকাকালীন কৃষকের সাংসারিক প্রাচুর্য না থাকলেও দুই মুষ্টি অন্নের অভাব ছিল না। তখন জমিদারের পিতৃ-সুলভ তত্ত্বাবধানে কৃষক কষ্টে ক্লিষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে পারত কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের পর খাজনা বৃদ্ধির প্রকোপে এবং মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার বিধি চালু হওয়ার ফলে কৃষকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।[৫]

(খ) সামাজিক শ্রেণীর পুনর্বিন্যাস :

সামন্ত প্রথার উচ্ছেদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জাপানী সমাজে পুরাতন শ্রেণী বিন্যাসের রদবদল হয়। সম্রাট আইনতঃ জমির মালিক হওয়ায় পূর্বতন জমিদারগণ সাধারণ নাগরিকে পরিণত হন। সামুরাই শ্রেণীর পূর্ব আভিজাত্য ও বিনষ্ট হয়। পূর্বে সৈন্যবাহিনী গঠনে একমাত্র সামুরাই শ্রেণীরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। কিন্তু সৈন্যদলে যোগদান বাধ্যতামূলক ঘোষিত হওয়ায়

(৫) Under the 'paternal care' of the feudal lord, the peasant 'neither died nor lived.' In the new society (after 1871) the peasants were free to choose their own fate ; to live or die, to ramain on the land or sell out and go to the city. Thus the way was opened for the dispossession of the peasantry and the creation of modern Japanase agriculture with its unique tenant-landlord relations. Clyde and Beers, The Far East. পৃ. ১২১

পর সকল শ্রেণীর যোগ্য নাগরিকদের সৈন্যদলে যোগদানের সুযোগ আসে। সামুরাই শ্রেণীর সৈন্যবাহিনী গঠনে পূর্বের একচেটিয়া অধিকার অবলুপ্ত হয়। ফলে সামুরাইগণ তখন ডাইমিয়োদের মত সাধারণ নাগরিকে পরিণত হন। এমন কি, এতা বা হাইনান শ্রেণীও সমাজে আর ঘৃণিত এবং অবহেলিত শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত থাকে না। আইনতঃ এই শ্রেণী এখন থেকে সমাজে সসম্মানে জীবন ধারণের অধিকার পায়।

(গ) পাশ্চাত্য-সভ্যতা ভিত্তিক সমাজ গঠন (Westernization of society.)

দীর্ঘকালের ডাচ-ভাষা শিক্ষণের ঐতিহ্য ও ডাচ সংস্কৃতির প্রভাব তথা পেরী অভিযান জাপানের জাতীয় জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আমন্ত্রণ করে। নব্য জাপানের নেতৃবর্গ পাশ্চাত্যসভ্যতা-ভিত্তিক সমাজ গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতায় দীক্ষিত হয়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহের সমকক্ষ হওয়া। 'য়ুরোপ যে শক্তিতে পৃথিবীতে সর্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তি দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নিচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোনোকালে আর ওঠবার উপায় থাকবে না। এই কথাটি যেমনি তার (জাপানির) মাথায় ঢুকল অমনি সে আর এক মুহূর্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। ইতিহাসে এত বড়ো আশ্চর্য ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।'[৬] জাপানীরা মিশ্রজাতি। ফলে জাপানী জাতির মধ্যে বর্ণসংকরতা ঘটেছে। 'যে জাতির মধ্যে বর্ণসংকরতা খুব বেশী ঘটেছে তার মনটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় না। প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের সংঘাতে তার মনটা চলনশীল হয়ে থাকে। এই চলনশীলতাই মানুষকে অগ্রসর করে। এ কথা বলা বাহুল্য যে জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম প্রবল সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ ক'রে নিতে পারে। যার মন স্থাবর, বাইরের জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে; কারণ তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রচন্ড একটা বোঝা।'[৭] স্বভাবতঃ জঙ্গম মন এবং জাতি-সংকরতা ব্যতীত স্থান-সংকীর্ণতাও জাপানী জাতিকে পশ্চিমী সভ্যতাকে আপন সম্পদ ক'রে নিতে খুবই সাহায্য করেছে। জাপান পরিসরে চীন বা ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক ছোট। ছোট জায়গাটি সমগ্র জাতির মিলনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। 'চীন বা ভারতবর্ষের মত বিস্তীর্ণ জায়গায় বৈচিত্র্য কেবল

(৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাপানে পারস্যে, পৃঃ ৯৯
(৭) তদেব। পৃঃ ৯৩—৯৪

বিভক্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে, সংহত হতে চায় না।[৮] স্থান-সংকীর্ণতার জন্য জাপানে বৈচিত্র্য সংহত হয়েছে। 'অল্প-পরিসরের জায়গায় সমস্ত জাতি অতি সহজেই একভাবে ভাবতে, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হতে পেরেছে। তাই যে-মুহূর্তে জাপানের মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তা স্থান পেলে যে, আত্মরক্ষার জন্য য়ুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, সেই মুহূর্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠল'।[৯] পশ্চিমী সভ্যতার বিরোধী সম্রাট কোমেই (Komei)-এর মৃত্যু এবং উদার স্বভাব মুৎসুহিতোর সিংহাসন-প্রাপ্তি জাপান কর্তৃক পশ্চিমী সভ্যতা গ্রহণের পথ অধিকতর সুগম করে। জাপানী নেতৃবৃন্দ পশ্চিমী ধাঁচে জাপানকে গড়ে তুলতে দৃঢ়সংকল্প হন। ফলে শুরু হয় পশ্চিমী সভ্যতার উপকরণ দিয়ে জাপানের নূতন সমাজের ভিত্তি নির্মাণের প্রচেষ্টা। পূর্বে জাপানী সমাজে দন্ত পরিষ্কারের জন্য পাওডার, পেস্ট বা ব্রুশের চলন ছিল না। এখন সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সবের চলন শুরু হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে য়ুকোহামায় সর্বপ্রথম গ্যাসের বাতি প্রজ্বলিত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে টোকিয়োতে সর্বপ্রথম বিজলী বাতি প্রচলিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাক ও তারের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ নির্মিত রেলপথের দৈর্ঘ্য দাড়ায় তিন হাজার মাইল। ফলে দূরপাল্লার পথে পাড়ি দিতে সুবিধা হয়। দীর্ঘকালের ঐতিহ্যপূর্ণ পূর্ব এশিয়ার 'লুনার' ক্যালেণ্ডারের পরিবর্তে চালু হয় পশ্চিমী 'গ্রিগোরিয়ান' ক্যালেণ্ডার। এই নূতন ক্যালেণ্ডার প্রচলনের ফলে সাতদিনে এক সপ্তাহ হয়, রবিবার কর্মবিরতির দিন হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং ৩ই ডিসেম্বর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ গণনায় দাঁড়ায় ১লা জানুয়ারী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ। যাতায়াতের সুবিধার জন্য যেমন রেলগাড়ী চালু হয়, তেমনি চালু হয় রিক্সগাড়ীর পরিবর্তে মোটর যান। পশ্চিমী ছাঁচে জাপানী সমাজকে সজ্জিত করবার কালে জাপানী মনকে গোঁড়ামি-মুক্ত করবার প্রচেষ্টাও হয়। যেমন, স্বয়ং সম্রাট গোঁড়ামি ত্যাগের পথ প্রদর্শন করেন গো-মাংস ভক্ষণ ক'রে। অনুরূপ সামাজিক চিত্র আমরা পাই উনবিংশ শতকের বঙ্গদেশেও যখন ডিরোজিও-র যুবক শিষ্যগণ সুরাপান ও গোমাংস ভক্ষণের মাধ্যমে কুসংস্কার-মুক্তির পথ নির্দেশে প্রয়াস পান। রাজনারায়ণ বসু এই বিষয় উল্লেখ করে লিখেছেন: 'তখনকার সময়-গুণে ডিরোজিয়োর যুবক শিষ্যদের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে মদ-খাওয়া ও খানা-খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে

(৮) তদেব। পৃ. ১৫
(৯) তদেব।

করিতেন, এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা।[১০] রাজনারায়ণের উক্তি উনবিংশ শতকে জাপানী সমাজের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেশ-বিন্যাস, শ্মশ্রু-ধারণ এবং পোষাক-পরিচ্ছদেও পাশ্চাত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ সরকারী অফিস-কাছারি ও সরকারী অনুষ্ঠানে আদর্শ পরিচ্ছদ হিসাবে স্বীকৃত হয়। লণ্ডনের বিখ্যাত দর্জিপাড়া সেভিল রো (Seville Row)-র নাম অনুকরণে জাপানের আধুনিক সামাজিক পোষাকের নামকরণ হয় সেবিরো (Sebiro)।[১১] মহিলাদের পরিচ্ছদে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নি, কারণ তাঁরা সাধারণতঃ অন্তঃপুরে বাস করতেন। তাবে স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর অনুকরণে সমাজের বিবাহিতা মহিলারা ভ্রু-ক্ষৌর তথা দন্ত কৃষ্ণবর্ণ করার প্রাচীন রীতি পরিহার করেন।[১২]

১৮৮০ দশকের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণের উন্মাদনা চরম সীমায় পেঁছায়। তখন নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক পশ্চিমী ধরণে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। অভিজাতবংশীয় মহিলারা বিদেশী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন, এমন কি বল-রুম নৃত্যও। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানী সরকার প্রচুর অর্থ-ব্যয়ে টোকিও শহরে রোকুমেইকান (Rokumeikan) নামে একটা প্রশস্ত কক্ষ নির্মাণ করেন। সেখানে প্রতি রবিবার রাত্রিকালে সমাজের সম্ভ্রান্ত ও কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের আনন্দবর্ধনের জন্য নৃত্যের বন্দোবস্ত হত। সমাজের রক্ষণশীল দল পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণের আধিক্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং চিরাচরিত পদ্ধতিতে জীবনধারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

(ঘ) শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

পশ্চিমী সভ্যতা-ভিত্তিক সমাজ-গঠন সার্থক করতে হলে শিক্ষা-ব্যবস্থারও সংস্কার প্রয়োজন। তাই মেজী জাপানের নেতৃবৃন্দ পশ্চিমী ধাঁচে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের চার্টার ওথ-এর সর্বশেষ বা পঞ্চম অনুচ্ছেদে সম্রাটের নির্দেশ ছিল যে জাপানী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের জন্য পৃথিবীর সকল দেশ থেকেই জ্ঞান ও শিক্ষণীয় বিষয় অন্বেষণ করতে হবে। এই নির্দেশ অনুযায়ী সাত-চো-তো-হি সরকার জাপানী ছাত্রগণকে জ্ঞানান্বেষণে বিদেশে প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অবশ্য প্রাক্-মেজী যুগে অর্থাৎ শোগুন যুগেও এই পরিকল্পনা কার্যকরী ছিল। যেমন এনোমোটো (Enomoto) ছিলেন সর্বপ্রথম জাপানী ছাত্র যিনি শোগুন যুগে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি নেদারল্যাণ্ডস্-এ যান।

---

(১০) রাজনারায়ণ বসু, একাল ও সেকাল। পৃ ৩২

(১১) Fairbank, তদেব। পৃ ২৬৪

(১২) তদেব

ইটো এবং ইনোয়ু (Inoue) লণ্ডনে যান ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। মোরি আরিনোরি (Mori Arinori) লণ্ডনে যান ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। শোগুন যুগের এই ব্যবস্থা মেজীযুগেও চালু থাকে। মেজীযুগেও অনেকে বিদেশ গমন করেন জ্ঞানান্বেষণে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইটো, ইনোয়ু, সাইগো, সুসুমিচি, এনোমোটো, মোরি আরিনোরি এবং আরও অনেকে। বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এঁরাই জাপানী সমাজের আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। মেজী সরকার অবশ্য কিছুদিন য়ুরোপ থেকে শিক্ষক এবং শিল্পজ্ঞানবেত্তাদের ভাড়া ক'রে এনেছিলেন, ঘরে বসে বিদেশীজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পাবার জন্য। 'অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে ও দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে—কেবল পালটা এমন আড় ক'রে ধরেছে যাতে পশ্চিমেব হাওয়াটা তার উপরে পুরো এসে লাগে।'[১৩] উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩৪ জন খনিশিল্পে কুশলী বিদেশী আমন্ত্রিত হন খনিশিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য। ১৮৬৮—৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আর. এইচ. ব্রাণ্টন (R. H. Brunton) নামে এক ইংরাজ আমন্ত্রিত হন নৌবাহ বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সরকারের শিল্পবিভাগ ১৩০ জন বিদেশীকে নিযুক্ত করেন শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য। বহু জার্মান চিকিৎসকও জাপানে আমন্ত্রিত হন। ফলে জাপানী চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি ঘটে। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই. এস. মর্স (E. S. Morse) আমন্ত্রিত হয়ে জাপানে আসেন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ এবং প্রাণীতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক আর্নেস্ট ফেনোলোজা (Ernest Fenollosa) ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ আমন্ত্রিত হন। তিনি জাপানের দেশীয় সুকুমার শিল্পের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে উৎসাহ দেন।[১৪]

শোগুন যুগে বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনুবাদের জন্য ১৮১১ খৃষ্টাব্দে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। মেজীযুগেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশী ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে জাপানীদের মধ্যে পাশ্চাত্যজ্ঞান ও ভাবধারা প্রসারলাভ করে। এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা ও উৎসাহদাতা ছিলেন উত্তর ক্যাস্যুর সামুরাই-বংশীয় ফুকুজাওয়া ইউকিচি (Fukuzawa Yukichi ১৮৩৫—১৯০১)। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রচনা করেন সেইয়ো জিজো (Seiyo

---

(১৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব। পৃ ৯১

(১৪) Fairbank, তদেব। পৃ ২৭১—৭২

Jijo, Condition in the west), যেখানে তিনি য়ুরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে দেড় লক্ষ কপি বিক্রয় হয়। তিনি পরবর্তীকালে রচনা করেন গকুমন নো সুসুমে (Gakumon no Susume বা Encouragement of Learning)। এই গ্রন্থের সাত লক্ষ কপি বিক্রয় হয়। ফুকুজাওয়া এবং আরও পনের জন বুদ্ধিজীবী (যথা মোরি) ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মেইরোকুশ (Meirokush) নামে একটা সোসাইটি গঠন করেন। বক্তৃতা এবং একটি পত্রিকার মাধ্যমে এই সোসাইটি জাপানীদের মধ্যে পশ্চিমী জ্ঞান ও ভাবধারা জনপ্রিয় করবার প্রয়াস পায়। ফুকুজাওয়ার সঙ্গে আরও অনেক বুদ্ধিজীবী সহযোগিতা ক'রে ইংরাজী ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন, যেমন সেমুয়েল স্মাইলস্ এর (Samuel Smiles) Self Help, জন স্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill) এর On Liberty, একাধিক নাটক, রবিনশন ক্রুশো, জুলভার্নের কাহিনী ইত্যাদি। মোট কথা, সম্রাটের পুনর্বাসনের পর প্রথম কয়েক দশকে বিদেশী সাহিত্যের জাপানী ভাষায় অনুবাদ জাপানের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।)

(মেজী সরকার জাপানে এক নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনে সচেষ্ট হন। মেজীশাসনের প্রথম বৎসরেই কিয়োটোতে কো-গাকু (Ko Gaku) এবং কান-গাকু (Kan Gaku)-ভিত্তিক দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কো-গাকু বলতে বুঝায় ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতি এবং কান-গাকুর অর্থ চীনের শিক্ষাপদ্ধতি। উদ্দেশ্য ছিল, অদূরে ভবিষ্যতে চীন তথা ইউরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতি-ভিত্তিক একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। ফুকুজাওয়া এবং সমভাবধারা-সম্পন্ন পণ্ডিতগণ কিন্তু জাপানের নূতন শিক্ষা-পদ্ধতিকে চীন-শিক্ষা-ভিত্তিক করার প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা সমর্থন করেন এ্যাংলো-স্যাক্সন শিক্ষাপদ্ধতি। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র জাপানে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়-গুলির তদারকের জন্য শোহিজাকা-তে (Shoheizaka) একটি বৃহত্তর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি মমবুশো (Mombusho বা Department of Education) নামে পরিচিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সরকার আইন জারি ক'রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন। স্থির হয় যে, বালক বালিকা উভয়ের শিক্ষা শুরু হবে ছয় বৎসর বয়স থেকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছয় বৎসর অধ্যয়নের পর বিদ্যার্থীরা উন্নীত হবেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে তাঁরা অধ্যয়ন করবেন পাঁচ বৎসর কাল। পরবর্তী ধাপ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (যা পরিণামে National college-এ রূপায়িত হয়)। সেখানে পঠনকালের মেয়াদ তিন-বৎসর। তৎপরবর্তী বা সর্বোচ্চ ধাপ বিশ্ববিদ্যালয় যেখান পাঠ সমাপ্ত

করতে প্রয়োজন হবে তিন বৎসর। প্রাথমিক স্তরে প্রাথমিক শিক্ষণীয় বিষয়গুলির উপর তথা চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে রাজভক্তি ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জীবিকা অর্জনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল বিদ্যার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযুক্ত ক'রে তোলা। ক্রমশঃ টোকিও, কিয়োটো, টোহোকু কুসু, হোককাইডো প্রভৃতি অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা বিদেশী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যেমন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উপর প্রভাব পড়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপদ্ধতির। ফরাসী শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য জার্মান দেশীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নৈতিক শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল জাপানী নেতৃবৃন্দের কাছে ধর্মভিত্তিহীন শিক্ষা অনুমোদন লাভ করেনি। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যখন ভাইকাউন্ট আকিমাসা যোশিকাওয়া (Viscount Akimasa Zoshikawa) শিক্ষামন্ত্রী, তখন সম্রাট মুৎসুহিতো শিক্ষানীতি ও নৈতিক শিক্ষার উপর একটি অনুশাসন প্রচার করেন। সেই অনুশাসনে জাপানীদের উদ্দেশ্য ক'রে সম্রাট নির্দেশ দেন— পিতামাতার প্রতি সমুচিত ব্যবহার কর, ভ্রাতাভগিনীর পারস্পরিক সম্পর্ক স্নেহসিক্ত হোক; স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হোক সুসমঞ্জস; বন্ধু হিসাবে সত্যনিষ্ঠ হও; পারস্পরিক ব্যবহারে হও বিনয়াবনত ও সংযত; সকলের প্রতি দানশীল হও, বিদ্যানুরাগী হও এবং চারুশিল্প অনুশীলন কর; জনসাধারণের কল্যাণদায়ক কার্য কর; দেশের সংবিধান মান্য কর এবং আইনানুগ হও। দেশে জরুরী অবস্থা উদ্ভূত হলে দেশের স্বার্থে আত্মনিয়োগ কর; রাজসিংহাসনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ এবং পূর্বপুরুষদের উৎকৃষ্ট রীতিগুলিকে যথোপযুক্ত মর্যাদাদানে গৌরবোজ্জ্বল ক'রে তোল। লক্ষ্যণীয় যে উক্ত অনুশাসনগুলির সঙ্গে ভারতের মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে উৎকলিত অনুশাসনসমূহের বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে।

মেজীযুগে জনশিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। প্রাক্‌মেজীযুগে স্ত্রীশিক্ষা ছিল অবহেলিত। বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল স্বগৃহেই। সে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল বালিকাদিগকে কিছু গার্হস্থ্য শিক্ষাদান ক'রে তাদের যথাসময়ে বিবাহ দেওয়া। মেজীযুগে বালকদের মত বালিকারাও বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। গোড়ার দিকে মিশনারীরা স্ত্রীশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে মেজী সরকার স্বয়ং

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালকদের জন্য নির্দিষ্ট পিয়ার্স বিদ্যালয়ে (Peers' school) একটি বালিকা বিভাগ উদ্বোধন করা হয়। তারপর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞীর বিশেষ আদেশে বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় Peeress' school নামে। এখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরেরই শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং সর্বশ্রেণীর বালিকাদের জন্য (অভিজাত তথা সাধারণ পরিবারভুক্ত) ইহার দরজা উন্মুক্ত হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের পর উচ্চতর স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হয়।[১৫] মিশনারী প্রচেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত। স্ত্রীশিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে মেজী সরকারের উৎসাহে ও সাহায্যে।)

(৩) (মেজী যুগের আবির্ভাবে অর্থনৈতিক বিবর্তন (১৮৬৮-৯৫

মেজীযুগের আবির্ভাবে জাপানে আধুনিক রাষ্ট্রোপযোগী অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। মেজী সরকার শিল্প-ভিত্তিক আধুনিক পদ্ধতিতে জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সেই পরিকল্পনা রূপায়ণে ও সক্রিয় হন। মেজী পুনর্বাসন জাপানে অর্থনৈতিক বিপ্লব আমন্ত্রণ করে। শোগুন-যুগে জাপানের অর্থনীতি ছিল প্রধানতঃ কৃষি-ভিত্তিক। যে দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক সে দেশ শিল্পাশ্রয়ী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ অপারক, এই সত্য উপলব্ধি ক'রে মেজী সরকার কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ না ক'রে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে জাপানে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিত্তশালী বণিকশ্রেণীর আর্থিক সাহায্যে মেজী সরকার শিল্পবিস্তারে অগ্রসর হন। গোড়ার দিকে মেজী সরকার বিভিন্ন শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন কিন্তু পরে কিছু কিছু শিল্প কয়েকটি পুঁজিপতি পরিবার গোষ্ঠীকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করেন। এই সব পুঁজিপতি পরিবার দেশের অর্থনীতির উপর প্রভূত আধিপত্য স্থাপন করে এবং জাইবাৎসু নামে পরিচিত হয়। জাইবাৎসু পরিবার-গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মিৎসুই, মিৎসুবিশি, সুমিটোমো ও যাসুদা। মেজী সরকারকে প্রয়োজন মত আর্থিক সাহায্য দানের বিনিময়ে ঐ সব পরিবার-গোষ্ঠী সরকারের নিকট থেকে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা আদায় ক'রে অচিরে সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এবং দেশের অর্থনীতির উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

মেজী সরকার ভারী তথা হাল্কা শিল্প গড়ে তুলতে অগ্রসর হন। শোগুন

(১৫) Clyde এবং Baen, ঐদেব। পৃঃ ১২২

শাসনকালে ডাইমিয়োগণের কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। সাতসুমার ডাইমিয়োর কেগোসিমাতে একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল। স্বয়ং শোগুনের গোলাবারুদের কারখানা ছিল। নাগাসাকিতে শোগুনের লৌহ-ঢালাই এর কারখানাও ছিল (Nagasaki Iron Foundries) মেজী সরকার এ সবই নিজ অধিকারভুক্ত করেন, অধিকন্তু দেশের যাবতীয় খনিজ সম্পদ (যথা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, কয়লা) জাতীয় সম্পদ হিসাবে ঘোষণা করেন। মেজীযুগে খনি থেকে কয়লা উত্তোলন শিল্প অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তখন ক্যুসু ও হোক্কাইডো ছিল কয়লা উৎপাদন কেন্দ্র, যদিও কয়লার বৃহদংশ সংগৃহীত হত ক্যুসু থেকে।[১৬] ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের পর কয়লা উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে খনি-শিল্পে সংশ্লিষ্ট একশত কোম্পানী গড়ে ওঠে।[১৭] ঐ সব কোম্পানীর খনি-শিল্পে লগ্নী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৯ মিলিয়ন ইয়েন এবং তাদের অধীনে ছিল এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার খনিজীবী।[১৮] অ্যালেন (Allen) প্রদত্ত নিম্নলিখিত তালিকা থেকে ১৮৭৭—১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কয়লা উৎপাদনের ক্রমঃবর্ধমান পরিমাণ বুঝতে পারা যায়ঃ[১৯]

কয়লা উৎপাদন (বাৎসরিক গড়পরতা হিসাব)

মিলিয়ন মেট্রিক টন

১৮৭৭—৮৪…০'৮

১৮৮৫—৯৪…২'৬

১৮৯৫—১৯০৪…৮'০

১৯০৫—১৯১৪…১৬'৮

১৯১৪ …২২'৩

খনি থেকে তৈল নিষ্কাশন শিল্পও মেজীযুগে বিস্তারলাভ করে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জাপান ওয়েল কোম্পানী (Japan Oil Company) প্রতিষ্ঠার পর খনিজ-তৈল শিল্পের প্রসার অধিকতর বৃদ্ধি পায়[২০]। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে অশোধিত তৈলের উৎপাদন ছিল তেত্রিশ হাজার পিপা। এই উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে দাঁড়ায় এক লক্ষ পিপা এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দাঁড়ায় ১½ মিলিয়ন পিপা।[২১]

নাগাসাকি, ইউকোসুক ও কোবো অঞ্চলে তিনটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হয়। বিদেশ থেকে সমুদ্রবাহী জাহাজ ক্রয় করা হয় এবং জাহাজ পরিচালনার জন্য বিদেশী নাবিক নিয়োগ করা হয়। এমন কি, দেশের যুবকদের নৌবিদ্যায় পারদর্শী করার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে নৌবিদ্যাকুশলী বিশেষজ্ঞদের

(১৬) Allen, তদেব। পৃ ৮০ (১৭) তদেব। (১৮) তদেব। (১৯) তদেব। পৃ ৮৯
(২০) তদেব। (২১) তদেব।

আমন্ত্রণ করা হয়। সমুদ্রবাহী জাহাজগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় জাইবাৎসু-গোষ্ঠীর মিটসুবিশির উপর। রুশ জাপান যুদ্ধকাল (১৯০৪-৫) থেকে জাপানে জাহাজ-শিল্পের অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। তখন থেকে জাপানী জাহাজের মালধারণ শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেক জাহাজী কোম্পানী গঠিত হয় এবং বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন জলপথে জাহাজ চালিত হয়, যথা ডেইরেন (Daiien , সাঘালিয়েন (Saghalien), জাভা (Java), দক্ষিণ সাগর (South seas)। এইভাবে মেজী জাপানে জাহাজ শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়।

এইভাবে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে জাপানে এমন কোন ভারী শিল্প ছিল না যা মেজী সরকারের অধীন ছিল না। কাউণ্ট ওকুমার এক বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মেজী সরকারের মালিকানায় ছিল ৪টি জাহাজ নির্মাণের কারখানা, ৫১টি বাণিজ্যপোত, ৫টি গোলাবারুদের কারখানা, ৫২টি অন্যান্য কারখানা, ১০টি খনি, ৭৫ মাইল দীর্ঘ রেলপথ এবং বিভিন্ন শহরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা।[২২] ১৮৬৮—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিল্পের এই অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য।

মেজীযুগে হাল্কা শিল্পের অগ্রগতি ও লক্ষ্যণীয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মেজী সরকার শ্রমশিল্প বিভাগ গঠন করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইটো হিরোবুমি এই বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর মন্ত্রিত্বকালে হাল্কা ও বেসামরিক শিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটে। সরকার খনি-শিল্পের উন্নতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এতদ্ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, সিমেন্টের কারখানা, সাদা ইটের কারখানা এবং কাচ প্রস্তুতের কারখানা, সবই টোকিও শহরে। সোডিয়াম সালফেট এবং ব্লিচিং পাউডারের কারখানাও নির্মিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কার্পাস বস্ত্র, পশমী বস্ত্র এবং তুলা-সংক্রান্ত শিল্পের অগ্রগতি। জাপানে পশম শিল্প গড়ে ওঠে সর্বপ্রথম মেজীযুগে। ১৮৭৭—৭৮ খৃষ্টাব্দে মেজী সরকার পশম শিল্পের উন্নতিকল্পে জার্মাণ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে একটি মিল স্থাপন করেন। সেনাবাহিনীর পোশাকের জন্য পশমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তবে, প্রথমে গুণে ও মূল্যের তুলনায় জাপানী তুলা বিদেশী তুলা অপেক্ষা ছিল নিকৃষ্টমানের। সেইজন্য বেশ কয়েক বৎসর বিদেশী তুলা আমদানি হতে থাকে। তুলা শিল্পের উন্নতিকল্পে সাতসুমার ডাইমিয়ো ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে একটি তুলার কারখানা স্থাপন করেন এবং লণ্ডন থেকে একশত তাঁত এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম আমদানি করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সাতসুমার ডাইমিয়ো অপর একটি

---

(২২) অ্যালেন, ঐদেব। পৃঃ ৩৪ দ্রষ্টব্য।

তাঁতের মিল স্থাপন করেন। দুইবৎসর পর মেজী সরকার এই মিলটি অধিগ্রহণ করেন। সরকারের প্রচেষ্টায় ১৮৮১ এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ আরও দুটি তুলার কারখানা স্থাপিত হয়। এইভাবে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ প্রচেষ্টায় তুলা শিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটে। রেশম শিল্পের ও উন্নতি হয়। গোড়ার দিকে রেশমী সুতো চরকা বা নাটাই-এ গুটিয়ে রাখা হত। পরে গুটান কাজ যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। এই জাতীয় যন্ত্রের কারখানা সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। মেজী সরকার এরূপ তিনটি কারখানা স্থাপন করেন ১৮৭২—৭৭ মধ্যে। হনশু দ্বীপ ছিল রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র।

মেজীযুগে ১৮৮০-র দশকে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। কয়েক বৎসর মন্দার পর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কয়েক বৎসরে পুনরায় শিল্পে উন্নতি ঘটে। রুশ-জাপান যুদ্ধের (১৯০৪-) পর থেকে মেজীযুগে শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে।

মেজীযুগে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি শিল্পের অগ্রগতির সহায়ক হয়। প্রাক্-মেজীযুগে অভ্যন্তরীণ পরিবহনের ব্যয় ছিল অত্যধিক। তখন জাপানের অভ্যন্তরে এক টন ওজনের মাল পঞ্চাশ মাইল বহন করতে যে ব্যয় হত, সেই ব্যয়েই য়ুরোপ থেকে জাপান পর্যন্ত সম-ওজনের মাল বহন করা সম্ভব হত। দেশাভ্যন্তরে যাতায়াতের অসুবিধা দূর করবার জন্য মেজী সরকার রিক্সা'র পরিবর্তে দ্রুত-সঞ্চালক মোটরযান প্রবর্তন করেন, রেলপথও নির্মাণ করেন। প্রথম রেলগাড়ী চালু হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। ১৮ মাইল দীর্ঘ এই রেলপথ ইয়োকোহামার সঙ্গে টোকিও শহরের সংযোগ স্থাপন করে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয় ৭৩ মাইল দীর্ঘ রেলপথ, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১২২ মাইল দীর্ঘ এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ৩,০০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাকঘর স্থাপন এবং টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন দ্রুত সংবাদ প্রেরণের সুব্যবস্থা করে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ

শোগুনযুগে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে দুইশত বৎসরাধিক কাল জাপান পশ্চিম দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন-প্রায় জীবন যাপন করে। ফলে জাপানের সঙ্গে তখন বহির্বিশ্বের কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না। কমোডোর পেরির অভিযানের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত কানাগাওয়া (Kanagawa) সন্ধির পর জাপানের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে এবং ধীর গতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু গোড়ার দিকে জাপানে রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি ছিল অধিকতর। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য জাপানের

প্রতিকূল হয়। ১৮৬৮-১৮৮১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে এই প্রতিকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকে, যদিও এই ১৩-১৪ বৎসর যাবৎ জাপানে বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট অর্থমূল্য রৌপ্য ইয়েনের ভিত্তিতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই মূল্য ছিল ২৬ মিলিয়ন ইয়েন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই মূল্য বৃদ্ধি পায় ৫০ মিলিয়ন ইয়েনে এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৬২ মিলিয়ন ইয়েনে। ১৮৬৮-১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাপানে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য এইভাবে ২৬ মিলিয়ন ইয়েন থেকে ৬২ মিলিয়ন ইয়েনে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ঐ কয়েক বৎসরে জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিকূল হিসাবে গণ্য হবার কারণ, তখন স্বর্ণ ও দ্রব্যমূল্যের তুলনায় ইয়েনের ক্রয়ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট কম। ১৮৮২-৯৪ খৃষ্টাব্দে মধ্যে জাপানে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি অধিকতর থাকায় ঐ কালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য জাপানের অনুকূল থাকে। কিন্তু ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধ চলাকালীন জাপানে আমদানি বৃদ্ধি পায়। তারপর জাপানে প্রস্তুতি চলতে থাকে রাশিয়ার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য। তজ্জন্য বিদেশ-থেকে আমদানি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে মেজীযুগের শেষ অবধি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জাপানে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হয়। মেজীযুগে জাপান বিদেশ থেকে আমদানি করত কাঁচা মাল-থেকে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদি, বিশেষতঃ কার্পাস বস্ত্র, পশমী ও রেশমী বস্ত্র। মানচেস্টার থেকে সুলভ মূল্যে বস্ত্রাদি আমদানি করা হত। অধিকন্তু আমদানি হত রেলগাড়ীর সাজসরঞ্জাম, যুদ্ধোপকরণ ইত্যাদি। আমদানির প্রায় অর্ধেকাংশ আসত বৃটেন থেকে। জাপান রপ্তানি করত মূলতঃ কাঁচা মাল যথা কাঁচা রেশম এবং চা। রেশম রপ্তানি হত য়ুরোপে এবং চা, আমেরিকায়। এতদ্ব্যতীত জাপান রপ্তানি করত কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যাদি, যথা মৃন্ময়পাত্র, জাপানী কাগজ, লাক্ষা এবং রঞ্জধাতু-নির্মিত পণ্যদ্রব্য।

(৬)

ব্যাঙ্ক স্থাপন

বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের অঙ্গ হিসাবে জাপানে ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পর। সর্বপ্রথম জাতীয় ব্যাঙ্ক (National Bank) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭৬ এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জাতীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪ এবং ১৫১। শেষোক্ত বৎসরে জাতীয় ব্যাঙ্কে জমা-দেওয়া ইয়েনের পরিমাণ ছিল ১২ মিলিয়ন। ক্রমশঃ পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কও চালু হয়। জাতীয় ব্যাঙ্ক পরিচালনায় বিচ্যুতি দেখা দেওয়ায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ব্যাঙ্ক হিসাবে গণ্য হয় এবং সরকার-পরিচালিত

জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank of Japan) স্থাপিত হয়। কেবলমাত্র এই ব্যাঙ্কই নোট প্রকাশের অধিকার পায়। বৈদেশিক বাণিজ্যে মূলধন জোগাবার জন্য এবং বিনিময় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় য়ুকোহামা স্পিশি ব্যাঙ্ক (Yokohama Specie Bank)। চীনের সঙ্গে যুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হয় হায়পোথিক ব্যাঙ্ক (Hypothec Bank) এবং ৪৬টি শিল্প ও কৃষি ব্যাঙ্ক। মেজীযুগে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য ব্যাঙ্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোককাইডো কলোনাইজেসন ব্যাঙ্ক (Hokkaido Colonization Bank) এবং ফরমোজা ব্যাঙ্ক (Bank of Formosa)।

মুদ্রানীতি (Currency)

প্রাক্-মেজী যুগে কাগজ (note) ও ধাতব মুদ্রা উভয়ই চালু ছিল। ডাইমিয়োগণ স্ব স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজ মুদ্রা ছাপাতেন বলে মুদ্রানীতিতে দুর্নীতি দেখা দেয়। মেজীযুগে মুদ্রানীতির কিছু সংস্কার সাধিত হয়। আমেরিকার মুদ্রানীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ঐ দেশে একটি কমিশন প্রেরিত হয়। আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত উক্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দশমিক পদ্ধতি (decimal system) এবং কাগজ মুদ্রা প্রচলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চীন-জাপান যুদ্ধের পূর্বে মুদ্রানীতি ছিল রৌপ্যধাতু-ভিত্তিক। সিমোনোশেকি সন্ধির (১৮৯৫) সর্তানুযায়ী পরাজিত চীন বিজয়ী জাপানকে স্বর্ণ-ধাতুতে ক্ষতি পূরণ দেয়। ফলে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের পর জাপানের মুদ্রানীতি হয় স্বর্ণধাতু-ভিত্তিক। এই কালে ১৫।১৬ আউন্স রৌপ্যের বিনিময়ে য়ুরোপে মিলত মাত্র ১ আউন্স স্বর্ণ অথচ জাপানে মিলত প্রায় ৪ আউন্স। এ হেন বিনিময় হার য়ুরোপীয় ব্যবসায়িগণকে জাপান থেকে রৌপ্যের বিনিময়ে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ক্রয়ে প্রলুব্ধ করে।

কৃষি ঃ মেজীযুগ প্রবর্তনের পর কৃষক জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা পায়। ফলে কৃষক এখন থেকে জমি বিক্রয়ের অধিকার পায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জমির উপর কৃষকের এই ব্যক্তিগত মালিকানার সার্টিফিকেট জারি করা হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মেজী সরকার অবলম্বন করেন জমির উপর কর স্থাপনের (Land tax) এক নূতন নীতি। এই নীতি অনুসারে স্থির হয় যে কৃষককে খাজনা দিতে হবে চাউলের মাধ্যমে নয়, মুদ্রার মাধ্যমে এবং এই খাজনার হার হবে সুনির্দিষ্ট। এই হার হবে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশের অর্থ-মূল্য। দেশে সুবর্ষার অভাবে আবাদ সুবিধাজনক না হলেও এই হারের কোন ব্যতিক্রম হবে না। মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা দেওয়া বাধ্যতা মূলক ঘোষিত হওয়ায় কৃষককে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে কৃষককে মুদ্রা সংগ্রহ করতে হত বাজারে চাউল বিক্রয় করে। বিক্রয়-

কালে চাউলের বাজারমূল্য কম থাকলেও কৃষককে ক্ষতি স্বীকার ক'রে নির্ধারিত মুদ্রা সংগ্রহ করতে হত। ফলে খাজনা দেওয়ার পর অবশিষ্ট চাউলে কৃষকের সংসার প্রতিপালন করা দুরূহ হত। অধিকন্তু কৃষিক্ষেত্রে যে নূতন অর্থনীতি চালু হয় তাতে দৈনন্দিন জীবনধারণের চাহিদা মেটাবার উপযোগী শস্যোৎপাদন অপেক্ষা বাজারে বিক্রয়যোগ্য শস্যোৎপাদনের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষককে প্রয়োজনীয় খাদ্য অধিক মূল্যে বাজার থেকে ক্রয় করতে বাধ্য হতে হয়। এতে কৃষক পরিবারে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। আবার, খাজনার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক কৃষকই স্ব স্ব জমি বিক্রয় ক'রে শহরাভিমুখী হয়, জীবিকা অর্জনের নূতন পন্থার সন্ধানে। অনেকে আবার বিক্রীত জমি নূতন ক্রেতার প্রজা হিসাবে আবাদ ক'রে জীবিকা অর্জন করে। ১৮৮০—৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৩,৬৭,৭৪৪ কৃষিজীবী তাদের জমির মালিকানা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[২৩] আবার, যে সমস্ত কৃষক পরিবার তুলার চাষ ক'রে গ্রাসাচ্ছাদন করত তাদেরও জীবিকা অর্জন দুরূহ হয়ে ওঠে, কারণ কৃষক পরিবার কর্তৃক উৎপাদিত তুলার মূল্য বিদেশ থেকে আমদানী করা তুলার মূল্য অপেক্ষা অধিক হওয়ায় দেশীয় তুলা বাজারে অবিক্রীত থেকে যায়। এই সব কারণে মেজী সরকারের নূতন কৃষিনীতি কৃষককে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়।)

(৪) মেজী সংবিধান (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ)

(ক) আন্দোলন : মেজীযুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন সংবিধান রচনা, যা সাধারণতঃ মেজী সংবিধান নামে প্রসিদ্ধ। শোগুন শাসনের অবসানের পর সংসদীয় ধাঁচে একটি সংবিধান রচনার আবশ্যকতা মেজী নেতৃবৃন্দ অনুভব করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি আন্দোলনও শুরু করেন। এই আন্দোলন পরিচালিত হয় দুটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ের স্থায়িত্ব কাল ছিল ১৮৭৩-৮১ খৃষ্টাব্দ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের, ১৮৮২—৮৯ খৃষ্টাব্দ। প্রগতিশীল সম্রাটও নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর গণতন্ত্রে আস্থা প্রমাণিত হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের চার্টার ওথ থেকে। সেই দিক থেকে বলা যেতে পারে যে সম্রাটের চার্টার ওথ ছিল একটি প্রগতিশীল সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। এই চার্টারের প্রথম অনুচ্ছেদে আশ্বাস দেওয়া হয় যে দেশের বিস্তৃত অঞ্চল থেকে জনপ্রতিনিধি আহ্বান ক'রে একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হবে এবং নিরপেক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বা মতান্তরে, জনমতের সাহায্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রশাসনিক সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে,

(২৩) তিনাক. তদেব। পৃষ্ঠা ১২০ দ্রষ্টব্য

ঽ-শাসনিক সমস্ত ব্যাপার শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণীর পারস্পরিক সহযোগিতায় মিমাংসিত হবে। চরমপন্থী রাজনৈতিকদল এই অনুচ্ছেদ দুটিকে সম্রাট কর্তৃক একটি জনপ্রতিনিধিমূলক সংসদীয় সংবিধান দানের প্রতিশ্রুতি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং প্রতিশ্রুতি যাতে কার্যে রূপায়িত হয় তজ্জন্য আন্দোলন শুরু করেন। গণতন্ত্রে আস্থাহীন রক্ষণশীল দল মন্তব্য করেন যে প্রথম অনুচ্ছেদে সম্রাট জনমতের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করবার প্রতিশ্রুতি দেন নাই এবং ফলতঃ জনপ্রতিনিধিমূলক সংসদীয় সংবিধানদানের ও কোন ইঙ্গিত দেন নাই। রক্ষণশীলদলের যুক্তি অনুসারে, প্রথম অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত কোরণ (Koron) শব্দের অর্থ নিরপেক্ষ আলোচনা মাত্র কিন্তু চরমপন্থী রাজনীতিকগণ কোরণ শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করেন ইয়োরণ (Yoron) শব্দ, যার অর্থ জনমত। এতদ্ব্যতীত রক্ষণশীল দলের ব্যাখ্যানুসারে, সম্রাট যে ব্যবস্থাপক সভার উল্লেখ করেছেন তা জনপ্রতিনিধিগণের সভা নয়, তা ডাইমিয়োদের দ্বারা গঠিত সভা।

মোট কথা, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাপানে রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ জনগণের হস্তে শাসন ক্ষমতাদানের বিরোধী ছিলেন, যেমন বিরোধী ছিলেন গণতন্ত্রে আস্থাহীন বৃটিশ ব্যারণশ্রেণী যখন ১২১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জন ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta) স্বাক্ষরিত করেন। ত্রয়োদশ শতকের বৃটিশ ব্যারণদের চক্ষে ম্যাগনা কার্টা একটি মধ্যযুগীয় বা সামন্তশ্রেণীর উপযোগী দলিল (Feudal document) ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। পরবর্তীকালে যেমন ম্যাগনাকার্টার শর্তগুলি পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশে নূতনভাবে ব্যাখ্যাত হয়, যার ফলে ম্যাগনাকার্টা পরিগণিত হয় ইংরাজ জাতির স্বাধীনতার বাইবেল বা প্রথম সোপান হিসাবে, সেইরূপ মুৎসুহিতোর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের চার্টার ও পরবর্তীকালে জাপানে জনপ্রতিনিধি মূলক সংবিধান দানের রাজকীয় প্রতিশ্রুতি হিসাবেই গৃহীত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবও জাপানী জনগণকে জনমত-ভিত্তিক এবং সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংসদীয় সংবিধান রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের সমর্থনে আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলন রূপ ধারণ করে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ থেকে।

সংবিধানের জন্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায় (১৮৭৩-৮১)

সে যুগের অন্যতম অগ্রগণ্য উদার মনোভাবসম্পন্ন নেতা কিডো (চোষু সামুরাই) ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আন্দোলন শুরু করেন একটি সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য। তাঁর বক্তব্য ছিল, জনমতকে অগ্রাহ্য ক'রে শাসনকার্য পরিচালনা করা অযৌক্তিক। যে শাসন-

ব্যবস্থা দেশের সর্বশ্রেণীর জন্য, তা সকলশ্রেণীরই অনুমোদন সাপেক্ষ (What touches all must be approved by all)। নীতিগতভাবে শাসকগোষ্ঠী জনমতকে উপেক্ষা ক'রে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতা চলতে দেওয়া হবে না। দায়িত্বশীল, প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা স্থাপন এবং এহেন শাসনব্যবস্থাকে রূপদান ক'রে একটি সংবিধান রচনার জন্য সক্রিয় আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কিডো-ই শুরু করেন। এরপর জাপানের রাজনীতিতে উদার মনোভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষালয়, বক্তৃতামঞ্চ, ক্লাব তথা প্রেসের মাধ্যমে জনসাধারণকে রাজনৈতিক উদারতা শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়, যেন এই উদারতা ছিল নবযুগের একটি দৈব আত্মপ্রকাশ। মেজীযুগের অন্যতম প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও জাতীয় নেতা ফুকুজাওয়া ইউকিচি (১৮৩৫-১৯০১) প্রচার করেন যে আইনের চক্ষে সকলেই সমান এবং সকলেরই আছে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের সমান অধিকার। ফুকুজাওয়া তাঁর এই মতবাদ বিশ্লেষণ করেন তাঁর গকুমন নো সুসুমে (Gakumon no-Susume) এবং সেইয়ো জিজো (Seiyo jijo) নামক গ্রন্থদ্বয়ে। এইকালে টোজা সামুরাই কাউন্ট ইতাগাকি কর্তৃক সংগঠিত রিশ্‌শিশা (Risshisha) নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান-পত্রে (Prospectus) একটি বিবৃতি প্রচারিত হয়ঃ বর্তমান জাপানের ত্রিশ মিলিয়ন জনসংখ্যার সমভাবে কতকগুলি নির্দিষ্ট অধিকার ভোগের পূর্ণ অধিকার আছে। সেই সকল অধিকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জীবনধারণের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, জীবিকার অধিকার এবং জীবনে সুখশান্তি ভোগের অধিকার। এই সকল অধিকার প্রকৃতি-দত্ত। সেই কারণে কোন স্বেচ্ছাচারী শক্তি জনসাধারণকে ঐ সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত ইতাগাকি, হিজেন গোষ্ঠীর এটো, টোজা সামুরাই গোটো এবং আরও অনেকে আইকোকু কোটো (Aikoku koto বা public party of patriots) নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থার সঙ্গে পশ্চিম থেকে প্রত্যাগত কতকগুলি ছাত্রও জড়িত ছিলেন। এই সংস্থা প্রচার করে যে একমাত্র জনস্বার্থে প্রতিষ্ঠিত সরকারই স্বীকৃতিলাভের যোগ্য এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা ও বজায় রাখা এই সংস্থার উদ্দেশ্য। সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার নিন্দা ক'রে এই সংস্থা সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে জনগণের পছন্দমত একটি সভা প্রতিষ্ঠার দাবী জানান হয়। প্রগতিশীল নেতৃবর্গ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা জনগণের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য এইভাবে আন্দোলন চালালেও জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনা দেখা দেয় নি। এর কারণ, তাঁরা স্বাধীনতা, সাম্যতা ইত্যাদি রাজনৈতিক তত্ত্বকথা

সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং বর্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের প্রতি জনগণের ঔদাসীন্যে ফুকুজাওয়া ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হন। তাঁর 'গোকুমন নো সুসুমে' নামক গ্রন্থ থেকে একথা জানা যায়। নেতৃবর্গ কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। ফলে সরকার কিছু রাজনৈতিক সুবিধাদানে সম্মত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ওসাকা শহরে একটি সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে একটি নির্বাচিত আইনসভা আহ্বানের প্রস্তুতি হিসাবে বর্তমানে একটি সেনেট সভা স্থাপিত হবে। বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে একটি হাইকোর্ট স্থাপিত হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজ্যপালদের (Prefectural governors) নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে যার মাধ্যমে সরকার জনগণের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবেন এবং জনমত অনুধাবন করতে পারবেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আইন, বিচার ও প্রশাসন—এই তিনটি পৃথক পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইতাগাকি ব্যতীত অপর সকল নেতা ওসাকা সম্মেলনে সরকারের উপরোক্ত ঘোষণায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। ইতাগাকির অসন্তোষের কারণ ছিল এই যে ঘোষণায় প্রতিশ্রুত সেনেট নির্বাচিত না হয়ে মনোনীত হবে। ইতাগাকি ফলে সরকারী দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিনিধিমূলক সংবিধান আদায়ের জন্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ঐ বৎসরেই সরকার কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধনীতি সমর্থন না করায় কেগোসিমার ক্ষুব্ধ সামরিক নেতা সাইগো টাকামোরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রায় সাত মাস পর বিদ্রোহের অবসান ঘটে এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সাইগো টাকামোরিব এই বিদ্রোহের সঙ্গে সংবিধান সংক্রান্ত আন্দোলনের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও পরোক্ষভাবে এই বিদ্রোহ আন্দোলনে ইন্ধন জোগায়। সাইগোর বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে রিশশিসার কিছু সদস্য প্রশাসনে উদারনীতি অনুসরণের সমর্থনে সশস্ত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু ইতাগাকি এবং রিশশিসার মধ্যপন্থী কয়েকটি সদস্য আন্দোলনে উগ্রতা বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সরকার সমীপে জাতীয় বিধানসভা (National Assembly) আহ্বানের দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। ইহার পর সকল স্তরের রাজনৈতিক সংঘ মিলিতভাবে ওসাকা শহরে একটি কংগ্রেস আহ্বান করেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে। এই কংগ্রেসে স্থির হয় সে স্বয়ং সম্রাট সমীপে জাতীয় বিধানসভা আহ্বানের অনুরোধ জানিয়ে একটি আবেদন পেশ করা হবে। ইহাও স্থির হয় কাতায়োকা (Kataoka) এবং কোনো (Kono) নামে দুই নেতা ঐ আবেদন রাজদরবারে পৌঁছে দেবেন। আবেদনটি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সম্রাট সমীপে প্রেরণ করতে অসম্মত হন, জনগণের সম্রাটের

নিকট রাজনৈতিক আবেদন প্রেরণের কোন অধিকার না থাকায়। কাউন্ট ওকুমা তখন একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং শাসনকার্যের সঙ্গে জড়িত তিনি সরকারী সংস্রব ত্যাগ ক'রে গণ-আন্দোলনে যোগদান করতে মনস্থির করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। ঐ বৎসর ১২ই অক্টোবর সম্রাট ঘোষণা করেন যে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একটি জাতীয় বিধানসভা প্রতিষ্ঠিত হবে; তৎপূর্বে ইটো হিরোবুমি ও অপর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পশ্চিম দেশগুলি পরিভ্রমণ ক'রে সংবিধান রচনা-সংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ ক'রে আনবেন; সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নূতন সংবিধান রচিত হবে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে আন্দোলনের প্রথম পর্যায় পরিসমাপ্ত হয়।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৮২-৮৯) :

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের রাজকীয় ঘোষণার পাঁচ মাসের মধ্যে তিনটি রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয় হয়—(১) ইতাগাকির জিয়ুতো (Jiyuto, Liberal party) বা উদারপন্থী দল, (২) কাউন্ট ওকুমার রিক্কেন কাইসিন্টো (Rikken Kaishinto, Constitutional Progressive party) বা নিয়মতান্ত্রিক প্রগতিশীল দল এবং (৩) রিকেকন তেইসেইতো (Rikken Teiseito Constitutional Imperial Rule party) বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দল, যার প্রধান সমর্থক ছিলেন ফুকুচি (Fukuchi)। তিনটি দলই ছিল রাজতন্ত্রের সমর্থক, যদিও এদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ছিল। ইতাগাকি (যিনি জাপানের রুশো নামে খ্যাত) ও ওকুমার রাজনৈতিক দলদুটির ইস্তাহার অনুযায়ী সম্রাট থাকবেন কেবলমাত্র জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসাবে। তাঁর হস্তে কোন শাসনক্ষমতা থাকবে না। কিন্তু ফুকুচি-সমর্থিত দলটির ইস্তাহার অনুযায়ী সম্রাটই হবেন কার্যতঃ রাষ্ট্রপ্রধান, একচ্ছত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার আধার, সকল ক্ষমতার উৎস এবং শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে অনিয়ন্ত্রিত। ইতাগাকির দলের নীতি অনুযায়ী প্রকৃত শাসন ক্ষমতা থাকবে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের হস্তে (Popular sovereignty)। ওকুমার দলের নীতি ছিল, দেশ-শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে জনগণের হস্তে থাকবে না, থাকবে পরোক্ষভাবে অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সংগঠিত বিধানসভার হস্তে। ইতাগাকির রাজনৈতিক দল সমর্থন করত এককক্ষ সম্বলিত আইনসভা, অপর দুইটি দল সমর্থন করত দ্বি-কক্ষ সম্বলিত আইনসভা।

উপরোক্ত রাজনৈতিক দল তিনটির অভ্যুত্থান রাজনৈতিক আন্দোলনে ইন্ধন জোগায়। বিভিন্ন জনসভায় এবং চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলিতে সরকার-বিরোধী মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে দাবি ওঠে, যেন আশু একটি

জনপ্রিয় সরকার গঠিত হয়। জনগণের এই রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধের জন্য সরকার স্বাভাবিক কারণেই দমন নীতি প্রয়োগ করেন। ফলে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। চরমপন্থীরা শ্লোগান তোলেন—বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জিত হয় না। অতএব স্বাধীনতার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই। কিন্তু সতর্ক পুলিশবাহিনীর তৎপরতায় চরমপন্থীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এই পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারেনি।

ইতিমধ্যে ইটো আমেরিকা, ইংলন্ড, বেলজিয়াম এবং প্রাশিয়ার সংবিধানগুলি সম্বন্ধে ও তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ ক'রে জাপানে প্রত্যাবর্তন করেন, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের অগাস্টে। প্রাশিয়ার সংবিধানই তাঁর বিবেচনায় জাপানের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। প্রাশিয়ার সংবিধানের ধাঁচে জাপানের সংবিধান রচনার জন্য তিনি সর্বপ্রথম একটি বিউরো (Bureau) স্থাপন ক'রে এটিকে ইম্পিরিয়াল হাউসহোল্ড ডিপার্টমেন্টের (যাতে জনগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল) সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তারপর এই বিউরোর রুদ্ধদ্বার কক্ষে অতি সঙ্গোপনে সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত হয়। এই খসড়া প্রস্তুতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নেতাদের মধ্যে ছিলেন ইটো হিরোবুমি, ইনৌয়ে কি (Inouye ki), কানেকো কেনতারো Kaneko Kentaro), এবং ইটো মিয়োজি (Ito Miyoji)। ইটো হিরোবুমির সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর নীতি অনুযায়ী এই খসড়া প্রস্তুত হয়। সংবিধান সংক্রান্ত তাঁর নীতিগুলি ছিল : (১) সংবিধানটি গণ্য হবে সম্রাটের অবদান স্বরূপ, যাতে তাঁর ক্ষমতা এবং মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে, (২) যে সব গোষ্ঠী সামন্ততন্ত্র অবসানের আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সংবিধানে ব্যবস্থা থাকবে, (৩) সংবিধানে জনপ্রতিনিধিমূলক বিধানসভা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি থাকবে; (৪) সংবিধানে দুইকক্ষ সম্বলিত আইনসভার ব্যবস্থা হবে। উচ্চ কক্ষ গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি পাঁচ শ্রেণীর 'নোবল' পদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে ৫০৫ জন 'পিয়ার্স' (Peers) সৃষ্টি করেন, যাঁদের দ্বারা গঠিত হয় উচ্চ কক্ষ। সেই সঙ্গে ইটোর সাংবিধানিক ব্যবস্থানুযায়ী দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পরিষদের নাম হয় ক্যাবিনেট। ইটোর অধিনায়কত্বে যখন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত হয় তখন কোন জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং জনগণের বিনা সমালোচনাতেই সংবিধান চূড়ান্ত রূপ পায়। বিউরোর রুদ্ধদ্বার কক্ষে সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত হয়। তারপর এই খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে প্রিভি কাউন্সিল তখন সংবিধান রচনা হয় সমাপ্ত। এইভাবে রচিত সংবিধান ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের অনুমোদন লাভ করে। সমগ্র জাতি সংবিধানটি সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করে, সম্রাটের অবদান হিসাবে।

(খ) মেজী সংবিধানের রূপ-রেখা ঃ

মেজী সংবিধান রচিত হয় মূলতঃ দুটি আদর্শ অনুসরণে, যথা সম্রাটের পুনর্বাসনের আদর্শ (Restoration idea) এবং সামন্ততান্ত্রিক আদর্শ (Feudal idea)। প্রথম আদর্শ অনুযায়ী সম্রাট বিরাজিত থাকবেন সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতার এবং যাবতীয় অনুগ্রহ প্রদর্শনের উৎস স্বরূপ। দ্বিতীয় আদর্শ অনুসারে সম্রাটের সাংবিধানিক ক্ষমতাসমূহ সম্রাট স্বয়ং প্রয়োগ না ক'রে তাঁর পরিবর্তে প্রয়োগ করবেন তাঁর প্রতিনিধিগণ।

মেজী সংবিধান মোট ৭৬টি অনুচ্ছেদ-সম্বলিত এবং ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত,[২৪] যথা—

প্রথম অধ্যায়—	সম্রাটের সাংবিধানিক পদমর্যাদা ও শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা (অনুচ্ছেদ ১—১৭)
দ্বিতীয় অধ্যায়—	জনগণের অধিকার ও কর্তব্য (অনুচ্ছেদ ১৮—৩২)
তৃতীয় অধ্যায়—	আইন সভা, ইম্পিরিয়াল ডায়েট, (অনুচ্ছেদ ৩৩—৫৪)
চতুর্থ অধ্যায়—	প্রশাসনিক বিভাগ, মিনিস্টারস্ অব স্টেট ও প্রিভি কাউন্সিল, (অনুচ্ছেদ ৫৫—৫৬)
পঞ্চম অধ্যায়—	বিচার বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৫৭—৬১)
ষষ্ঠ অধ্যায়—	অর্থনৈতিক বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৬২—৭২)
সপ্তম অধ্যায়—	সম্পূরক নিয়মাবলী, সাপ্লিমেন্টারী রুলস, অনুচ্ছেদ (৭৩—৭৬)

সম্রাট—তাঁর সাংবিধানিক পদমর্যাদা ও ক্ষমতা

সংবিধান অনুসারে সম্রাটই তত্ত্বগতভাবে দেশের সর্বময় কর্তা অর্থাৎ প্রশাসনিক, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত এবং বিচার-সংক্রান্ত সকল ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী সম্রাট। প্রথম অনুচ্ছেদে উক্ত হয়েছে যে জাপান সাম্রাজ্যে জাপানী রাজবংশ বংশপরম্পরায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে রাজত্বের এবং শাসনের শাশ্বত অধিকার ভোগ করবেন। মেজী সংবিধানের স্নায়ুকেন্দ্র স্বরূপ এই প্রথম অনুচ্ছেদটি কোকুতাই (Kokutai) নামে জাপানী রাজনৈতিক মতবাদ নির্দেশ করে। কোকুতাই শব্দের অর্থ জাতীয় রাষ্ট্রশাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থা (ন্যাশনাল পলিটি)। ইহা তিনটি নীতির সমন্বয়ঃ (১) জাপানী রাজবংশও জাপানী সম্রাট পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় এবং সম্রাট রাষ্ট্রের চরম শক্তির উৎস ও আধার ; (২) জনগণ

(২৪) জাপানের বর্তমান সংবিধানে মোট অনুচ্ছেদ ১০৩ এবং মোট অধ্যায় ১১।

সম্রাটের সঙ্গে ভক্তি ও শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ ; (৩) জাপানী পরিবার সমূহ (যা নিয়ে সমগ্র জাপানী জাতি গঠিত) পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্রাট কেবলমাত্র তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকবে মন্ত্রীদের হস্তে। সংবিধানকে অগ্রাহ্য ক'রে সম্রাটের শাসন করবার কোন অধিকার থাকবে না। ইহা নিয়মতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ। সম্রাট থাকবেন সকল প্রকার সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁর সম্পর্কে কোনও প্রকার কটূক্তি সর্বৈব নিষিদ্ধ। সিংহাসনের পবিত্রতা যেমন অক্ষুণ্ণ থাকবে, তেমনি সম্রাটের পদমর্যাদা ও সম্ভ্রম থাকবে অলঙ্ঘনীয়।

তত্ত্বগতভাবে সম্রাট একাধারে থাকবেন প্রশাসনিক, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত তথা বিচার ও অর্থবিভাগ সংক্রান্ত ক্ষমতাবলীর অধিকারী। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে মেজী সংবিধানে বিভিন্ন বিভাগের শাসনবিষয়ে কোন কঠোর পৃথকীকরণের ব্যবস্থা ছিল না। (সেপারেশন অব পাওয়ার্স)

সম্রাটের প্রশাসনিক ক্ষমতা :

সম্রাট বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের সংগঠন স্থির করবেন, সকল সামরিক এবং বেসামরিক কর্মচারীদের নিয়োগ করবেন, তাদিকে পদচ্যুত ও করতে পারবেন। তাদের বেতন ও পেনসন নির্ধারণেও তাঁর ক্ষমতা থাকবে। এক কথায়, সম্রাটের উপর ন্যস্ত থাকবে সমগ্র প্রশাসনিক বিভাগের চরম ক্ষমতা। সম্রাট হবেন স্থলবাহিনী তথা নৌবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ, অবশ্য তত্ত্বগতভাবে। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তিস্থাপন, সন্ধিপত্র স্বাক্ষর—এসবও থাকবে সম্রাটের ক্ষমতাভুক্ত। উচ্চ পদমর্যাদা সূচক খেতাব বা সম্মানের প্রতীক প্রদানের ক্ষমতাও সম্রাটের অধিকারে থাকবে। আবার, দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করবার বা তার দণ্ড লঘু করবার ক্ষমতাও সম্রাটের।

সম্রাটের আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা :

ডায়েটের সম্মতিক্রমে সম্রাট আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ডায়েটের উভয় কক্ষে কোন বিল গৃহীত হলে সেই বিল প্রেরিত হবে সম্রাট-সমীপে, তাঁর অনুমোদন ও স্বাক্ষরের জন্য। সম্রাট বিলের উপর অনুমোদন সূচক স্বাক্ষর না দিলে বিলটি আইনে পর্যবসিত হবে না। বিল অনুমোদন করা বা না করা হবে আইনতঃ সম্রাটের ইচ্ছাধীন। ইহা সম্রাটের চরম অধিকার। বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলী তত্ত্বগতভাবে সম্রাটকে প্রভাবান্বিত করতে পারতেন না কিন্তু কার্যতঃ পারতেন। মূলতঃ ডায়েটে গৃহীত এবং মন্ত্রীসভা কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনও বিল সম্রাটের অনুমোদন লাভ করতই। কোন বিল বিধিবদ্ধ হবার পর বিলটি যাতে সুষ্ঠুভাবে চালু হয় তা সুনিশ্চিত করবার জন্য সম্রাট বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসন-সংক্রান্ত নির্দেশ (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডিনান্স) জারি করতে পারবেন। আবার ডায়েটের

অধিবেশন না থাকাকালে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে সম্রাট নিরাপত্তা রক্ষার্থে অর্ডিনান্স (Ordinance) জারি করতে পারবেন। ডায়েটের পরবর্তী অধিবেশনে এইরূপ অর্ডিনান্স উপস্থাপিত হলে যদি ডায়েট তা অনুমোদন না করে তা হলে সেটি তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে, আর অনুমোদন করলে অর্ডিনান্সের মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে। এতদ্ব্যতীত সম্রাটের ক্ষমতা থাকবে ডায়েট আহ্বানের, ডায়েটের অধিবেশন কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখার এবং ডায়েটের নিম্নকক্ষ ভেঙ্গে দেবার।

সম্রাটের বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা :

তত্ত্বগতভাবে সম্রাট ধর্মপ্রবর্তক। বিচারকবৃন্দ তাঁর নামেই বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। বিচার বিভাগের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব সংবিধান অনুযায়ী সম্রাটের উপর ন্যস্ত থাকলেও তিনি স্বয়ং কোন দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে আদালত ও বিচারকদের হস্তে অর্পণ করতেন। বিচারকেরাও আইনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রশাসনিক বাধার সম্মুখীন না হয়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন।

সম্রাটের অর্থনৈতিক ক্ষমতা :

সংবিধানে সম্রাটের হস্তে অর্থনৈতিক বিশেষ কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নি। নূতন কর ধার্য করা বা পুরাতন কর পরিবর্তন করা তাঁর ইচ্ছাধীন হবে না। রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় নির্ধারণেও তাঁর কোন স্বাধীনতা থাকবে না। কর নিরূপিত হবে আইন বিভাগের মধ্য ও সংবিধান এবং রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় নির্ধারিত হবে বাজেটের মাধ্যমে ডায়েটের অনুমতি অনুসারে।

সংবিধান সংশোধনে সম্রাটের ক্ষমতা :

সংবিধান সংশোধনে সম্রাটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল না। তিনি কেবল সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে পারবেন। কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হবে কিংবা প্রত্যাখ্যাত হবে তা নিরূপণের অধিকার থাকবে ডায়েটের হস্তে।

মেজী সংবিধান অনুযায়ী সম্রাট কি স্বেচ্ছাচারী ?

তত্ত্বগতভাবে সম্রাট হলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। মেজী সংবিধানে সম্রাটের এইরূপ চিত্রই অংকিত হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ তিনি ইচ্ছামত শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন না। তাঁর শাসনক্ষমতা প্রশাসনিক ধারাগুলির মধ্যে সীমিত ছিল। সংবিধান লঙ্ঘন ক'রে তাঁর দেশ শাসনের ক্ষমতা ছিল না। দেশ শাসনের প্রকৃত দায়িত্ব ছিল মন্ত্রিসভার হস্তে, আর সম্রাট বিরাজিত ছিলেন শোভাবর্ধক ক্ষমতাবিহীন প্রধান

হিসাবে। ইটো হিরোবুমি অবশ্য সম্রাটকে একচ্ছত্র নায়ক হিসাবেই চিত্রিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর সুচিন্তিত বিবেচনায়, মানবদেহে মস্তিষ্কের যে গুরুত্ব, সংবিধানে সম্রাটের অনুরূপ বিশেষত্ব। মস্তিষ্ক যেমন সমগ্র দেহের সকল শক্তির উৎসস্থান, সেইরূপ সম্রাট রাষ্ট্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র। সম্রাট রাষ্ট্ররূপ এঞ্জিনের প্রধান যন্ত্র। ইটোর এই মতবাদের বিরোধিতা করেন মিনোবে টাটসুকিচি। তিনি ছিলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক (১৯০০—৩২)। অধ্যাপক টাটসুকিচির মতে, মেজী সম্রাট প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা ছিলেন না। তাঁর বিবেচনায় রাষ্ট্রই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সম্রাট রাষ্ট্রের প্রধানতম অঙ্গ বিশেষ। সম্রাট রাষ্ট্রের আইনাধীন।

প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত ছিল না। তিনি সংবিধানের ঊর্ধ্বে ছিলেন না, সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে তাঁর শাসন-ক্ষমতা সীমিত ছিল। তিনি ছিলেন দেশের আইনের অধীন। ডায়েটের সম্মতিক্রমে তিনি আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। ডায়েটের অধিবেশন না চলা কালে সম্রাট যে অর্ডিনান্স জারি করতেন তা ছিল নিতান্তই সাময়িক। অর্ডিনান্স স্থায়ী আইনে পর্যবসিত হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত ডায়েটই, সম্রাট নন। সম্রাটের কোন অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। বাজেটের মাধ্যমে এবং ডায়েটের সম্মতিক্রমে দেশের আয়-ব্যয়ের অংক নির্ধারিত হত। নূতন কর প্রবর্তন বা পুরাতন করের পরিবর্তনের ক্ষমতাও সম্রাটের হস্তে ছিল না। এই কর প্রবর্তন ও পরিবর্তন করবার অধিকার ছিল আইন বিভাগের। দেশ-শাসনে সম্রাটকে তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলের উপদেশ গ্রহণ করতে হত। সংবিধানের ৫৫তম অনুচ্ছেদ অনুসারে, 'বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীরা সম্রাটকে উপদেশ প্রদান করবেন এবং প্রদত্ত উপদেশের জন্য দায়ী থাকবেন। রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন আইন অর্ডিনান্স বা রাজকীয় আজ্ঞপ্তি কার্যকরী হতে হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।' সুতরাং কোন বিল সম্রাটের অনুমোদন লাভ করলেই তা কার্যকরী হতে পারত না। সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত বিল সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীর সমর্থন লাভের পর কার্যকরী হত। অবশ্য মন্ত্রীমণ্ডলীর উপদেশ গ্রহণ সম্রাটের উপর বাধ্যতামূলক ছিল কি না এ কথা সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিখিত নাই। তবে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সম্রাট সাধারণতঃ মন্ত্রীসভার উপদেশ গ্রহণ করতেন। অবশ্য একথাও ঠিক যে যদি কোন বিশেষ অবস্থায় সম্রাট মন্ত্রীসভার উপদেশ অগ্রাহ্য করতেন—এরূপ অবস্থা উদ্ভূত হয় নাই—তাহলে মন্ত্রীসভা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারতেন না, জনচিত্তে সম্রাট অতীব শ্রদ্ধার পাত্র থাকায়। মূলতঃ মেজী সম্রাট প্রশাসনিক সব ব্যাপারে মন্ত্রীমণ্ডলীর মুখাপেক্ষী থাকতেন। মুৎসুহিতো সমসাময়িক জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের মত দৃঢ়চেতা ছিলেন না, যে দ্বিতীয় উইলিয়াম

পূর্ব বিসমার্ককে অপসারিত ক'রে জনৈক ফন কেপ্রিভিকে (Von Caprivi) চান্সেলার পদে নিয়োগ করেন। জাপানী সম্রাট যে মন্ত্রিমণ্ডলীর উপদেশ মান্য ক'রেই দেশ শাসন করতেন তার কিছু উৎকৃষ্ট প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী মৎসুকাতার উপদেশ অনুযায়ী সম্রাট কাউণ্ট ওকুমাকে প্রিভি কাউন্সিলের সভাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করেন, যেহেতু ওকুমা মন্ত্রিসভার বিধান অগ্রাহ্য ক'রে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সংযোগ রেখে চলতেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ডায়েটের নিম্নকক্ষ এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ডায়েটের উচ্চকক্ষ মন্ত্রীমণ্ডলের বাজেটে আয়-ব্যয়ের অংক পরিবর্তন করতে চায়। সে ক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে তাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে শাসনকার্যের আয়-ব্যয় নিরূপণ করা অসুবিধাজনক হয়। কক্ষ দুটির অনমনীয় মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রীমণ্ডলী সম্রাটকে উপদেশ দান করেন যে তিনি যেন কক্ষদ্বয়ের উপর এক আদেশ জারি করেন এই মর্মে যে মন্ত্রীমণ্ডলীর বাজেট দুটি অপরিবর্তিত আকারে অনুমোদন করতে হবে। সম্রাট তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীমণ্ডলীর উপদেশ অনুযায়ী আদেশ জারি করেন। ফলে ১৮৯৩ ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দের বাজেট দুটি অপরিবর্তিত আকারে সংশ্লিষ্ট কক্ষের অনুমোদন লাভ করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সম্রাট মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতের পুতুলমাত্র ছিলেন। শাসনব্যাপারে তিনি থাকতেন নিষ্ক্রিয়। শোগুন-শাসনের অবসানের পর সম্রাটের প্রশাসনিক ক্ষমতার পুনর্বাসন হয় নি, পুনর্বাসন হয়েছিল তাঁর মর্যাদার। মেজীযুগে সম্রাটের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের অন্তরের মণিকোঠায়। কোকুতাই মতবাদ জনগণকে রাজসিংহাসনের পবিত্রতা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে। ফলে জাতীয় চেতনায় সম্রাটের আসন হয় সুপ্রতিষ্ঠিত। জনমানসে সম্রাটের আসন হয় অটল। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিদ্রোহ ছিল কল্পনাতীত। শোগুন যুগের মত সম্রাটের রাজপ্রাসাদ শুধুমাত্র বিলাসিতার আবাস থাকে না। কিয়োটো থেকে এডোতে স্থানান্তরিত রাজধানী পরিণত হয় প্রকৃত প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্রে।

জনগণের অধিকার ও কর্তব্য

সংবিধানে জনগণের কিছু অধিকার এবং একটি কর্তব্যের উল্লেখ আছে। কর্তব্যটি ছিল আইনানুসারে সরকারকে কর প্রদান করা। অধিকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল :

(১) আইন অনুযায়ী নির্ধারিত যোগ্যতা অনুসারে, সকলের সমভাবে সামরিক এবং বেসামরিক পদে অথবা অন্য যে কোন সাধারণ পদে নিয়োগের অধিকার ;

(২) আইন অনুযায়ী, স্থলবাহিনী বা নৌবাহিনীতে যোগদানের অধিকার ;

(৩) বে-আইনী গ্রেপ্তার, আটক, বিচার বা শাস্তিপ্রদান নিষিদ্ধ ;

(৪) আইনত বিচারক দ্বারা বিচারের অধিকার থেকে কোন জাপানীকে বঞ্চিত করা নিষিদ্ধ ;

(৫) আইন-অনুমোদিত ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে কোন জাপানীর বিনা অনুমতিতে তাঁর গৃহে প্রবেশ বা খানাতল্লাস নিষিদ্ধ ;

(৬) আইন-অনুমোদিত ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে কোন জাপানীর চিঠিপত্রাদির গোপনীয়তা অলঙ্ঘনীয় ।

(৭) প্রত্যেক জাপানীর সম্পত্তির উপর অধিকার অলঙ্ঘনীয় ; জনসাধারণের স্বার্থে সম্পত্তি সম্পর্কে যদি কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহলে সেই ব্যবস্থা হবে আইনসম্মত ;

(৮) জাপানীদের সীমিতভাবে ধর্মবিশ্বাসে স্বাধীনতা থাকবে, যাতে ধর্মস্বাধীনতা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত না করে কিংবা সাধারণের পক্ষে স্ব স্ব কর্তব্য পালনে বিরোধ সৃষ্টি না করে ;

(৯) জাপানের অধিবাসীদের বাক্-স্বাধীনতা, গ্রন্থ-প্রকাশনের স্বাধীনতা এবং জনসভা আহ্বানের স্বাধীনতা থাকবে, অবশ্য আইনের সীমার মধ্যে ;

(১০) জাপানী যে-কোন প্রকার আবেদন উপস্থাপিত করতে পারবেন, সেই আবেদন সম্পর্কিত নিয়ম পালন করে।

দেখা যাচ্ছে, উক্ত অধিকারসমূহ সংবিধান-ভিত্তিক ছিল না, ছিল দেশের আইন-ভিত্তিক বা সংবিধিবদ্ধ। মেজী সরকার যে-কোন অজুহাতে অধিকারগুলি বাতিল করবার ক্ষমতা রাখতেন। ইহা নিতান্তই অগণতান্ত্রিক। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হলে সম্রাট অর্ডিনান্স জারি করে প্রেস ও প্রকাশনের স্বাধীনতা হরণ করেন। রুশ-জাপান যুদ্ধকালেও (১৯০৪-০৫) সম্রাট আইন জারি করে সাময়িকভাবে কিছু কিছু অধিকার খর্ব করেন। মূলতঃ যুদ্ধকালে কিংবা জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে সম্রাট পূর্বোক্ত যে-কোন অধিকার প্রত্যাহার করে আদেশ জারি করতে পারতেন। তখন জাপানে হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus) আইন (বন্দীকে সশরীরে আদালতে হাজির করে তাকে বন্দী করার কারণ প্রদর্শন) চালু না থাকায় জাপানীদের রাজনৈতিক অধিকার যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়। তবে ইহাও অনস্বীকার্য যে সামন্ততান্ত্রিক যুগে জাপানে কোন সিভিল কোড বা বেসামরিক নিয়মাবলী চালু ছিল না, যা মেজীযুগে সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। এই অর্থে মেজীযুগের আবির্ভাবে জাপানে নবযুগের স্পর্শ অনুভূত হয়।

আইন-সভা (লেজিস্‌লেচার)—অনুচ্ছেদ ৩৩-৫৪

মেজি সংবিধানে আইনসভা (ডায়েট বা গিকাই) ছিল দ্বিকক্ষ সম্বলিত—উচ্চকক্ষ বা হাউস অব পিয়ার্স (সভ্য সংখ্যা ৩৬৮) এবং নিম্নকক্ষ—হাউস অব

রেপ্রেজেন্টেটিভস্ (সভ্য সংখ্যা ৩৭৯)। উচ্চকক্ষের সভ্যেরা ছিলেন মনোনীত। রাজপরিবারের সভ্য, প্রিন্স এবং মারকুইস শ্রেণীভুক্ত অভিজাতবংশীয় ব্যক্তি, কাউন্ট, ভাইকাউন্ট এবং ব্যারণ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি এবং কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী থেকে (যথা পণ্ডিত শ্রেণী, সর্বোচ্চ করদাতা শ্রেণী এবং ইম্পিরিয়াল অ্যাকাডেমির সভ্যশ্রেণী) সম্রাট কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি—এঁদের নিয়ে গঠিত হত উচ্চকক্ষ। নিম্নকক্ষের সভ্যগণ নির্বাচিত হতেন। তাঁদের কার্যকাল থাকত চার বৎসর।

উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ সম্বলিত ডায়েটের ক্ষমতা :

আইন প্রণয়ণের অধিকার ছিল ডায়েটের হস্তে। উভয় কক্ষ একটি বিল অনুমোদন করলে সেই বিল সম্রাটের স্বাক্ষরের জন্য [illegible] প্রেরিত হত। সম্রাট স্বাক্ষর করলে বিলটি আইনে (Act) পরিণত হত। কিন্তু আইন চালু হবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শাসনবিভাগের মন্ত্রীর Act-এর উপর প্রতিস্বাক্ষরের প্রয়োজন হত। এই প্রতিস্বাক্ষর ব্যতিরেকে আইনটি কার্যকরী হত না। বিল স্বাক্ষরিত করার বা না করার চরম অধিকার ছিল সম্রাটের, কিন্তু রীতি অনুসারে সম্রাট এই চরম অধিকার প্রয়োগ করতেন না। রাজ্যের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত বাজেট ডায়েটে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হত, কিন্তু বাজেটে কোন পরিবর্তন সাধন ডায়েটের অধিকারভুক্ত ছিল কিনা, একথা সংবিধানে লিখিত নাই। ডায়েটের এই অধিকার সংবিধানে অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে। মোট কথা, বাজেট অনুমোদন ক্ষেত্রে ডায়েটের ক্ষমতা ছিল সীমিত। ডায়েটের অধিবেশন চলাকালীন ডায়েটের সভ্যগণ যে-কোনও অবাঞ্ছিত মন্ত্রীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারতেন। মন্ত্রীসভা নির্বাচিত না হওয়ায় ডায়েটের নিকট দায়িত্বশীল ছিল না। সেইজন্য ডায়েটের পক্ষে অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করা সম্ভব ছিল না। তজ্জন্য ডায়েটের সভ্যেরা অধিবেশন চলাকালে মন্ত্রীদিগকে নানাবিধ প্রশ্ন করে জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেতেন। আত্মসম্মান বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা মন্ত্রিগণ তখন পদত্যাগ করতেন। ডায়েটের এই অধিকার Right of Interpellation নামে অভিহিত ছিল। সম্রাটকে সম্বোধন করে আবেদনপত্র উপস্থাপিত করবার অধিকারও ডায়েটের ছিল।

আইন-প্রণয়ন ক্ষেত্রে ডায়েটের উভয় কক্ষের সমান অধিকার ছিল। ব্যতিক্রম ছিল কেবলমাত্র বাজেট সর্বপ্রথম উপস্থাপনের ক্ষেত্রে। বাজেট সর্বপ্রথম উপস্থাপিত হত নিম্নকক্ষে, উচ্চকক্ষে নয়। উচ্চকক্ষ সংগঠিত হত নিতান্তই অভিজাতবংশীয় ব্যক্তিদের নিয়ে। ৩৬৪ জন সভ্যের মধ্যে ২০১ জন ছিলেন বংশগত অভিজাত সম্প্রদায়-ভুক্ত, ১২২ জন ছিলেন সম্রাট কর্তৃক মনোনীত এবং

অবশিষ্ট ৪৫ জন ছিলেন সর্বোচ্চ হারে করদাতাদের অন্তর্ভুক্ত। এ হেন সংগঠিত উচ্চকক্ষকে নিম্নকক্ষের সমক্ষমতাসম্পন্ন করা অতীব অগণতান্ত্রিক। মেজী সরকার প্রশাসনে এই উচ্চকক্ষের সমর্থনপুষ্ট ছিলেন। মূলতঃ অভিজাততান্ত্রিক মেজী সরকার সংসদীয় শাসনের প্রতিকূলে তিনটি মুখ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যথা প্রথমতঃ, যে-কোনও সময় ডায়েটের অধিবেশন স্থগিত করার এবং নিম্নকক্ষ বাতিল করার ক্ষমতা সম্রাটের উপর ন্যস্ত ছিল, দ্বিতীয়তঃ, ডায়েটের অধিবেশন না-চলাকালীন সম্রাটকে অর্ডিন্যান্স জারী করবার ক্ষমতা দেওয়া হত, এবং তৃতীয়তঃ, যদি ডায়েট নূতন বাজেট অনুমোদন করতে অস্বীকৃত হত তাহলে পূর্ব বৎসরের বাজেট অনুসারে সরকার প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করতে পারতেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা—অনুচ্ছেদ ৫৫-৫৬ :

কাউন্সিল অব মিনিস্টারস, স্থল ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের সংস্থা (সুপ্রিম কম্যান্ড), প্রিভি কাউন্সিল, জেনরো এবং ইম্পিরিয়াল হাউসহোল্ড মিনিস্ট্রি—এইগুলি নিয়ে গঠিত ছিল প্রশাসনিক বিভাগ।

কাউন্সিল অব মিনিস্টারস

মেজী সংবিধানে 'ক্যাবিনেট' শব্দটির উল্লেখ নাই। তৎপরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে কাউন্সিল অব মিনিস্টারস। ৫৫নং অনুচ্ছেদটি কাউন্সিল অব মিনিস্টারস সম্পর্কিত একমাত্র অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, দেশের প্রত্যেক বিভাগীয় মন্ত্রী স্ব স্ব বিভাগের শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্রাটকে উপদেশ দেবেন। প্রশাসনিক যাবতীয় আইনকানুন, রাজকীয় অর্ডিন্যান্স এবং রাজকীয় আজ্ঞপ্তির উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর প্রয়োজন। এই অনুচ্ছেদে ক্যাবিনেট শব্দের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এক রাজকীয় আজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত হয় যে 'ক্যাবিনেটের' পক্ষে যা অতীব প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে দেশের প্রশাসনিক সর্ব ব্যাপারের উপর ক্যাবিনেটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন এবং ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত একীবিধ এবং ত্বরান্বিত করণ। মেজী সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রচলিত বিধিবদ্ধ আইন সমূহ যদি বর্তমান সংবিধানের বিরোধী না হয় তাহলে সেগুলি বলবৎ থাকবে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের আজ্ঞপ্তিটি মেজী সংবিধানের বিরোধী ছিল না। সে ক্ষেত্রে উক্ত আজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত 'ক্যাবিনেট' শব্দটিরও প্রচলন বজায় থাকে। সুতরাং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের আজ্ঞপ্তি এবং মেজী সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদের একত্র পাঠে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মেজী সংবিধানে ক্যাবিনেট শব্দটির সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তার ন্যায়সঙ্গত অস্তিত্ব (De jure

existence) ছিল। কুইগলীর (Quigley)-র মতে, ক্যাবিনেট শব্দটি ছিল মেজী-সংবিধান বহির্ভূত (Extra-constitutional)।

কাউন্সিল অব মিনিস্টারস বা ক্যাবিনেটের সংগঠন :

প্রধানমন্ত্রী এবং বারজন বিভাগীয় মন্ত্রী নিয়ে গঠিত ছিল মেজী ক্যাবিনেট। প্রধানমন্ত্রী কোন বিশেষ একটি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না। তাঁর উপর ন্যস্ত থাকত সকল বিভাগের সার্বিক তদারকির দায়িত্ব। তাঁর দ্বাদশ সহকর্মীর শাসনাধীন বিভাগগুলি ছিল—স্বরাষ্ট্র, বৈদেশিক, অর্থ-সংক্রান্ত, যুদ্ধ, নৌবাহিনী, বিচার, শিক্ষা, বাণিজ্য ও শিল্প, কৃষি ও বনসম্পদ, যোগাযোগ, রেলপথ এবং বিদেশ (Overseas)। মন্ত্রিগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। তাঁরা মনোনীত হতেন সম্রাট কর্তৃক। সেই কারণে মন্ত্রীরা ডায়েটের সভ্য ছিলেন না। তথাপি তাঁরা ডায়েটের অধিবেশন চলাকালীন ডায়েটের উভয় কক্ষে উপস্থিত থাকতে পারতেন। ৫৫নং অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণিত হয় যে তত্ত্বগতভাবে মন্ত্রীমণ্ডল কোন যৌথ দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু কার্যতঃ নীতির প্রশ্ন উঠলে বিভাগীয় মন্ত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং প্রধান মন্ত্রীর উপদেশ গ্রহণ করতেন। মন্ত্রীদের মুখ্য দায়িত্ব ছিল সম্রাটকে উপদেশ দানে শাসনকার্য পরিচালনায় সাহায্য করা। সম্রাট এই উপদেশ গ্রহণ করতে আইনতঃ বাধ্য না থাকলেও সচরাচর গ্রহণ করতেন। ফলে প্রশাসনিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হত না।

সুপ্রীম কম্যাণ্ড বা সুপ্রীম ওয়ার কাউন্সিল :

ফিল্ড মার্শাল, ফ্লীট অ্যাডমিরাল, স্থলবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধান, স্থলবাহিনী কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রী এবং নৌবাহিনী কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রী—এঁদের নিয়ে গঠিত হত সুপ্রীম কম্যাণ্ড। স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত মন্ত্রীদ্বয়কে বাহিনী দুইটিতে কর্মরত সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত করা হত, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী উক্ত মন্ত্রীদ্বয়কে মনোনীত করতেন তাঁদের নিজ নিজ ইনার কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে। অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারতেন না কিন্তু স্থলবাহিনীর ও নৌবাহিনীর প্রতিনিধিসূচক মন্ত্রীদ্বয় প্রধান মন্ত্রীর বিনা অনুমতিতেই সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারতেন। বাহিনী দুইটির ইনার কাউন্সিল-এর সঙ্গে ক্যাবিনেটের কোন বিরোধ দেখা দিলে যদি ইনার কাউন্সিল দুইটি স্ব স্ব মন্ত্রী নিয়োগ না করতেন তাহলে ক্যাবিনেট অর্থাৎ সরকার গঠিত হতে পারত না। মেজী সংবিধানের ইহা একটি অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য।

প্রিভি কাউন্সিল :

কাউন্ট ইটো হিরোবুমি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রিভি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রিভি কাউন্সিল মেজী সংবিধানের খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করলে সম্রাট সংবিধানে স্বাক্ষর দান করেন। প্রিভি কাউন্সিলের মুখ্য দায়িত্ব ছিল সম্রাটকে শাসনকার্যে পরামর্শ দান করা। কাউন্সিলের কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না। জনসাধারণ বা ডায়েটের সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব ও ছিল না। একমাত্র ক্যাবিনেটের সঙ্গে ইহার সরকারী সংস্রব ছিল। প্রিভি কাউন্সিলের মোট সভ্য সংখ্যা ছিল ২৬—১ জন সভাপতি, ১ জন সহকারী সভাপতি, ১২ জন বিভাগীয় মন্ত্রী এবং অবশিষ্ট ১২ জন সম্রাটের মনোনীত ব্যক্তি। শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, বিচারক, সেনাপতি ইত্যাদি পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সম্রাট উক্ত বার জনকে মনোনীত করতেন।

জেনরো :

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের সংবিধান রচিত হবার পূর্বে ইটো, ইনোয়ু, মাৎসুকাতা প্রভৃতি যে সমস্ত অভিজ্ঞ, প্রবীণ রাজনীতিক প্রশাসনিক সাহায্য দান করতেন তাঁরা অভিহিত ছিলেন জেনরো নামে। তাঁরা সামরিক ও বেসামরিক উভয় পদেই অধিষ্ঠিত থাকতেন। মেজী সংবিধান চালু হবার পর জেনরো পদের অবলুপ্তি ঘটে।

ইম্পিরিয়াল হাউসহোল্ড মিনিস্ট্রি :

এই সংস্থার সভ্যেরা মন্ত্রী ছিলেন না। তাঁরা ক্যাবিনেটের নিয়ন্ত্রণাধীনও ছিলেন না। তাঁরা মনোনীত হতেন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক। লর্ড প্রিভিশীল, গ্র্যান্ড চেম্বারলেন (কঞ্চুকী) প্রভৃতি ছিলেন উক্ত সংস্থার সভ্য।

বিচার বিভাগ :

বিচারের জন্য মেজী সংবিধানে দুই প্রকার আদালতের ব্যবস্থা ছিল—সাধারণ বিচারালয় এবং প্রশাসনিক বিচারালয়। সাধারণ বিচারালয় অর্থে বোঝাত স্থানীয় বিচারালয়, জেলা বিচারালয়, পুনর্বিচারের জন্য বিচারালয় (অ্যাপিল কোর্ট) এবং সর্বোপরি মহাধিকরণ (সুপ্রীম কোর্ট)। স্থানীয় বিচারালয়ে স্থানীয় বেসামরিক ও অপরাধমূলক বিষয়ের বিচার হত। জেলা বিচারালয়ে জেলা-সংক্রান্ত বেসামরিক ও অপরাধমূলক বিষয়ের বিচার ব্যতীত স্থানীয় বিচারালয় থেকে প্রেরিত অ্যাপিল সংক্রান্ত বিষয়েরও বিচার হত। জেলা বিচারালয় থেকে প্রেরিত অ্যাপিল-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শুনানী হত অ্যাপিল

কোর্টে। রাজদ্রোহিতা সংক্রান্ত বিষয়গুলির তথা রাজপরিবারের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধমূলক বিষয়গুলির বিচার হত একমাত্র সুপ্রিম কোর্টে। ডায়েট কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিল বা আইনের বিচার-সুলভ সমালোচনা (জুডিসিয়াল রিভিউ) করার অধিকার সুপ্রীম কোর্টের ছিল না, সে অধিকার ছিল সম্রাটের হস্তে অর্থাৎ ক্যাবিনেটের হস্তে।

শাসন-সংক্রান্ত বিষয়গুলির বিচারের ব্যবস্থা ছিল প্রশাসনিক বিচারালয়ে। প্রশাসনিক বিচারালয়ে যে-সব বিষয়ের বিচার হত সেগুলি হচ্ছে—প্রশাসনিক ফি-আরোপ সংক্রান্ত, প্রশাসনিক ফি ও কর আদায় সংক্রান্ত, লাইসেন্স না-মঞ্জুর সংক্রান্ত, কিংবা পূর্বে প্রদত্ত লাইসেন্সের বাতিল-করণ সংক্রান্ত, জমি-সংক্রান্ত বিবাদ ইত্যাদি।

আর্থিক বা রাজস্ব বিভাগ :

৬২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নূতন কর ধার্য এবং পুরাতন করের পরিবর্তন একমাত্র আইন অনুসারে সম্ভব। অর্থাৎ একমাত্র ডায়েটই এ ব্যাপারে একমাত্র অধিকারী। কিন্তু প্রশাসনিক ফি আরোপ এবং আদায়ের অধিকার ছিল মন্ত্রীমণ্ডলীর। নূতন আর্থিক বৎসর শুরুর পূর্বে প্রশাসনিক আয়-ব্যয়ের অঙ্ক নির্ধারিত করে ক্যাবিনেটকে ডায়েটের নিম্নকক্ষে একটি বাজেট পেশ করতে হত। নিম্নকক্ষের সম্মতিদানের পর বাজেটটি প্রেরিত হত ডায়েটের উচ্চ কক্ষে। উচ্চকক্ষের অনুমোদনের পর বাজেটটি প্রেরিত হত সম্রাটের স্বাক্ষরের জন্য। সম্রাটের অনুমোদনের পর বাজেটটি প্রেরিত হত অর্থবিভাগের মন্ত্রীর নিকট। অর্থমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পর বাজেটটি কার্যকরী হত। ক্যাবিনেটের সম্মতি ব্যতিরেকে ডায়েট কয়েকটি বিশেষ ধরনের আয়-ব্যয়ের অঙ্ক পরিবর্তন করতে পারত না। অবশিষ্ট আয়-ব্যয়ের অঙ্ক পরিবর্তনের অধিকার ডায়েটের ছিল, যেমন ছিল সমগ্র বাজেটটি প্রত্যাখ্যানের অধিকার। সে ক্ষেত্রে সরকার পূর্ব আর্থিক বৎসরের বাজেট অনুযায়ী পরবর্তী বৎসরের আয়-ব্যয় নির্ধারিত করতে পারতেন। এই রীতি অতীব অগণতান্ত্রিক।

(গ) মেজী সংবিধান কর্তৃক প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ কি ?

মেজী সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে মেজী সংবিধান ছিল রাজতান্ত্রিক। সংবিধানটি জাপানী জাতির গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে নি। ত্রয়োদশ শতকে ইংরাজ জাতি রাজা জনকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ম্যাগনা কার্টা স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। পরবর্তীকালে এই ম্যাগনা কার্টা ইংরাজ জাতির গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। কিন্তু জাপানী সম্রাট মুৎসুহিতো ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জাপানী জাতির জন্য স্বেচ্ছায়

যে সংবিধান অনুমোদন করেন তা গণতন্ত্র-ভিত্তিক ছিল না। তথাপি সমগ্র জাতি সে সংবিধানকে সম্রাটের দান হিসাবে অবনতমস্তকে গ্রহণ করেন। সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত হয় ইম্পিরিয়াল হাউসহোল্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিউরোর রুদ্ধদ্বার কক্ষে। স্বাভাবিক কারণেই এই খসড়া প্রস্তুতিতে জনপ্রতিনিধিদের কোন মতামত আমন্ত্রিত হয় নি। কাউন্ট ইটো প্রভৃতি মুষ্টিমেয় জনকয়েক সরকারের আস্থাভাজন নেতার তত্ত্বাবধানে সংবিধানটি রচিত হয় জাপানের চিরাচরিত রাজনৈতিক মতবাদ অনুসরণে অর্থাৎ রাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী। সংবিধানের বাহ্যিক রূপরেখা সংসদীয় শাসন-সুলভ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার কাঠামো হচ্ছে 'অলিগার্কি'-সুলভ। এ কাঠামো গণতান্ত্রিক শাসনের কোন প্রতিশ্রুতি বহন করে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে ক্যাবিনেটের উপর ডায়েটের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না। মন্ত্রীরা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হতেন না। ফলে মন্ত্রীরা ডায়েটের সভ্য হতেন না এবং তজ্জন্য তাঁরা থাকতেন ডায়েটের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত। সংসদীয় শাসনপদ্ধতিতে এ বিধান অচল। সংসদীয় শাসনতন্ত্রে আইনসভার দুটি কক্ষের সর্ব ব্যাপারে সমান অধিকার থাকে না। কিন্তু মেজী সংবিধানে আইনসভার দুটি কক্ষেরই সম অধিকার ছিল। মেজী সংবিধান অনুযায়ী, সুপ্রীমকোর্টের সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করবার অধিকার ছিল না, যেমন অধিকার ছিল না ডায়েট কর্তৃক অনুমোদিত কোন আইনের বিচার-সুলভ সমালোচনা করবার। আইন সভার সংবিধান-সংশোধনের প্রাথমিক প্রস্তাব পেশ করার অধিকার ছিল না। সে অধিকার ছিল সম্রাটের অর্থাৎ তাঁর মনোনীত ক্যাবিনেটের। জনগণের রাজনৈতিক অধিকার সমূহ সংবিধান-ভিত্তিক ছিল না, সেগুলি ছিল বিধিবদ্ধ আইন-ভিত্তিক। এই ব্যবস্থা অতীব অগণতান্ত্রিক। দেশের বিধিবদ্ধ আইনের পরিবর্তনের সঙ্গে জনগণের অধিকারগুলিও কার্যত পরিবর্তিত হত, যদিও সংবিধান অনুযায়ী সেগুলি থাকত অপরিবর্তিত। এই সকল উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে মেজী সংবিধানে দুইকক্ষ-সম্বলিত আইন সভা, ক্যাবিনেট, প্রধানমন্ত্রী, বিচার বিভাগ ইত্যাদি সংসদীয় শাসন-সুলভ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সংবিধানের অন্তর্নিহিত রূপটি ছিল অলিগার্কির রূপ অর্থাৎ মুষ্টিমেয় নেতৃবৃন্দ-কর্তৃক পরিচালিত শাসনতন্ত্রের রূপ।

মেজীযুগের নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক সংবিধানের পক্ষপাতী ছিলেন না। ওকুবো, টোশিমিচি প্রভৃতি নেতা গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। কাউন্ট ইটোও জনগণের রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন না। এমন-কি ফুকুজাওয়া ইউকিচি রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং কৃষক তথা শকটচালকদের হস্তে রাজনৈতিক অধিকার দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। মোট কথা, মেজী সংবিধানের রূপরেখা গণতান্ত্রিক নয়। এই সংবিধান শাসনভার ন্যস্ত করে কয়েকটি

বিশিষ্ট গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের উপর, যাঁরা জনগণের নিকট দায়িত্বশীল ছিলেন না। সর্বক্ষেত্রেই ছিল অলিগার্কি বা প্রায়-অলিগার্কি-সুলভ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহায়ক। দ্বৈতশাসন বা শোগুন শাসন অবসানের পর জাপানী সমাজের আধুনিকীকরণ হয় কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে কোন আধুনিকীকরণ হয় নি।

(৫) মেজী চিন্তাধারা—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক :

(ক) সামাজিক চিন্তা :

প্রাক্-মেজী যুগ ছিল সামন্ত যুগ। সুতরাং সে যুগের সমাজ ছিল উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে বিভক্ত। সামন্তযুগের নেতৃবৃন্দ সামাজিক ঐক্যস্থাপনের বা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাম্যভাব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে নি। রাজপরিবার, রাজবংশ, শাসকশ্রেণী, ডাইমিয়ো, সামুরাই—এঁরা ছিলেন সমাজের 'পেট্রিসিয়ান' শ্রেণীভুক্ত। সমাজের বৃহৎ অংশ অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায় 'প্লিবিয়ান' হিসাবে গণ্য হত অর্থাৎ কৃষকশ্রেণী ছিল অবহেলিত। বণিক শ্রেণীর অর্থ-কৌলিন্য থাকা সত্ত্বেও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল না।[২৫]

মেজীযুগের অভ্যুদয়ের পর সামাজিক চিন্তাধারায় কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে মেজী নেতৃবৃন্দ জাপানী সমাজকে নবরূপে সজ্জিত করতে সচেষ্ট হন। ডাইমিয়ো এবং সামুরাই শ্রেণীর বিশেষ মর্যাদা-সম্পন্ন আসন নূতন সমাজের সমর্থন পায় নি। কিন্তু মেজী নেতাদের সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তাধারা না থাকায় জাপানী সমাজ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ে ওঠে নি। তত্ত্বগতভাবে আইনের চক্ষে সকলেই সমান বলে পরিগণিত হলেও, এমন-কি অবহেলিত এতা বা হাইনিন শ্রেণী সমাজে আর ততটা ঘৃণ্য না থাকলেও সামাজিক ভিত্তি অসম সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের উপরই একরকম প্রতিষ্ঠিত থাকে। সমাজের বৃহত্তম অংশ কৃষকশ্রেণীর লক্ষণীয় কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মেজী নেতৃবৃন্দ পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা-ভিত্তিক সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

রাজনৈতিক চিন্তা :

মেজীযুগের রাজনৈতিক চিন্তায় গণতন্ত্র স্থান পায় নি। জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে শাসকশ্রেণী (যা গঠিত ছিল প্রধানত সাতসুমা, চোষু, তোসা ও হিজেন

২৫ সামন্ত যুগের শ্রেণী বিভাজনের উপর বিশদ আলোচনার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

গোষ্ঠীর নেতাদের নিয়ে) দেশ শাসন করুন কিন্তু শাসনকার্যে জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ সমর্থন যোগ্য নয়—ইহাই ছিল মেজী জাপানের রাজনৈতিক আদর্শ। মেজী সংবিধান অনুযায়ী, প্রশাসনিক কাঠামো ছিল সংসদীয় কিন্তু জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনকার্যের সঙ্গে কোন সংযোগ ছিল না। মন্ত্রীমণ্ডলী ছিলেন আইন সভার নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত। মন্ত্রীরা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হতেন না। তাঁরা ছিলেন সম্রাটের মনোনীত। জাপানের চিরাচরিত রাজনৈতিক আদর্শ ছিল রাজতন্ত্র। মেজী সংবিধানে রাজতন্ত্র ছিল মুখ্য, সংসদীয় ব্যবস্থা ছিল গৌণ। সকল নেতাই রাজতন্ত্রে আস্থাভাজন ছিলেন কিন্তু সকল নেতার আস্থা একরূপ ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ, ইতাগাকির আদর্শ ছিল যে সম্রাট বিরাজিত থাকবেন শোভাবর্ধক ক্ষমতাবিহীন রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে এবং প্রকৃত শাসন ক্ষমতা থাকবে জনপ্রতিনিধিদের হস্তে। অপর দিকে, ইটো হিরোবুমি অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর আদর্শে, সম্রাট হবেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী, একচ্ছত্র রাষ্ট্রনায়ক। ইটো প্রথমে মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংযোগের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, শাসকশ্রেণী থাকবেন রাজনৈতিক-দলগত বিরোধের ঊর্ধ্বে। তাঁর আদর্শ ছিল 'নন-পার্টি' ক্যাবিনেট।' তাঁর মতের সমর্থনে ইটো বলতেন, দল-ভিত্তিক শাসন বা সংসদীয় শাসন সর্বশ্রেণীর নাগরিককে সমান রাজনৈতিক অধিকার দেয় না, দ্বিতীয়তঃ দলভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা তখনই সম্ভবপর হবে যখন রাজনৈতিক দলগুলি হবে দায়িত্বশীল জাতীয় দল, যার অভাব ইটোকে মানসিক পীড়া দিত। আবার, ইটোর এ বিশ্বাসও ছিল যে রাজনৈতিক দল সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে সংসদীয় শাসন সম্ভবপর হবে না অর্থাৎ ইটোর সুচিন্তিত বিবেচনায় দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের গঠনমূলক কার্যকলাপ এবং সংসদীয় শাসনের সাফল্যের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সমসাময়িক রক্ষণশীল নেতাদের চাপে ইটো গোড়ার দিকে দলভিত্তিক প্রশাসনের বিরোধিতাই করেন কিন্তু পরে অর্থাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি রিক্কেন সেয়ুকাই (Rikken Seiyukai) দলের নেতা হিসাবে সরকার গঠন করেন (১৯শে অক্টোবর ১৯০০—১০ই মে ১৯০১)। রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ইটোর ধারণা ছিল—যে দল সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতার সমর্থক, সেই দলই উৎকৃষ্ট দল, আর যে দল রাজনীতিতে উদারপন্থী এবং ফলতঃ গণতন্ত্রপন্থী, সেটি নিকৃষ্ট।[২৬] মোট কথা, মেজী যুগে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গণনিয়ন্ত্রক পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার কোন স্থান ছিল না।

২৬ George Akita, Foundations of Constitutional Government in Modern Japan, 1868-1900, দ্রষ্টব্য

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কিত ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা :

শোগুন-শাসনের অবসানের পর জাপানী নেতৃবৃন্দের প্রধান চিন্তা ছিল কি ভাবে পাশ্চাত্য ধাঁচে জাপানী সমাজকে গড়ে তোলা যায়। সম্রাট মুৎসুহিতোর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং জাপানী নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জাপানে পাশ্চাত্য আচার-আচরণ, পাশ্চাত্য পোশাক-পরিচ্ছদ, পাশ্চাত্য-সুলভ জীবনধারণের অনুকূল উপকরণাদি, যথা আধুনিক যানবাহন, বৈদ্যুতিক আলো, ডাক-তারের মাধ্যমে ত্বরিৎগতিতে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা প্রভৃতি, স্বল্পকালের মধ্যে প্রবর্তিত হয়, যার ফলে মেজী জাপান যেন নবসাজে সজ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

সাংস্কৃতিক চিন্তার গোড়ার কথা শিক্ষার প্রসার এবং নূতন ভাবধারার প্রকাশ। শিক্ষাবিস্তারের দিক থেকে প্রাক্-মেজী যুগ অবশ্য একেবারে অনগ্রসর ছিল না। সে যুগে জাপানীরা পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের জন্য নেদারল্যান্ডস, লন্ডন প্রভৃতি দেশে পাড়ি দিতেন। পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি জাপানী ভাষায় অনুবাদের জন্য তৎকালীন জাপানে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল, যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বহু শিক্ষাকেন্দ্রও। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জাপানে এমন কোন ক্ল্যান (Clan) ছিল না যেখানে নিজস্ব বিদ্যালয় ছিল না। টোকুগাওয়া যুগে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২২৩। সাতো ইসাই (Sato Issai, ১৭৭২-১৮৫৯) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল তিন হাজার। ডাচ ভাষায় পারদর্শী জাপানী পণ্ডিতদের তৎপরতায় জাপানে তখন পশ্চিমী ধাঁচে এক সাংস্কৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এডোতে তখন ডাচভাষায় পণ্ডিত জাপানীরা দুটি দলে বিভক্ত ছিলেন—শিতামাচি দল (Shitamachi group) এবং যামানোট দল (Yamanote group)। প্রথম দলভুক্ত ছিলেন ইটো গেনবোকু (Ito Genboku, ১৮০০-১৮৭১), সুবয় শিন্দো (Tsuboi Shindo, ১৭৯৫-১৮৪৮) এবং আরও অনেকে। এই সকল পণ্ডিতদের আগ্রহ ছিল ভাষা শিক্ষায় ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে। দ্বিতীয় দলভুক্ত ছিলেন ওয়াতানবে কাজান (Watanabe Kazan), তাকানো চোই (Takano Choei), সাতো নোবুহিরো (Sato Nobuhiro) প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তি। এঁদের আগ্রহ ছিল বিদেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণে। এতদ্ব্যতীত তাঁরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েও আগ্রহী ছিলেন। ফলে প্রাক্-মেজী যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে।

মেজীযুগের আবির্ভাবে সাংস্কৃতিক প্রসার ব্যাপকতর হয়।[২৭] এই প্রসঙ্গে

---

২৭ এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে সন্নিবেশিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য। অধিক জ্ঞানের জন্য দ্রষ্টব্য—Masaki Kosaka (ed)—Japanese culture in the Meiji Era' Vol. Viii. ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন David Abosch.

উল্লেখযোগ্য যে মেজীযুগের সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমে ব্যবহৃত সাবান, হাতঘড়ি ও ছাতা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৪,১০,১০০ ইয়েন মূল্যের ছাতা ক্রয় করা হয়। সমসাময়িক ব্যঙ্গবিষয়ের লেখক (Satirist) কানাগাকি রোবুন (Kanagaki Robun, ১৮২৯-৯৪) তাঁর অগুরেনবে (Aguranabe) নামক প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থে তৎকালে ব্যবহৃত ছাতা ও ঘড়ি অবলম্বনে বেশ ব্যঙ্গ করেছেন। গ্রন্থটির একস্থানে তিনি একটি যুবকের একটি কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—সামুরাই যে ভাবে তার দীর্ঘ তরবারি পরিধান করে সেইভাবে যুবকটি তরবারির পরিবর্তে ছাতা ধারণ করেছে এবং কটিবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করেছে ঘড়ির পুরু চেন। মূলতঃ ঘড়ি ও ছাতার ব্যবহার তখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অগুরেনবে লিখিত হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। পশ্চিমী সভ্যতার ভক্তদের উপর ইহা একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। সমসাময়িক ব্যঙ্গরচনার লেখকেরা তখন সরকারী অফিসে চাকরী, সরকারী পদস্থ কর্মচারী, সরকারী অফিসে ব্যবহৃত চেয়ার, পশ্চিমী ধাঁচে কেশ-বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ের উপর কৌতুকপূর্ণ রচনা প্রকাশ করতেন। এরূপ একটা রচনার নমুনা—

From out of the West
In flew the civilization
And enlightenment bird ;
Nesting in a chair-tree
He sang 'salary', 'salary'.

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় মেইরোকুশ (Meirokush) নামে একটি সমিতি। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মোরি আরিনোরি এবং নিশিমুরা শিগেকু। এর উদ্দেশ্য ছিল বক্তৃতা এবং একটি পত্রিকা প্রকাশনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা জনপ্রিয় করে তোলা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মেইরোকু জাশি (Meiroku Zasshi) নাম নিয়ে প্রস্তাবিত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এইকালে জাপানী বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমী ভাব প্রকাশের উপযোগী জাপানী পরিভাষার অভাব বোধ করেন। মেইরোকুশ এই অভাব দূরীকরণে অগ্রসর হয়। ফুকুজাওয়া ইউকিচিও কয়েকটি পশ্চিমী শব্দের অর্থবোধক জাপানী শব্দ উদ্ভাবন করেন, যেমন Speech-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেন এনজেটসু (Enzetsu), debate-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেন টোরন (Toron) ইত্যাদি।

মেজী জাপানে পাশ্চাত্য ভাবভিত্তিক নবজাগরণের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কয়েকটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মোরি ওগাই (Mori Ogai, ১৮৬২-১৯২২), যোকাই শোনান (Yokai Shonan), মোরি আরিনোরি (Mori Arinori) এবং সর্বোপরি ফুকুজাওয়া ইউকিচি (Fukuzawa Yukichi)।

মোরি ওগাই মেজী জাপানের সুলেখক হিসাবে খ্যাত। মেজীযুগে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনয়নে যাঁদের অবদান ছিল তাঁদের পূর্বসূরী হিসাবে শোনান স্মরণীয়। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার পৃষ্ঠপোষক। তিনি জাপানের রুদ্ধদ্বার নীতি ত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন এবং আমেরিকার সমর্থক ছিলেন। তিনি বলতেন, খৃষ্টধর্ম ইউরোপে জনমনকে ঐক্যবদ্ধ করেছে অথচ জাপানে শিন্টো, কনফিউসিয়ান ধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। জাপানীরা শোনানের শিক্ষা ও আদর্শ যথোচিতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। শোনান জাপানে রাজতন্ত্রের অবসানের পক্ষপাতী—জাপানী মনে এরূপ ধারণা সৃষ্ট হওয়ার ফলে শোনান শেষ পর্যন্ত নিহত হন। মোরি আরিনোরি ছিলেন মেজীযুগের অন্যতম বুদ্ধিজীবী। তিনি মিল ও স্পেনসার প্রণীত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজী ভাষায় 'জাপানে ধর্মীয় স্বাধীনতা' (Religious Freedom in Japan) নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শিক্ষা বিস্তার, এই দুইয়ের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সম্ভব হয়। তিনি বলতেন যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। যেদিন মেজী সংবিধান প্রকাশিত হয় সেইদিন তিনি নিশানা (Nishana) নামে ধর্মোন্মত্ত এক ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হন।

মেজীযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যে নামটি সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় সেটি হল ফুকুজাওয়া ইউকিচি (Fukuzawa Yukichi, ১৮৩৫-১৯০১)। ফুকুজাওয়া ছিলেন মেজীযুগের একজন প্রতিনিধিমূলক প্রথম সারির নেতা। তাঁর জীবনে তিনটি পর্যায় লক্ষ্যণীয়। প্রথম পর্যায়ে (১৮৬২-৬৯) তাঁর প্রয়াস ছিল বহির্বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে জাপানীদের সচেতন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেন, যথা টোজিন ওরাই (Tojin Orai, Comings and goings of foreigners), সেইয়ো জিজো (Seiyo Jijo, Condition in the west), সেইয়ো টাবি আন্নাই (Seiyo Tabi Annai, A guide to western travel) ক্যুরি জুকাই (Kyuri Zukai, Illustrated account of the Natural Sciences), সেকাই কুনিজুকুশি (Sekai Kunizukushi, বিভিন্ন দেশের উপর আলোচনা)। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮৬৯—৭৭) লিখিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে গোকুমন নো সুসুমে (Gakumon no Susume, Encouragement of Learning) এবং বুম্মেই রন নো গাইরিয়াকু (Bummei ron no Gairyaku, Outline of Civilization)। এই পুস্তক দুটিতে জ্ঞানদীপ্ত চিন্তানায়ক রূপে ফুকুজাওয়ার পরিচয় মেলে। তাঁর জ্ঞানদীপ্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবনের শেষ পর্যায় অবধি (১৮৭৭-১৯০১)।

ফুকুজাওয়ার মানসিকতার সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। তাই

তিনি বাকুফুর অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর হন। বাকুফুর অবলুপ্তির পর মেজীযুগের সূত্রপাত থেকেই তিনি রাজনীতি পরিত্যাগ করে জনগণের সাংস্কৃতিক কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলতেন—'রাজনীতি অদৃষ্টের হাতে সমর্পণ করে আমি যে যৎসামান্য পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণ করেছি তা দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণের জন্য আত্মসমর্পণ করলাম। পুস্তক প্রণয়ন ও অনুবাদের মাধ্যমে আমি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তারে অগ্রসর হই, যদিও আমি সঠিক জানি যে আমার কার্যের কোন সমর্থন পাব না বা আমাকে একাকী পথ চলতে হবে।'

ফুকুজাওয়া পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা এবং আত্মসম্ভ্রমে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে গণিতশাস্ত্রে অগ্রগতি, বিচারশক্তি এবং স্বাধীনতার প্রতি প্রবণতার উপর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। এই তিনটি পশ্চিমী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। স্বীয় পাণ্ডিত্য জাহির করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর ভূমিকা ছিল জ্ঞানদীপ্ত সমালোচকের তথা শিক্ষাবিদের। ইতিহাস বলতে তিনি বুঝতেন সভ্যতার ইতিহাস। তাঁর মতে সভ্যতার ক্রমবিকাশে তিনটি স্তর আছে—প্রস্তর স্তর বা savagery অর্থাৎ আদিম যুগের অসভ্যতার স্তর, যখন মানব ছিল যাযাবরের মতো ভ্রমণশীল এবং কৃষি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; দ্বিতীয় স্তর, barbarism। এই স্তরে কৃষি-ভিত্তিক ফিউডাল সামন্তযুগের অভ্যুদয় হয়; সর্বশেষ স্তর, Civilization বা আধুনিক শিল্প বিজ্ঞান-ভিত্তিক সভ্যসমাজের স্তর। ফুকুজাওয়ার মতে তাঁর কালে আফ্রিকা ছিল প্রথম স্তরভুক্ত, তুরস্ক, চীন ও জাপান দ্বিতীয় স্তরভুক্ত। তৃতীয় স্তর অর্থাৎ আধুনিক সভ্যদেশ বলতে তিনি বুঝতেন আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ। জাপান সম্পর্কে তিনি বলতেন, Barbarism স্তর পরিত্যাগ করে জাপানকে অগ্রসর হতে হবে Civilization স্তরের দিকে। তাঁর প্রশ্ন সভ্যতার সংজ্ঞা কি? তাঁর ধারণা, সভ্যতা এমন একটা উচ্চাবস্থা যেখানে মানবের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, যেখানে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং নৈতিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। সভ্যতার প্রভাবে মানব প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে জনকল্যাণে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়োজিত করতে পারে এবং অত্যাচার তথা অন্ধ বিশ্বাসের প্রকোপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। ফুকুজাওয়া ইতিহাস বলতে এই সবই বুঝতেন এবং বোঝাতেন। ফুকুজাওয়ার মতে সামন্ততন্ত্র সভ্যতা বিস্তারের পথে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকস্বরূপ। সামন্ততন্ত্র ধনী ও দরিদ্রের জন্য পৃথক সমাজ-ব্যবস্থা। ধনী হচ্ছে পেট্রিসিয়ান বা বিশেষ অধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণী, আর দরিদ্র সর্বহারার শ্রেণী। মানুষে মানুষে এরূপ শ্রেণীবিভাগ সভ্যতা বিকাশের পরিপন্থী। তাই তিনি বলতেন, সব মানুষই সমান, সকলেরই আছে সমান অধিকার। তাঁর গোকুমন নো সুসুমে গ্রন্থে লিখেছেন—ঈশ্বর

(Heaven) কাহাকেও তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে স্থান দেন না বা কাহারও জন্য তাদের নিচে স্থান নির্দিষ্ট করেন না। তাই ফুকুজাওয়া পরস্পরের মধ্যে সামাজিক পার্থক্যের নিন্দা করতেন। এই পার্থক্য সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। তাই সামন্ততন্ত্রের অবসান তাঁর নিকট ছিল এত কাম্য।

ফুকুজাওয়ার অপর একটি প্রশ্ন—সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক হবে? তাঁর বিবেচনায় এই সম্পর্ক হবে চুক্তির সম্পর্ক (Contractual relation)। অর্থাৎ দেশের কল্যাণ নির্ভর করবে শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবের উপর। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, কৃষক ভূমি আবাদের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন ক'রে দেশবাসীর জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। বণিক কৃষকের উৎপাদিত শস্য ক্রয় ক'রে জনসাধারণকে বিক্রয় করবে। সরকার দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবেন এবং প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের নিকট থেকে কর আদায় করবেন। তাঁর মতে, একটি জাতি যেন একটি কোম্পানী বিশেষ। জনগণ হচ্ছে সেই কোম্পানীর সভ্যবৃন্দ। প্রত্যেকের ভূমিকা দ্বৈত, একাধারে প্রভু তথা ভৃত্যের ভূমিকা।

ফুকুজাওয়া জনগণের অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সমতার সমর্থক ছিলেন। তাঁর এই সমর্থন ছিল যুক্তিবাদ-ভিত্তিক, মানবিকতা-ভিত্তিক নয়। বস্তুত তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী (Rationalist), মানবিকতা-উদ্বুদ্ধ (Humanist) নন। তাঁর আদর্শ ছিল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত না থেকে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা এবং দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করবার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। বুদ্ধিজীবীরা থাকবেন প্রশাসনের বাইরে, সাধারণ নাগরিক হিসাবে। তিনি স্বয়ং কোন প্রশাসনিক পদ গ্রহণ করেন নি।

মেজী চিন্তানায়কেরা দেশের ঐতিহ্য খর্ব ক'রে প্রগতি সাধিত করতে প্রয়াসী হন নি। ফুকুজাওয়া ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

মেজীযুগের সাংস্কৃতিক চিন্তার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল সাহিত্য রচনা। তখন রাজনৈতিক উপন্যাস এবং ভ্রমণকাহিনী লিখিত হয়। ফুকুজাওয়া লিখিত গ্রন্থগুলি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত রচিত হয় আরও অনেক গ্রন্থ। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কানাগাকি রোবুনের টাকাহাশি ওডেন যাশা হানাশি (Takahashi Oden yasha Hanashi), যানো র্যুকাই (Yano Ryukai) রচিত কেইকোকু বিদান (Keikoku Bidan), ওজোকি-রচিত (Ozoki) কেইশি ইকুন (Keisei Ikun), ডিসরেলির জীবনী। রাজনীতিবিদ হিসাবে ডিসরেলি মেজী জাপানে খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

মেজী চিন্তার অপর একটি অঙ্গ ছিল শিল্পচর্চা। তৎকালীন দুজন শিল্পী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—কানো হোগাই (Kano Hogai) এবং হাশিমোতো

গাহো (Hashimoto Gaho)। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে টোকিও আর্ট স্কুল স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ শিল্পোন্নতি ঘটে। পূর্বে অবশ্য নয় ইম্পিরিয়াল কোর্ট, ফুজিয়ারা বংশ, কামাকুরা বাকুফু এবং আশিকাগা বাকুফু শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিল। কাজেই প্রাক্ মেজীযুগেও শিল্পের বিকাশ ঘটে।

ধর্মের দিক থেকে খৃষ্টধর্ম পুনর্জীবিত হয়, কনফিউসিয়ান ধর্ম স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধিত হয়। খৃষ্টধর্মের জনপ্রিয়তা, কনফিউসিয়ান ধর্মের স্তিমিত ভাব এবং বৌদ্ধধর্মের সংস্কার তথা পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশের ফলে জাপানে একটা আধ্যাত্মিক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে।

অর্থনৈতিক চিন্তাধারা (Economic Thought)

মেজীযুগের অভ্যুদয়ে মেজী সরকার জাপানের অর্থনীতিতে কৃষিকে প্রাধান্য না দিয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন শিল্প, ব্যবসা এবং বাণিজ্যের উপর। মূলতঃ মেজীযুগের অর্থনীতি ছিল শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ভিত্তিক। অথচ তখন জাপানীদের অর্থনীতি সম্পর্কে কোন তত্ত্বগত ধারণা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারসাম্য, আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির আধিক্য এবং রপ্তানি অপেক্ষা আমদানীর অধিক্য দেশের অর্থনীতির উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—এ বিষয়ে জাপানীদের তখন কোন সম্যক জ্ঞান ছিল না। না থাকারই কথা, কারণ, প্রাক্ মেজীযুগে দুইশত বৎসরেরও অধিককাল বহির্বিশ্বের সঙ্গে জাপানের কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না। অবাধ বাণিজ্য, Laissez-faire নীতি বা বাণিজ্যিক ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ না করার নীতি, সরকার-নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রোটেকশন নীতি বা সরকার কর্তৃক আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক ধার্য করে দেশের শিল্পাদি রক্ষার নীতি, শিল্পে কেবলমাত্র বেসরকারী অর্থলগ্নী অথবা শুধুমাত্র সরকারী অর্থলগ্নী অথবা সরকারী-বেসরকারী উভয় জাতীয় অর্থলগ্নী—এ সব বিষয়েও মেজীযুগের সুপ্রভাতে জাপানীদের কোন তত্ত্বগত জ্ঞান ছিল না। অথচ সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাফল্যের জন্য দেশবাসীর শিল্প তথা ব্যবসা-বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান-আহরণ অত্যাবশ্যক ছিল।

অর্থনীতির মূল তত্ত্বসমূহ জাপানীরা যাতে সম্যকরূপে জানতে পারেন তজ্জন্য যে-সব জাপানী চিন্তাবিদ্ গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন তন্মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ফুকুজাওয়া ইউকিচি। ফুকুজাওয়া বলতেন, অর্থবিদ্যার লক্ষ্য হচ্ছে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধি করা, তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা এবং জীবনকে আরামদায়ক করা। অর্থবিজ্ঞান মানুষকে স্বেচ্ছায় কর্মতৎপর হতে শিক্ষাদান

করে এবং জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাদির উপর সরকারের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করে। জনগণের প্রতি সরকারের কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে ফুকুজাওয়া এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সরকারের জনগণকে চাকুরি দেওয়ার কোন দায়িত্ব থাকবে না। মোট কথা, সরকার জনগণের কৃষি, শিল্প বা ব্যবসায়ে কোন হস্তক্ষেপ করবেন না। ফলতঃ ফুকুজাওয়া ছিলেন অর্থবিদ্যায় ল্যাসেফেয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। সেইয়ো ফিজো গাইহেন (Seiyo Fijo Gaihen, ১৮৬৭) এবং মিনকান কেইজাই রোকু (Minkan Keizai Roku, ১৮৭৭)—এই দুই গ্রন্থে তাঁর ল্যাসেফেয়ার নীতির সমর্থন-সূচক আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। অর্থবিদ্যাকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে তিনি দ্রব্যমূল্য, শ্রমিকের বেতন, সুদ, কর, মূলধন, শিল্প ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ অর্থবিদ্যার উপর আধুনিক আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। উক্ত বৎসরে তামেয়ুকি অমানো (Tameyuki Amano) প্রকাশিত করেন কেইজাই জেনরন (Keijai Genron, Principles of Economics)। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিলের 'Principles of Political Economy'র অনুকরণে রচিত উক্ত গ্রন্থে অমানো তিনটি অধ্যায় সংযোজন করেন, যথা উৎপাদন, বণ্টন এবং বিনিময়। এ সবের তিনি তত্ত্বগতভাবে আলোচনা করেছেন। এর পর অমানো প্রকাশিত করেন Shosei Hyojun (Principles of Economics) নামক অর্থবিদ্যার নীতিসংক্রান্ত একটি গ্রন্থ। এই দুটি প্রকাশনের ফলে জনগণের অর্থতত্ত্ব ও অর্থনীতির উপর কিছুটা অধিকার জন্মে।

অবাধ বাণিজ্য এবং প্রোটেকশান (আমদানীর উপর শুল্ক ধার্যের মারফত শিল্পাদি রক্ষার নীতি)-এর উপরও মেজীযুগে কিছু আলোচনা হয়। Masamichi Tsuda ছিলেন প্রোটেকশন নীতির বিরোধী এবং অবাধ-বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক। Tsuda-র মত নাকামুরা এবং মাসাকি হায়াশি ছিলেন অবাধবাণিজ্য নীতির সমর্থক। নাকামুরা প্রচার করেন যে এরূপ ধারণা ঠিক নয় যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে দেশ থেকে বিদেশে স্বর্ণধাতু রপ্তানী হয়ে যায়। তাঁর মতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী হয় অন্য কারণে। সরকার বিদেশে শিক্ষার্থে ছাত্র প্রেরণ করেন, বিদেশীদের দেশের নানাকার্যে নিয়োগ করেন, বিদেশ হতে অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি ক্রয় করেন। এই সব বাবদে সরকারকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয় স্বর্ণের বিনিময়ে। সুতরাং নাকামুরার সিদ্ধান্ত এই যে অবাধ বাণিজ্যের জন্য দেশ হতে স্বর্ণ রপ্তানী হয় না। যুক্তির সারগর্ভতা যাই হোক না কেন এই জাতীয় আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থাদি পাঠ ক'রে জাপানীদের অর্থবিদ্যার জ্ঞান জন্মে।

প্রোটেকশনের নীতিরও সমর্থকের অভাব ছিল না। নোরিকাজু ওয়াকাযামা

(Norikazu Wakayama), ক্যোজি সুগি (Kyoji Sugi), তাকুজো উশিবা (Takuzo Ushiba), শিগেকি নিশিমুরা (Shigeki Nishimura) ইত্যাদি ছিলেন মেজীযুগে প্রোটেকসন নীতির সমর্থক। মেজীযুগের অভ্যুদয়ে ওয়াকাযামা সর্বপ্রথম প্রোটেকশন নীতি সমর্থন করেন। তাঁর মতে অবাধবাণিজ্য নীতিগতভাবে ভাল হলেও কার্যত দেশের মঙ্গলদায়ক নয়। জাপানের মত দেশে যেখানে জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ দরিদ্র, বাণিজ্য ও শিল্পে অনভিজ্ঞ এবং জনস্বার্থ উপলব্ধি করতে অসমর্থ, সেখানে অবাধ বাণিজ্যনীতি শুভফলদায়ক হতে পারে না। বর্তমানে অত্যাবশ্যক হচ্ছে কৃষিজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি বন্ধ করা, বিদেশ হতে আমদানি বন্ধ করা এবং দেশীয় প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে উৎসাহ দান করা, এক কথায় প্রোটেকশন নীতি অনুসরণ করা। তাঁর মতে দেশের সম্পদ প্রোটেকসন নীতি অনুসরণের উপরই নির্ভর করে। জাপানে প্রোটেকসন নীতির সমসাময়িক সমর্থকেরা ও ওয়াকাযামার সঙ্গে একমত ছিলেন। অবাধ বাণিজ্য এবং প্রোটেকসন—এই দুই নীতির সমর্থকদের পরস্পর-বিরোধী আলোচনার ফলে জাপানীরা অর্থবিদ্যায় অবাধ বাণিজ্য ও প্রোটেকসন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের সুযোগ পায়।

১৮৮০-র দশকে জাইবাৎসু নামে পরিচিত কয়েকটি পুঁজিপতি পরিবার গোষ্ঠী কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর শিল্প মেজী সরকারের নিকট হতে স্বল্পমূল্যে ক্রয় ক'রে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে। জাইবাৎসুর আবির্ভাবে জাপানের অর্থ-নীতিতে পুঁজিবাদের সৃষ্টি হয়। এর ফলে জাপানে বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। পুঁজিবাদী সম্প্রদায় এবং মজদুর শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে অভ্যুদয় ঘটে সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকদের। জাপানী সরকার সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধিতা করেন।

অর্থবিদ্যায় এইভাবে বিভিন্ন মত প্রকাশের ফলে মেজী জাপানে শিক্ষিত জনগণের মধ্যে অর্থনীতি সম্বন্ধে ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে।[২৮]

(৬) মেজীযুগের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

(ক) প্রশ্ন ওঠে, মেজীযুগ প্রাক্-মেজীযুগের কার্বন কপি (হুবহু নকল) ছিল কিনা। প্রাক্-মেজীযুগে জাপানের সমাজ ছিল সামন্ত-তান্ত্রিক, প্রশাসনিক অবস্থা ছিল বিকেন্দ্রীয়, অর্থনীতি ছিল কৃষি-ভিত্তিক। সেকালে

---

(২৮) Modern Asian Studies, Vol-2, Part 4, Octo, 1968—চুহেই সুগিয়ামা (Chuhei Sugiyama) লিখিত Development of Economic Thought in Meiji Japan শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

জাপানের সঙ্গে বহির্বিশ্বের কোন সংযোগ ছিল না, যার ফলে জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল না। জাপানের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল ঐতিহ্যগত (ট্রাডিশনাল)। মেজীযুগের আবির্ভাবে জাপানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। সমাজতন্ত্রের অবলুপ্তিতে জাপানী সমাজে নুতন শ্রেণীবিন্যাস ঘটে এবং শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীভূত হয়। অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে কৃষি-ভিত্তিক না থেকে মূলতঃ হয় শিল্প-ভিত্তিক। পেরী মিশনের পরিণামে জাপানের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং জাপানের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ঐতিহ্যগত না থেকে পাশ্চাত্য ধারায় অভিষিক্ত হয় এবং জাপানী সমাজ হয় পশ্চিমী সভ্যতা-ভিত্তিক। সুতরাং মেজীযুগকে প্রাক্-মেজীযুগের কার্বন কপি আখ্যা দেওয়া চলে না।

এই প্রসঙ্গে ভিলাকের মত আলোচনাযোগ্য। তাঁর মতে মেজী জাপানের সঙ্গে অতীতের অর্থাৎ প্রাক্-মেজী জাপানের কোন তীব্র বিচ্ছেদ ঘটে নি।[২৯] মেজীযুগের সঙ্গে যে প্রাক্-মেজীযুগের কোন বিচ্ছেদ ঘটে নি অর্থাৎ উভয় যুগের ইতিহাসের ধারা যে সমভাবে প্রবাহিত ছিল তার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে (১) পূর্বে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল অলিগার্কি ধাঁচের, পরেও শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি থেকে যায় অপরিবর্তিত। (২) প্রাক্-মেজী-যুগে সম্রাটের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন সামন্ত শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ টোকুগাওয়া বংশীয় শোগুন। মেজীযুগেও সম্রাটের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে বিরাজিত থাকেন সামন্তশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ সাতসুমা, চোষু, টোজা ও হিজেন সামন্ত-শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ। (৩) মেজীযুগের সম্রাটের প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং শোগুন যুগের সম্রাটের প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না। শোগুন যুগের প্রশাসনে সম্রাটের কার্যতঃ কোন ক্ষমতা ছিল না, পরবর্তী যুগের প্রশাসনেও ছিল না। (৪) উভয় যুগেই কৃষকের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা থাকে অপরিবর্তিত।

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলে মেজীযুগ ও প্রাক্-মেজীযুগের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতি, বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক-স্থাপন, পশ্চিমী ধাঁচে শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজের আধুনিকী-করণ, সামরিক শক্তিবৃদ্ধি, সমাজে 'এলীট' শ্রেণীর উদ্ভব—মেজীযুগের এই সকল বৈশিষ্ট্য প্রাক্-মেজী-যুগে ছিল না। মেজী সম্রাটকে শোগুন যুগের সম্রাটের মত বন্দীজীবন যাপন করতে হত না। মেজীযুগে জাতীয় জীবনে সম্রাটের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, প্রাক্-মেজীযুগে সে প্রভাব ছিল

(২৯) ভিলাক, তদেব। পৃ ৯৯

না। তাই উভয় যুগের মধ্যে পার্থক্য বোধগম্য। তিনাকের মত সমালোচনা সাপেক্ষ।

(খ) মেজী রেস্টোরেশনের প্রকৃতি ছিল রক্ষণশীল। জাপানের সর্বস্তরের মানুষের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে শোগুন-শাসনের অবসান সম্ভবপর হয়। এই শোগুন-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন ডাইমিয়ো, সামুরাই, বণিক এবং কৃষক। অথচ আন্দোলন সাফল্যের সুফল সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয় নি। নেপোলিয়ন একবার প্রশ্ন করেছিলেন—কারা ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন? প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেন—ক্ষমতালোভী বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ স্বার্থে বিপ্লব ঘটান। জাপানের ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের পটপরিবর্তন সম্পর্কেও বলা যেতে পারে যে, সাতসুমা, চোষু, টোজা ও হিজেন সামন্ত-শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ প্রশাসনিক ক্ষমতালাভের আশায় শোগুন-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন এবং আন্দোলনের সাফল্যের পর সুযোগ-সুবিধার সিংহভাগ নিজেরাই গ্রহণ করেন। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকশ্রেণী যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়।

মেজী রেস্টোরেশনের রক্ষণশীলতার অপর একটি লক্ষণ, রেস্টোরেশনের ফলে জাপানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সাত-চো-তো-হি সরকার প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ সমর্থন করেন নি। সাতসুমা প্রভৃতি সামন্তগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যেই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমিত করেন। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় অলিগার্কি। রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট বা তুরস্কের সুলতান মাহমুদের মত মেজী সম্রাট দেশের আধুনিকীকরণে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তাঁর প্রদত্ত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের সংবিধানটি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেনি, প্রতিষ্ঠিত করেছিল অলিগার্কি অর্থাৎ সম্রাট কর্তৃক মনোনীত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদ্বারা দেশ শাসনের ব্যবস্থা।

(গ) মেজীযুগের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের মধ্যেও কি জাপানী জাতি স্বকীয় ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল?

মেজীযুগের জাপানী জাতি পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানে দীক্ষা গ্রহণ করে কিন্তু প্রাচ্য জগতের নীতিবোধ পরিত্যাগ করে নি, জাতীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে শিন্টোধর্ম, খৃষ্টধর্ম নয়। মেজী জাপান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বাহ্য অংশটুকু মাত্র গ্রহণ করে, স্বকীয় অর্থাৎ ঐতিহ্যগত সভ্যতাই বজায় থাকে জাপানী সভ্যতার আসল পরিচিতি হিসাবে। জাপানী সভ্যতার বাহ্য আবরণে পশ্চিমী ছাপ পড়লেও অন্তরের আবরণ থেকে যায় ঐতিহ্যমণ্ডিত। প্রয়োজন বশে জাপানী জাতি দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক অবস্থা যাতে উন্নতমানের হয় সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমের দ্বারস্থ হতে দ্বিধাবোধ করেনি, কিন্তু তজ্জন্য স্বকীয় ঐতিহ্য বিসর্জন দেয় নি। মূলতঃ মেজীযুগের জাপানীরা ছিলেন প্রয়োগবাদে

বিশ্বাসী (প্রাগম্যাটিক), বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্যতার উপকারিতা নির্ণয় করার নীতিতে বিশ্বাসী। ফলতঃ তাঁরা আস্থাবান ছিলেন উপযোগবাদে। পশ্চিমী সভ্যতায় যা জনহিতকর, শুধু তাই গ্রহণযোগ্য—ইহাই ছিল জাপানী জাতির নীতি। শুধুমাত্র বাহ্য চাকচিক্যে অন্ধভাবে মুগ্ধ হয়ে মেজীযুগের জাপানীরা পশ্চিমের নিকট আত্মবিক্রয় করে নি। জাপানী নেতৃবৃন্দ জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) এবং মিলের (John Stuart Mill) উপযোগবাদ আগ্রহের সঙ্গে অনুশীলন করেন। জাপানী চিন্তাধারা ক্রমশঃ বৈষয়িক হয়ে ওঠে, জাপানী চিন্তার অন্দরমহলে সেকিউল্যারিজম-এর অনুপ্রবেশ ঘটে। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বৈষয়িক প্রয়োজনে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ-এই উভয়ের সংমিশ্রণ মেজীচিন্তাধারাকে রূপদান করে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, মেজী জাপানের উপর গোড়ামি বা ঐতিহ্যবাদ (Zealotism) তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা (Herodianism)—এই দুই-ই প্রভাব বিস্তার করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব কিন্তু জাপানীকে তার ব্যবহারিক জীবনযাত্রা থেকে বিচ্যুত করেনি।

(ঘ) মেজী রেস্টোরেশনের ফলে জাপানে যে পরিবর্তন আসে তা কি বিপ্লবাত্মক ছিল ?

জাপানী নেতৃবৃন্দ জাপানী সমাজকে পাশ্চাত্য ধাঁচে সজ্জিত করবার নীতি গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে অর্থনীতিতে শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বল্পকালের মধ্যে জাপানের সমাজ সবিশেষ পরিবর্তিত হয় এবং জাপানের অর্থনীতিরও রূপান্তর ঘটে। ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে এই পরিবর্তন ও রূপান্তরকে বিপ্লবাত্মক আখ্যা দিলে অসঙ্গত হয় না। কিন্তু মেজী জাপানে কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেনি, যেমনটি ঘটেছিল চীনদেশে ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে বা রাশিয়ায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। মেজী সংবিধান জনগণের হস্তে শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করে নি। ফরাসী দার্শনিক Bodin-এর মতে কোন দেশে কোন পরিবর্তনের ফলে যদি সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান (location of sovereignty) অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ যদি রাজনৈতিক পরিবর্তন না আসে তাহলে সে পরিবর্তনকে বিপ্লবাত্মক আখ্যা দেওয়া যায় না। সমাজে বা অর্থনীতিতে যতই আমূল পরিবর্তন সাধিত হোক না কেন, যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত না হয়—যেমন রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে বা অলিগার্কিতে হস্তান্তরকরণ—তাহলে সে পরিবর্তনকে বিপ্লবাত্মক বলা চলে না, ইহাই Bodin-এর সুচিন্তিত মতবাদ। প্রাক্-১৮৬৮ যুগে জাপানে প্রশাসনিক কাঠামো ছিল রাজতন্ত্র বা প্রচ্ছন্ন অলিগার্কি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পরও রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয় নি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মেজী পরিবর্তনকে প্রকৃতপক্ষে রিভোলিউশান বলা চলে না, বরং বলা যেতে

পারে রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতার স্বপক্ষে একটি প্রতিবিপ্লব।

(ঙ) মেজীযুগের বৈশিষ্ট্যগত সর্বশেষ আলোচনার জিজ্ঞাস্য—মেজী জাপান কি পাশ্চাত্য সভ্যতা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেছিল ?

মেজী জাপান অন্ধবৎ পাশ্চাত্য জীবনধারা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে নি। প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে জাপানী জাতি পশ্চিমী জীবনধারা গ্রহণ করে, পশ্চিমী সভ্যতার কিছু অংশ বাদ দিয়ে প্রয়োজনানুসারে কিছু অংশ গ্রহণ করে। খৃষ্টধর্মের পরিবর্তে শিণ্টোধর্ম জাতীয় ধর্ম হিসাবে গৃহীত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান গ্রহণ করলেও জাপান পাশ্চাত্য নীতিবোধ (এথিকস) পরিহার করে। মেজী সংবিধানের বাহ্য-কাঠামো সংসদীয় ধাঁচে পরিকল্পিত হলেও সম্পূর্ণভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কারণ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জাপানী জাতির সংসদীয় গণতন্ত্রের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। গোড়ার দিকে রাজনৈতিক দল-ভিত্তিক সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের স্বার্থ-সহায়ক শিক্ষাদান করা। দেহের আচ্ছাদন পশ্চিমী ধাঁচের হলেও মন ছিল ঐতিহ্যগত। পশ্চিমী ধাঁচের জাতীয়তাবাদ মেজী জাপানে ছিল অচল। তখন জাতীয়বাদের অর্থ ছিল ঐতিহ্যের পূজা এবং রাষ্ট্র তথা সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের বিকাশ। ফলতঃ মেজী জাপান পাশ্চত্য সভ্যতা গ্রহণে ছিল Selective অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে কিছু পরিহার ক'রে, কিছু গ্রহণ করে।

চতুর্থ অধ্যায়

মেজী জাপানের বৈদেশিক নীতি (১৮৯৪—১৯০৫)

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪—৯৫) এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া, ইঙ্গ-জাপান চুক্তি (১৯০২), রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪—৫)।

শোগুন যুগের রুদ্ধদ্বার নীতি পরিহার ক'রে মেজী জাপান আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সেই সঙ্গে কোরিয়ার তোরণ দিয়ে এশিয়ার ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রণী হয়। তাই মেজী জাপানের বৈদেশিক নীতির দুটি উদ্দেশ্য—অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সাম্রাজ্যবাদিতা।

একদা মার্কিন জেনারেল ম্যাক্ আর্থারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জোসেফ এম ডজ জাপানের তিনটি সমস্যার উল্লেখ করেন—অত্যধিক জনসংখ্যা, অত্যল্প আবাদী জমি এবং স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদের সংস্থান। জাপানের জনসংখ্যা ছিল ক্রমঃবর্ধমান। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাপানের জনসংখ্যার সর্বপ্রথম মোটামুটি হিসাব (estimate) করা হয়। তখন জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৩ মিলিয়ন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জাপানে সর্বপ্রথম সেনসাস্ গৃহীত হয়। তখন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫৬ মিলিয়ন। অর্থাৎ ১৮৭২ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৮ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৩ মিলিয়ন। দেখা যাচ্ছে গড়ে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ½ মিলিয়ন। এই অনুপাতে ১৮৭২ থেকে মেজীযুগের শেষ বৎসর ১৯১২ পর্যন্ত—৪০ বৎসরে জনসংখ্যা অন্ততঃ ২০ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে মোট দাঁড়িয়ে থাকবে ৫২·৫৩ মিলিয়ন। মেজীযুগে জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা অধিকতর ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাপানে জন্মহার ছিল এক হাজারে মাত্র ১৭ ; কিন্তু ১৯২০ ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মহার দাঁড়ায় এক হাজারে যথাক্রমে ৩৬.২ এবং ৩২.৩৫। মেজীযুগে স্বাস্থ্যরক্ষার বিজ্ঞানের ব্যবস্থা এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পায়। যে যুগে জাপানের জনসংখ্যা ছিল ক্রমঃবর্ধমান সেই যুগে মাত্র ১৫ শতাংশ জমি আবাদের উপযুক্ত ছিল। ফলে দেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রয়োজনমত শস্যোৎপাদন সম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

আবার, মেজী সরকার জাপানের অর্থনীতি শিল্প-ভিত্তিক করে অথচ

গোড়ার দিকে মেজী জাপানে শিল্পোন্নতির উপযোগী প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব ছিল। যেমন, তৎকালীন জাপানে কয়লা, লোহ, বক্সাইট, ফসফেট রক, পোটাসিক সল্ট অমিল ছিল। শিল্পে ব্যবহার-যোগ্য ৩৩ প্রকারের ধাতব খনিজ-দ্রব্যের (Metallic minerals) মধ্যে জাপানের অধিকারে ছিল মাত্র ৬ প্রকার। অবশিষ্ট ছিল আমদানি সাপেক্ষ। এতদ্ব্যতীত জাপানকে আমদানি করতে হত ৯৫ শতাংশ পেট্রোলিয়াম-জাত দ্রব্য, ৭৮ শতাংশ লবণ এবং ২০ শতাংশ খাদ্যদ্রব্য। কাজেই ইহা অনুমেয় যে, জাপানের নিকট বিদেশী বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কত প্রয়োজনীয় ছিল। এই প্রয়োজনীয়তা জাপানের বৈদেশিক নীতিকে রূপদান করে।

আবার, শোগুন-শাসনকালে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি স্ব স্ব স্বার্থে জাপানের সঙ্গে কতকগুলি বৈষম্যমূলক চুক্তি সম্পাদিত করেন। মেজী সরকার সেইসব চুক্তি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে ইয়াকুরা টোমোমির Iwakura Tomomi, ১৮২৫—৮০) নেতৃত্বে একটি মিশন প্রেরণ করেন। কিডো, ওকুবো ও ইটো সমেত এই মিশনের সভ্যসংখ্যা ছিল ৪৮। সহযাত্রী হন ৫৪ জন ছাত্র, যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমে থাকাকালীন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান আহরণ করা। মিশনটি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে যাত্রা ক'রে প্রথমে উপস্থিত হয় আমেরিকায় এবং পরে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এবং শেষে বিফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। বৈষম্যমূলক চুক্তিগুলি ছিল জাপানের নিকট হীনতার প্রতীকস্বরূপ। কাজেই পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ চুক্তিগুলি পরিবর্তন করতে অস্বীকৃত হওয়ায় মিশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, জাপানের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। জাপানী মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা হল জাপানকে আশু পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মত শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। অন্যথায় জাপানের অস্তিত্ব হবে বিপন্ন। তাই মেজী সরকারের সিদ্ধান্ত হয় এক বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা। এই নীতি অনুসরণে জাপান ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে চীন-অধিকৃত ফরমোজা দ্বীপ আক্রমণ করে, যার ফলে লুচু দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধিকারে আসে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বনিন দ্বীপপুঞ্জও জাপান অধিকার করে। সমকালে জাপান কোরিয়ার উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হয়। ফলে শুরু হয় চীন-জাপান দ্বন্দ্ব।

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪—৯৫)

এক বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতির অনুসরণে জাপান যখন এশিয়ার ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে তখন চীনের সঙ্গে জাপানের সংঘর্ষ

হয়ে ওঠে অনিবার্য। এই সংঘর্ষের কেন্দ্র কোরিয়া। ভারতবর্ষে লর্ড হেস্টিংস্‌-এর শাসনকালে (১৮১৩—২৩) যেমন পিণ্ডারি-দমন তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে (১৮১৭—১৮) পর্যবসিত হয়, সেইরূপ জাপানের কোরিয়া-দমন প্রচেষ্টা পরিণতি লাভ করে চীন-জাপান যুদ্ধে।

প্রতিবেশী কোরিয়া রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক কারণেই জাপানকে কোরিয়া সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ক'রে তোলে। কোরিয়ার উত্তরে মাঞ্চুরিয়া। ইয়ালু নদী দ্বারা কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। জাপানের ক্ষমতা কোরিয়াতে সম্প্রসারিত হলে জাপানের পক্ষে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করা সহজসাধ্য হবে, এমন কি চীনের রাজধানী পেকিং ও জাপানের আয়ত্তাধীন হবে। এতদ্ব্যতীত কোরিয়া একটি ব্যবসায়-কেন্দ্র। জাপানের পক্ষে সহজেই কোরিয়া থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় চাউল আমদানি করা সম্ভব হবে। অতএব কোরিয়া অধিকার করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু কোরিয়ার উপর চীনের প্রাধান্য। তাই জাপান সংকল্প গ্রহণ করে, চীনকে কোরিয়া থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। কোরিয়ার সঙ্গে চীনের সম্পর্ক দীর্ঘকালের, ভিনাকের মতে, বারশত বৎসরেরও অধিককাল। চীন কোরিয়াকে করদ রাজ্য হিসাবে গণ্য করত, কিন্তু কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না। চীনের সঙ্গে কোন পরামর্শ না ক'রে যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কোরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ফলে বিদেশী শক্তিবর্গ কোরিয়াতে ঘাঁটি স্থাপন করে। জাপানের অতি সন্নিকটস্থ প্রতিবেশী রাষ্ট্র কোরিয়াতে যদি বৈদেশিক শক্তিগুলি, বিশেষতঃ রাশিয়া, ঘাঁটি স্থাপন করে তাহলে জাপানের সমূহ বিপদ। কোরিয়ার উত্তর সীমায় রাশিয়ার ভ্লাডিভস্টক বন্দর অবস্থিত। কাজেই রাশিয়ার চক্ষে কোরিয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। জাপান কোরিয়া আক্রমণ করলে রাশিয়ার পক্ষে বাধাদান করা খুবই স্বাভাবিক। বিদেশী শক্তির কবলস্থিত কোরিয়া জাপানের চক্ষে প্রতীয়মান হত তার বক্ষবিদ্ধ একটি ছোরার মত। তাই চীনের নিকট জাপানের প্রস্তাব ছিল, চীন যেন কোরিয়াকে বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে সেখানে প্রশাসনিক সংস্কার কার্য সাধিত করে, অন্যথায় কোরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দান করে। কিন্তু চীন সরকার জাপানের এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করেনি। তখন জাপান কোরিয়াকে চীন তথা পাশ্চাত্যশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে সেখানে স্বীয় রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়। চীনও কোরিয়াতে জাপানের অগ্রগতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে, যাতে সময়মত সে অগ্রগতিতে বাধাদান করতে পারে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে একটি জাপানীদল কোরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের সম্ভাবনা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কোরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিরত থাকে। তখন চীন সরকারের প্ররোচনায় সেই জাপানীদলের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। এর

প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জাপান সরকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমোডোর পেরীর অনুকরণে কোরিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে মনস্থির করে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোরিয়া সম্পর্কে জাপানের প্রথম পদক্ষেপ হয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জাপান কোরিয়ার সঙ্গে একটা বাণিজ্যিক ও মৈত্রীমূলক চুক্তি (Treaty of Amity and Commerce) স্বাক্ষরিত করে। এই চুক্তিতে জাপান কোরিয়াকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করে। এতদ্ব্যতীত কোরিয়া জাপানের নিকট তিনটি বন্দর উন্মুক্ত করে, যথা পুশান বা ফুসান (Pusan বা Fusan), ইনচন বা চেমুলপো (Inchon বা Chemulpo) এবং ওনসান (Wonsan)। এই সন্ধির প্রতিবাদে চীনের বিদেশ মন্ত্রণালয় (Tsungli Yamen) প্রকাশ্যভাবে কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য না করলেও চুক্তিটির গুরুত্ব হ্রাসের উদ্দেশ্যে কোরিয়া সরকারকে কোরিয়া-নিশ্চিত বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি সম্পাদিত করতে পরামর্শ দেয়। ফলে আমেরিকার নৌবিভাগের কূটনীতিজ্ঞ কমোডোর শুফেল্ট (R. W. Shufeldt) এবং চৈনিক ভাইসরয় লি হুং চ্যাঙ (Li Hung-Chang) এর যৌথ প্রচেষ্টায় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। এই চুক্তিটি টিয়েন্টসিন সন্ধিপত্র (Treaty of Tientsin) নামে পরিচিত। এই সন্ধিপত্রেও চীনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোরিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হয়। ১৮৮০ ৮৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ইংলণ্ড, জার্মানী, ইটালী, রাশিয়া এবং ফ্রান্সও কোরিয়ার সঙ্গে যে সব চুক্তি সম্পাদিত করে সেগুলিতেও কোরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হয়। এইভাবে কোরিয়াকে কেন্দ্র ক'রে চীন-জাপান সম্পর্ক ধীরে ধীরে তিক্ত হয়ে ওঠে। এমন কি কোরিয়াতে দুটি দলের অভ্যুত্থান হয়—জাপান-সমর্থিত সংস্কারপন্থীদল এবং চীন-সমর্থিত সংস্কার-বিরোধী রক্ষণশীল দল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই দুই দলের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই একটি সংঘর্ষ বাধলে চীন ও জাপান উভয়েই কোরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করে। উভয় দেশের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ শেষ অবধি নিবারিত হয় লি-ইটো কনভেনসন (Li-Ito Convention) এর মাধ্যমে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে চীনের লি হুং চ্যাঙ এবং জাপানের কাউণ্ট ইটো স্ব স্ব সরকারের পক্ষ থেকে টিয়েন্টসিনে (Tientsin) উক্ত কনভেনসনটি স্বাক্ষরিত করেন। এই কনভেনসন অনুসারে স্থির হয় যে, (১) চার মাসে মধ্যে উভয় রাষ্ট্র কোরিয়া থেকে নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী অপসারিত করবে; (২) কোরিয়া স্বাধীন থাকবে এবং জাপান ও চীন ব্যতীত অন্য যে কোনও বিদেশী শক্তির তত্ত্বাবধানে কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত হবে; (৩) যদি ভবিষ্যতে চীন বা জাপানের কোরিয়াতে সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন হয়, তাহলে এক পক্ষ অপর পক্ষকে লিখিতভাবে অগ্রিম নোটিশ না দিয়ে সৈন্য

প্রেরণ করতে পারবে না এবং যে উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরিত হবে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া মাত্র সৈন্য অপসারিত করতে হবে। অনস্বীকার্য যে উক্ত লি-ইটো কনভেনসনটি আংশিকভাবে জাপানের কূটনৈতিক সাফল্যের পরিচায়ক। জাপানের অভিপ্রায় অনুযায়ী কোরিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়, যার ফলে কোরিয়ার ব্যাপারে চীনের হস্তক্ষেপ হয় সীমিত।

লি-ইটো কনভেনসনটি অগ্রাহ্য করে চীন কিন্তু কোরিয়াকে পূর্বের মত একটি করদ রাজ্য হিসাবেই গণ্য করতে থাকে এবং লি-র উপদেশানুযায়ী কোরিয়াতে নিযুক্ত চৈনিক সরকারের প্রতিনিধি ইউয়ান শি-কাই (Yuan Shi-Kai) কোরিয়াতে চীনের প্রাধান্য জাহির করতে থাকেন। কোরিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা ডেনি (Denny) কোরিয়ার প্রতি চীনের এই কনভেনসন-বিরোধী মনোভাবের প্রতিবাদ করেন। ফলে ইউয়ান ও ডেনির মধ্যে মতবিরোধ ঘটে। প্রতিবাদস্বরূপ ডেনি পদত্যাগ করেন এই আশা পোষণ ক'রে যে চীন সরকারও ইউওয়ানকে প্রত্যাহার ক'রে নেবেন। ইউয়ান কিন্তু স্বপদে বহাল্লই থেকে যান।

এইভাবে কোরিয়াকে কেন্দ্র ক'রে চীন-জাপান কূটনৈতিক সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্ততর হতে থাকে। চীন-জাপান যুদ্ধ হয়ে ওঠে আসন্ন। দুটি মেঘই বিদ্যুৎ-ভরা। বিপর্যয় ঘটাতে শুধুমাত্র অজুহাতের অভাব।

এই অজুহাত উপস্থিত হয় যখন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে টং-হ্যাক্ (Tong-hak) নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় কোরীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কনফিউসাস প্রচারিত ধর্ম, তাও (Tao) ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের সম্মিলিত উপদেশগুলি নিয়ে টং-হ্যাক সম্প্রদায় ছিল গঠিত। কোরীয় সরকার এই ধর্মসম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেন নি, পরন্তু সম্প্রদায়ের নেতাকে বিধর্মী ও যাদুকর হিসাবে গণ্য করেন। সম্প্রদায়ের নেতার প্রতি এই মনোভাবের পরিবর্তনের জন্য তথা টং-হ্যাক ধর্মকে স্বীকৃতি দানের জন্য সম্প্রদায়টি কোরীয় সরকারের নিকট একটা আবেদন পেশ করেন, কিন্তু সে আবেদন হয় প্রত্যাখ্যাত। ফলে টং-হ্যাক সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই পরিস্থিতিতে কোরীয় সরকার চীনের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করলে চীন সরকার অন্যূন পনের শত সৈন্য কোরিয়াতে প্রেরণ করেন। কিন্তু লি-ইটো কনভেনসনের শর্তানুযায়ী কোরিয়াতে সৈন্য প্রেরণের পূর্বে চীন জাপানকে কোন লিখিত নোটিশ দেয় নাই। প্রতিবাদ স্বরূপ জাপানও অধিক সংখ্যক সৈন্য কোরিয়াতে প্রেরণ করে। লি-ইটো কনভেনসন অগ্রাহ্য ক'রে চীন কোরিয়াকে পূর্ববৎ করদ রাজ্য হিসাবে গণ্য ক'রে সেখানে সৈন্য প্রেরণ করায় জাপানে চীন-বিরোধী মনোভাব তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে স্যাংহাই-এ চীনা-পন্থী এক কোরীয় জাপানী-পন্থী কোরীয় নেতা কিম-ওক-

ক্যুন-কে (Kin-Ok-Kyun) নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারপর থেকেই জাপান উগ্রভাবে চীনা-বিরোধী হয়ে ওঠে। জাপান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। ইতিমধ্যে টং-হ্যাক বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু চীন বা জাপান কেহই নিজ নিজ সৈন্য অপসারণে আগ্রহী হয় না। কোরিয়াতে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন চীন-জাপানের সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি যুদ্ধ ত্বরান্বিত করে। যুদ্ধ শুরু হয়, যখন ১লা অগাস্ট ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে জাপান কাওসিং (Kowshing) নামে চীনের একটি অতিরিক্ত সৈন্য-বাহী জাহাজের উপর গুলী বর্ষণ করে। চীন-জাপান যুদ্ধের ইহাই পটভূমিকা।

এই পটভূমিকা চীন-জাপান যুদ্ধের কয়েকটি বিশিষ্ট কারণের উপর আলোক সম্পাত করে। প্রথমতঃ, চীনের কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, কোরিয়াকে যে-কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে স্বাধীনতা দেওয়া, এবং কোরিয়াতে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির বিনা বাধায় নীতি স্থাপন জাপান নিশ্চিন্তমনে সমর্থন করতে পারে নি। কোরিয়ার ব্যাপারে চীনের অকর্মণ্যতা এবং সেই অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের কোরিয়াতে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার জাপানকে নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ক'রে তোলে। যুদ্ধই প্রতিকারের একমাত্র উপায় জেনে জাপান শেষ অবধি যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোরিয়াতে জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল। জাপান তখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ ছিল না। অথচ তখন কোরিয়াতে কোরিয়ার অধিবাসীদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য (বিশেষতঃ জাপানীদের প্রধান খাদ্য চাউল) উৎপন্ন হত। কোরিয়াকে কুক্ষিগত করতে না পারলে সেখান থেকে খাদ্য আমদানি করা জাপানের পক্ষে সহজসাধ্য হবে না। এতদ্ব্যতীত কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে জাপানের আমদানির অন্যূন ৪০ শতাংশ আসত কোরিয়া থেকে। তাই অর্থনৈতিক কারণেও জাপানের প্রয়োজন ছিল কোরিয়ার উপর ক্ষমতা-বিস্তার করা। কিন্তু চীন বিনা যুদ্ধে জাপানের এই ক্ষমতা-বিস্তার সমর্থন করবে না জেনে জাপান যুদ্ধনীতি গ্রহণ করে। তৃতীয়তঃ, শোগুন-শাসন অবসানের পর মেজী সরকার সম্প্রসারণ নীতি বা এশীয়া ভূখণ্ডে রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। ইটো, ইয়ামাগাটা প্রভৃতি মেজী নেতৃবৃন্দ যোশিদা শোয়িন (Joshida Shoin) নামে এক নেতার নিকট এই সম্প্রসারণ নীতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। যোশিদা একজন প্রথম সারির সম্প্রসারণ নীতির সমর্থক ছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল শোগুন-শাসন উচ্ছেদের পর নূতন সরকার সম্রাটকে ক্ষমতায় পুনরায় অধিষ্ঠিত ক'রে এশীয় ভূখণ্ডে রাজ্যবিস্তার করবে। এশিয়ায় রাজ্যবিস্তারে জাপানের প্রথম পদক্ষেপ হবে কোরিয়া বিজয়। কিন্তু চীন বিনা যুদ্ধে কোরিয়াকে জাপানের হস্তে সমর্পন করবে না। তাই জাপানের

পক্ষে যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। চতুর্থতঃ, জাপানের সমসাময়িক রাজনীতি চীন-জাপান যুদ্ধ অনিবার্য্য করে তোলে। ১৮৬৮-৭৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সাতসুমা, চোষু, টোজা ও হিজেনের নেতৃবর্গ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে দেশশাসনে ব্যাপৃত হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে টোজা ও হিজেন কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে সরকারকে পরামর্শ দেয়, কিন্তু অপর দুই সরিক সে পরামর্শ অনুমোদন করে না। তখন টোজা ও হিজেনের নেতৃবৃন্দ প্রশাসন থেকে পদত্যাগ করেন, যার ফলে সাতসুমা ও চোষুর উপর প্রশাসন-ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হয়। ইহার পর ১৮৭৩—৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সতের বৎসর দুই বিরোধী সরিকদলের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে জাপানের রাজনীতিতে বিশৃংখলার উদ্ভব হয়। সাতসুমা ও চোষু আমলাতন্ত্রের সমর্থক হিসাবে প্রশাসনিক সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সচেষ্ট হয়। অপর দিকে টোজা ও হিজেন রাজনৈতিক দল গঠন ক'রে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মেজী জাপানে সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে বিপক্ষ দল সর্বাধিক ভোট পেয়ে জয়লাভ করে, কিন্তু সরকার গঠনের সুযোগ পায় না। মেজী সংবিধান অনুসারে নির্বাচনের ফল অনুযায়ী কোন দলের সরকার গঠনের অধিকার ছিল না। স্বয়ং সম্রাট মন্ত্রীসভা নিয়োগ করতেন এবং সংখ্যালঘু দলভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সম্রাট-মনোনীত মন্ত্রীসভা সরকার গঠন করত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পর সেইকারণে সংখ্যালঘু দল সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হওয়ায় সরকার গঠন করে। ঐ বৎসরেই স্বাভাবিক কারণে ডায়েটের সর্বপ্রথম অধিবেশন হয়। অধিবেশন চলাকালীন সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপক্ষ দল ইনটারপিলেশন-এর ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে মন্ত্রীমণ্ডলীকে বিপর্য্যস্ত করতে সচেষ্ট হয়। মেজী সংবিধানে বাক্-স্বাধীনতার সুযোগ থাকায় বিপক্ষ দলের পক্ষে মন্ত্রীমণ্ডলীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা সম্ভবপর হয়। প্রথম মিনিষ্টার-প্রেসিডেণ্ট (প্রধানমন্ত্রী) ইয়ামাগাটা ক্রুদ্ধ ডায়েটের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পদত্যাগে করেন। তাঁর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ইটোর পক্ষেও শান্ত পরিবেশে ডায়েটের কার্য নির্বাহ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন ডায়েটের আক্রমণ থেকে সরকারকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ইটো এক চতুর নীতি অবলম্বন করেন। এই নীতি যুদ্ধনীতি। ইটোর দূরাভিষন্ধি অনুযায়ী চীন-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হলে ডায়েট সরকারকে আক্রমণ করার কার্যক্রম পরিত্যাগ ক'রে চীনের বিরুদ্ধে সরকারকে সমর্থন করতে ব্যগ্র হয়, যাতে চীন পরাভূত হয়। জাপানী জাতি দেশ-প্রেমিক। দেশ-প্রেমিক জাতির পক্ষে দেশের দুর্দিনে সরকারকে সাহায্য করাই স্বাভাবিক। এই কারণে ইটো শেষ অবধি যুদ্ধনীতি গ্রহণ করেন। মোটা কথা, জাপানের রাজনৈতিক অবস্থা, কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের দীর্ঘ-

কালের স্বার্থ-বিজড়িত সম্পর্ক, কোরিয়ায় বৈদেশিক শক্তিবর্গের ঘাঁটি স্থাপন, কোরিয়ার তোরণ দিয়ে এশীয় ভূখণ্ডে জাপানের সম্প্রসারণ নীতি, কোরিয়ার খনিজ সম্পদ ও ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার অধিকারে জাপানের ব্যগ্রতা—এই সব কারণে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।[১]

শিমোনোসেকি সন্ধি (১৯৮৫): ১৮৯৫

যুদ্ধে পরাজিত চীন জাপানের সঙ্গে শিমোনোসেকির (Shimonoseki) সন্ধি স্বাক্ষরিত করে (১৮৯৫, ১৭ই এপ্রিল)। সন্ধির শর্তানুসারে (১) চীন কোরিয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় স্বীকৃতি দান করে; (২) চীন জাপানকে লিয়াওটাং (Liaotung, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া) উপদ্বীপ, ফরমোজা ও পেসকাডোরিস (Pescadores) দ্বীপপুঞ্জ সমর্পণ করে; (৩) জাপানকে চীনদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়; (৪) সেই উদ্দেশ্যে চারটি চৈনিক বন্দর, জাপানী বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয়, যথা শাসি (Shasi), চুংকিং (Chungking), হ্যাংচাও (Hangchow) এবং সুচাও (Soochow); (৫) পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ জাপানের শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে শোগুন যুগে সম্পাদিত বৈষম্যমূলক চুক্তিগুলির সর্তাদি রদবদল করতে সম্মত হন; (৬) জাপানে বিদেশী শক্তিসমূহ এতকাল অতিরাষ্ট্রিক অধিকার ভোগ করে আসছিলেন। এই অধিকারের ভিত্তিতে তাঁরা জাপানের আইনাধীন না হয়ে স্বদেশীয় আইনানুসারে বিচারের সুযোগ ভোগ করতেন। এখন অতিরাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধার অবলুপ্তি ঘটে; (৭) আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের উপর দেশের স্বার্থে শুল্ক নিয়ন্ত্রণের নিরঙ্কুশ অধিকার জাপান ফিরে পায়; (৮) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ চীন জাপানকে দুইশত মিলিয়ন টেল (tael) বা প্রায় একশত পঁচাত্তর মিলিয়ন ডলার দিতে প্রতিশ্রুত হয়। এই ক্ষতিপূরণ অনাদায় পর্যন্ত উইহাইউই (Weihaiwei) অঞ্চলটি জাপানের অধিকারে থাকবে, স্থির হয়।

চীনের উপর শিমোনোসেকি সন্ধির প্রতিক্রিয়া:

চীন-জাপান যুদ্ধ একদিকে যেমন জাপানের নব অর্জিত শক্তির পরিচয় দেয়, অন্যদিকে তেমনি চীনের দুর্বলতা উদঘাটিত করে।

---

(১) The Sino-Japanese wer was caused by the condition of Japanese polities, coupled with the centuries-old interest of Japan in Korea as the gateway to continental expansion, supplemented by a national fear lest Korea should come under the control of some strong foreign power, and by a budding interest in control of the resources of the peninsula and in Korea as a market. ভিনাক, তদেব। পৃ ১৪০-৪১ দ্রষ্টব্য।

আয়তনে চীনের অনুপাতে জাপান অতি ক্ষুদ্র দেশ। চীন যদি হয় দৈত্যের মত বিশাল, জাপান সে তুলনায় বামনের মত খর্ব। অথচ এই বামনের হস্তেই দৈত্যের শোচনীয় পরাজয়। এই পরাজয় চীনের উপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আত্মমর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে চীন যেন মগ্ন হয় আত্মজিজ্ঞাসায়। জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতায় দীক্ষিত হয়ে মধ্যযুগীয় দুর্বলতা জয় করে এবং আধুনিক যুগোপযোগী শক্তি সঞ্চয়ে সমর্থ হয়। জাপানের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে, চীনের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব হতে পারে। চীনের চিন্তানায়কদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে চীনে আন্দোলন শুরু হয়। মূলতঃ জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় চীনে সংস্কার আন্দোলন অপরিহার্য ক'রে তোলে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের কাং ইউ উই (Kang yu wei), লিয়াং চি চাও (Liang Chi Chao) এবং চীন সম্রাট কুয়াং সু (Kuang hsu)-র যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত সংস্কার আন্দোলন, যা হানড্রেড ডেজ (Hundred Days, ১১ই জুন—২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) নামে অভিহিত।

চীন-জাপান যুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া :

জাপানের অভাবনীয় সাফল্যে পাশ্চাত্য দেশগুলি জাপানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ আতঙ্কিত হয়। এই আতঙ্ক Yellow Peril বা পীতাতঙ্ক নামে অভিহিত। জাপানকে এশিয়া ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখে পাশ্চাত্য দেশগুলিও চীনে শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগে সন্তুষ্ট না থেকে প্রভাবাধীন এলাকা (Sphere of influence) গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত হয়। ফলে চীন পরিণত হয় পাশ্চাত্য-শক্তিবর্গের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভূমিতে। ফলতঃ এখন থেকে সুদূর প্রাচ্যের ইতিহাসের ধারায় কয়েকটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় হয়, যথা ইউরোপীয় আক্রমণ, ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাশিয়ার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জাপানের সাম্রাজ্যবাদিতা, চীনের বিদ্রোহ, এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ক্রমশঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থলে সহযোগিতার প্রবর্তন।

জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মধ্যে রাশিয়া সর্বাপেক্ষা ঈর্ষান্বিত হয়। চীনের মিত্ররাষ্ট্ররূপে রাশিয়া শিমোনোসেকি সন্ধিটি বাতিল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। লিয়াওটাং উপদ্বীপ জাপানের অধীন হয়ে থাকলে জাপান কালক্রমে সমগ্র চীনের উপর আধিপত্য বিস্তারে সুযোগ পাবে। রাশিয়া জাপানকে সে সুবর্ণ সুযোগ না দিতে বদ্ধপরিকর হয়। তাই সেন্টপিটার্সবুর্গ থেকে রুশ সরকার জাপান সরকারের নিকট একটি নোট প্রেরণ করে, এই মর্মে

যে (১) জাপান যেন লিয়াওটাং উপদ্বীপটি চিরকালের মত স্থায়ী অধিকারে না রাখে, কারণ এরূপ অধিকারের ফলে সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে ; (২) লিয়াওটাং উপদ্বীপটি চীনের রাজধানী পেকিং-এর সন্নিকটস্থ হওয়ায় যদি চীন সরকার ব্যতীত অন্য কোন সরকারের শাসনাধীন হয় তাহলে উদ্ভূত পরিস্থিতি চীনের পক্ষে এক ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি করবে; (৩) লিয়াওটাং উপদ্বীপ জাপানের হস্তগত থাকলে কোরিয়ার স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে। রাশিয়া এই নোটটি প্রেরণ করে জার্মানী ও ফ্রান্সের সহযোগিতায়। সুদূর প্রাচ্যে সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় জার্মানী ও ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করে। ফলে সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতিতে সহযোগী এই তিনটি দেশ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ভূমিকা গ্রহণ ত্রিশক্তির হস্তক্ষেপ (Tripartite Intervention) নামে খ্যাত। এই ত্রিশক্তির নিকট জাপানকে শেষ পর্যন্ত নীতি স্বীকার করতে হয়। যৎকিঞ্চিৎ আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ তথা পোর্ট আর্থার বন্দর চীনকে প্রত্যার্পণ করতে বাধ্য হয়। এই প্রত্যার্পণের পশ্চাতে রাশিয়ার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাপানের ইহা অবিদিত ছিল না। ফলে জাপানের মনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ জন্মে। এর পরিণতি রুশো-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫)। সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধিতে ইংলণ্ড আতঙ্কিত হয়। ফলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও জাপানের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহাই ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী নামে খ্যাত।

কনসেসনের দ্বন্দ্ব :

রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানী চীনের পক্ষ অবলম্বন ক'রে জাপানকে বাধ্য করে চীনকে লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার বন্দর প্রত্যার্পণ করতে। ত্রি-শক্তি নিঃস্বার্থে চীনকে সমর্থন করে নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তিনটি চীন দেশে কনসেশনের দ্বন্দ্ব শুরু করে অর্থাৎ তারা চীনকে আফ্রিকার মত ব্যবচ্ছেদ ক'রে চীনের বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দাবি করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়া লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার বন্দরের উপর ২৫ বৎসরের ইজারা আদায় করে। বন্দরটির সংস্কার সাধন ক'রে রাশিয়া সেখানে একটি বিরাট নৌবহর মোতায়েন করে। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া ট্রান্স সাইবেরিয়া রেলপথটি উত্তর মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে ভ্লাডিভস্টক বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত করবার অধিকার পায় এবং হারবিন থেকে পোর্ট আর্থার বন্দর পর্যন্ত উক্ত রেলপথটির একটি শাখা রেলপথ নির্মাণের ও অধিকার লাভ করে। এই রেলপথ দুটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাশিয়া

নিজ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার অধিকার পায়। ফলে মাঞ্চুরিয়ার উপর রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়। তৃতীয়তঃ, রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার খনিজ ও অরণ্য-সম্পদের উপর বিস্তৃত অধিকার লাভ করে।

কনসেশনের দ্বন্দ্বে ফ্রান্সও যথেষ্ট লাভবান হয়। ফ্রান্সের স্বার্থে চীন এবং টনকিনের মধ্যে সীমারেখা নূতনভাবে নির্ধারিত হয়। ইউনান (Yunan), কোয়াংশি (Kwangsi) এবং কোয়াংটুং (Kwangtung) অঞ্চলসমূহে ফ্রান্স খনিজ অধিকার পায়। এতদ্ব্যতীত আনাম রেলপথ (Annam Railway) চীনের অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়। চীনের কয়েকটি বন্দরও বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য ফ্রান্সের বণিকদের নিকট উন্মুক্ত করা হয়। জার্মাণী শানটুং (Shantung) প্রদেশের কিয়াও-চাও (Kiau-Chau) বন্দরের উপর ৯৯ বৎসরের ইজারা লাভ করে। ফলে কার্যতঃ সমগ্র শানটুং প্রদেশটি জার্মানীর প্রভাবাধীন হয়। এইভাবে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত চীনের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার নীতি কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চীনে এইরূপ কনসেশনের দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হয় তিনটি পরিস্থিতি, যথা চীনসম্পর্কে মুক্তদ্বার নীতি, বক্সার বিদ্রোহ এবং ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী (১৯০২)।

মুক্ত-দ্বার নীতি (Open Door policy)

যখন রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মাণী চীনে কনসেশনের দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে, তখন আমেরিকা সে দ্বন্দ্বের সরিক হয় নি। মূলতঃ চীনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছিল সাম্রাজ্য-গঠন নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন। অহিফেন যুদ্ধের (Opium war, ১৮৪১-৪২) পর থেকে আমেরিকা চীনের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, যেমন অতিরাষ্ট্রিক ক্ষমতা, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক আদায়ের অধিকার, চীন-স্থিত অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার লাভ (Most-favoured-nation right)। ফ্রান্স, জার্মানী ও রাশিয়া যখন চীনে স্ব স্ব প্রভাবাধীন এলাকা গড়ে তুলতে ব্যস্ত থাকে, তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে প্রমাদ গণে। অদূর ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনায় যুক্তরাষ্ট্র দুশ্চিন্তান্বিত হয়। চীন বিভাজনের ফলে ফরাসী শক্তি কোয়াংশি অঞ্চলে, ইংলণ্ড ইয়াংসি অববাহিকায়, রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় এবং জাপান ফুকিয়েন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে। যদি এই সব রাষ্ট্র স্ব স্ব প্রভাবাধীন এলাকায়

আমদানি রপ্তানির উপর উচ্চহারের শুল্ক আরোপ করে তাহলে চীনের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থ বিপন্ন হবে। এই আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আমেরিকা ইউরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি চায় যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে চীনের বন্দরগুলি সকল রাষ্ট্রের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। এই প্রতিশ্রুতি 'মুক্তদ্বার নীতি' নামে পরিচিত। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যাতে উক্ত প্রতিশ্রুতিতে সম্মতি দান করে সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্র সচিব জন হে (John Hay) কতকগুলি প্রস্তাব-সম্বলিত একটি নোট প্রেরণ করেন বিভিন্ন রাজধানীতে, যথা লণ্ডন, বার্লিন, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, টোকিও, রোম ও প্যারিস। নোটে লিখিত প্রস্তাবগুলি ছিল: (১) সন্ধিসূত্রে উন্মুক্ত বন্দরগুলির (Treaty ports) শাসনব্যাপারে অপর কোন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবেন না; (২) এই সব বন্দরে আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র চীন সরকারকে বাধাদান করবেন না; (৩) স্ব স্ব স্বার্থে কোন রাষ্ট্রই বন্দরে বৈষম্যমূলক শুল্ক অথবা রেলপথে বৈষম্যমূলক পরিবহন মূল্য দাবী করবেন না; জন হে-র মূল প্রস্তাব ছিল, চীনে বিদেশী শক্তিসমূহের প্রভাবাধীন এলাকাগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সকল রাষ্ট্রের নিকট উন্মুক্ত থাকবে এবং কোন রাষ্ট্রই বাণিজ্যিক ব্যাপারে কোন বৈষম্যমূলক সুযোগ-সুবিধা আদায় করবেন না।

সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি জন হে-র প্রস্তাবগুলিতে সম্মতিদান করেন শর্তানুসারে অর্থাৎ একের সম্মতি নির্ভর করবে অপরের সম্মতিদানের উপর। একমাত্র রাশিয়া প্রথমতঃ কোন উত্তর দানে বিরত থাকে। পরে প্রদত্ত উত্তরে রাশিয়া মূল বিষয়টি চাতুর্যের সঙ্গে এড়িয়ে যায়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বক্সার-বিদ্রোহ শুরু হলে হে পুনরায় উক্ত বৎসর পূর্ববৎ অপর একটি নোট বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে প্রেরণ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের নোটে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সন্নিবেশিত ছিল: (১) চীনে স্থায়িভাবে নিরপত্তা বিধানের ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমাধান করতে হবে; (২) চীনের রাষ্ট্রীয় তথা প্রশাসনিক অখণ্ডতা বজায় রাখতে হবে; (৩) চীনে বন্ধুরাষ্ট্রগুলি সন্ধি ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে যে-সমস্ত অধিকার অর্জন করেছেন সেগুলি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে; (৪) চীন সাম্রাজ্যের যে-কোন অংশের সঙ্গে পৃথিবীর যে-কোন রাষ্ট্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সমান, বৈষম্যবিহীন অধিকার ভোগ করবেন।

নীতির দিক থেকে দ্বিতীয় নোটটি প্রথম নোটটি অপেক্ষা ছিল ব্যাপকতর। প্রথম নোটে যুক্তরাষ্ট্র মূলতঃ চীনের সঙ্গে ব্যবসায়ে বৈষম্যহীন শুল্কনীতির প্রস্তাব করেন কিন্তু দ্বিতীয় নোটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ছিল যে চীনের যে-কোন অংশের সঙ্গে সকল রাষ্ট্রের সমান বাণিজ্যিক অধিকার থাকবে।

বক্সার বিদ্রোহ :

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর যখন রাশিয়া প্রভৃতি বিদেশী শক্তিবর্গ চীনে প্রভাবাধীন এলাকা গঠনে তৎপর হয় এবং ফলে চীন যখন দ্বিতীয় আফ্রিকায় পরিণত-প্রায় হয় তখন বিদেশীদের বিতাড়নের জন্য চীনে বক্সার নামে একটি গুপ্ত-সমিতি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে একটি আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন ছিল একাধারে চীনে বৈদেশিক-শক্তি-বিরোধী তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবর্তন-বিরোধী। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে নজির পাওয়া যায় যে, যখন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে গণআন্দোলন পরিচালনা সম্ভব হয় না তখন সেই আন্দোলন শাসক-গোষ্ঠীর চক্ষুর অন্তরালে গোপন পথে পরিচালিত হয়, গুপ্ত-সমিতির মাধ্যমে। এরূপ গুপ্ত-সমিতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইটালীর কারবোনারি সমিতি, গ্রীসের হিতাইরিকা ফিলিকে, জার্মানীর টুজেন্ডবুন্ড, পোল্যান্ডের ফিলোমাথিয়ান, কোনিয়ার মাউ মাউ, চীনে ডক্টর সান ইয়াৎ সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিং-চুং হুই ইত্যাদি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বক্সার নামক গুপ্তসমিতি চীনদেশে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদিতা ও পাশ্চাত্য-সভ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।

বক্সার সমিতির মূল নাম আই-হো-চুয়ান (I-ho chuan) বা মুষ্টি-যোদ্ধাদের ন্যায়ভিত্তিক ভ্রাতৃসংঘ (Righteous fraternity of Fist-fighters)। আই-হো অর্থে ন্যায়পরায়ণতা এবং চুয়ান অর্থে মুষ্টিযুদ্ধ। এই সমিতির সভ্যেরা দেহ ও মনের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য মুষ্টিযুদ্ধ (boxing) অনুশীলন করতেন। অধিকন্তু তাঁরা জাদুকরী বিদ্যাও আয়ত্ত করতেন এবং একপ্রকার ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। প্রয়োজনীয় কোনও মন্ত্র তাঁরা তিনবার উচ্চারণ করতেন, মুখে ফেনা ওঠাতেন এবং দাঁত দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে শ্বাসগ্রহণ এবং ত্যাগ করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, এসব প্রক্রিয়ার ফলে তাঁদের মধ্যে এক অতিপ্রাকৃত শক্তি সঞ্চিত হত। ফলে তাঁরা ভাবতেন, গোলাগুলি তাঁদের দেহ ভেদ করতে পারবে না।

এহেন মুষ্টিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত বক্সার সমিতি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের পশ্চাতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিক কারণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিদেশী শক্তিবর্গ চীনের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বিঘ্নিত করে। অতএব রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার জন্য দেশকে বিদেশী শক্তির কবল থেকে মুক্ত করা আশু প্রয়োজন। সামাজিক কারণ হিসাবে বলা যায় যে, তখন চৈনিক সম্রাটের উৎসাহে এবং সহযোগিতায় চীনা সমাজকে পাশ্চাত্য ধাঁচে গড়ে তোলার এক প্রচেষ্টা চলে। বক্সার আন্দোলনের পূর্বে চীনের দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চলে Young China নামে

একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল চীনকে পাশ্চাত্য সভ্যতার দীক্ষিত করা। স্বয়ং সম্রাট কোয়াং সু (Kuang hsu) দেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি অনুশাসনও (Edict) প্রকাশ করেন। বক্সার সমিতির মতে পাশ্চাত্য ধাঁচে সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক, যেহেতু এরূপ প্রচেষ্টা চীনের সামাজিক ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করার সমতুল্য। অধিকন্তু বিদেশী শক্তির প্রভাবে দেশে দ্রুতগতিতে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হতে থাকে। তাতে চীনের জাতীয় ধর্ম বিপন্ন হয়। বক্সার সমিতির সভ্যদের এই অভিজ্ঞতা জন্মে যে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত দেশবাসীরা আচারে-আচরণে নিজেদের এক উচ্চমানের স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে গণ্য করে এবং অখৃষ্টানদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তাই খৃষ্টধর্ম প্রচার বন্ধ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেইজন্য বিদেশী বিতাড়ণ অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, বক্সার আন্দোলন শুরুর পূর্বে চীনের ব্যবসায়ের বাজারে মন্দা দেখা যায়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইয়েলো নদীর (Yellow) বন্যার ফলে শানটুং প্রদেশে খাদ্যাভাব ঘটে এবং জনগণ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। উত্তর চীনে খরার জন্য ফসলের ফলন আশাপ্রদ হয় না। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের খাদ্যের সন্ধানে নানা দুঃখকষ্ট বরণ করে বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হয়। চীনে বিদেশী তুলা-জাত দ্রব্যাদি ও বিদেশী তৈল আমদানি হওয়ায় স্থানীয় তুলা এবং তৈল ব্যবসায়ীদের ক্রয়-বিক্রয়ে মন্দার সম্মুখীন হতে হয়। আবার, নূতন রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাবে পশুবাহিত বা হস্ত-চালিত শকটের মালিকেরা তথা তরী বা বজরার মালিকেরা উপার্জন হ্রাসের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য বক্সার সমিতির সভ্যেরা চীনের উপর বিদেশী প্রভাবকেই দায়ী করে। সুতরাং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা অত্যাবশ্যক। এই বিদ্রোহে নেতৃত্বদান করেন রাজমাতা জু সি (Tzu Hsi), কিন্তু সম্রাট কোয়াং সু ছিলেন এই বিদ্রোহের বিরোধী।

আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। বিদেশী শক্তি বিতাড়ণের স্লোগান তুলে যখন বিদ্রোহীরা উত্তর চীনে অগ্রসর হন এবং বহু মিশনারী ও খৃষ্টান হতাহত করেন, এমন কি পেকিং-এ অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসগুলিও অবরোধ করেন, তখন জাপান ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে তড়িৎ গতিতে এক আন্তর্জাতিক সেন্যবাহিনী গঠন ক'রে বিদ্রোহ দমনে বদ্ধপরিকর হয়। ফলে অতি সহজেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আন্দোলনের ফল ও গুরুত্ব :

চীনকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করবার এমন সুযোগ বিদেশী শক্তিবর্গ পূর্বে

কখনও পান নি। তথাপি তাঁরা চীনের সার্বভৌমতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সম্মত হন। তবে চীনকে কিছু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তাঁরা ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে একটি প্রোটোকল স্বাক্ষরিত করেন। ইহা বক্সার প্রোটোকল (Boxer Protocol) নামে অভিহিত। এই প্রোটোকল অনুসারে (১) চীন সরকারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ আমদানি-রপ্তানির শুল্ক থেকে এবং লবণ থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে ৪৫০ মিলিয়ন টেল বা প্রায় ৩৩৩ মিলিয়ন ডলার বিদেশী শক্তিবর্গকে দিতে হবে; (২) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে স্বর্ণের মাধ্যমে; (৩) চীনের পক্ষে ক্ষতিপূরণ করা যাতে সহজসাধ্য হয় তজ্জন্য স্থির হয় যে, আমদানির উপর শুল্ক পাঁচ-শতাংশ বৃদ্ধি পাবে; (৪) দশজন উচ্চশ্রেণীর অফিসার, গবর্ণর ইউ-শিয়েন (Yu-hsien) সমেত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অপর একশত জন শাস্তি পাবেন; (৫) চীনকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে; (৬) চীনের পঁচিশটি দুর্গ ধ্বংস করা হবে; (৭) পেকিং-এ বৈদেশিক দূতাবাসগুলিতে বিদেশী সৈন্য মোতায়েন থাকবে এবং সমুদ্র থেকে পেকিং পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য বিদেশী পুলিশবাহিনী নিযুক্ত হবে; (৮) পূর্বের জুংলি ইয়ামেনের পরিবর্তে বৈদেশিক দপ্তর স্থাপিত হবে; (৯) যে সব অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়, সে-সব অঞ্চলে পাঁচ বৎসরের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ স্থগিত থাকবে; (১০) দুই বৎসর যাবৎ চীনে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি বন্ধ থাকবে; প্রয়োজন বোধে আরও দুই বৎসরকাল অস্ত্রশস্ত্র আমদানি হবে না।

ইঙ্গ-জাপান চুক্তি (Anglo-Japanesc Alliance, ১৯০২):

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের সিমোনোশেকি সন্ধি পরিবর্তিত হওয়ার ফলে লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার বন্দর জাপানের হস্তচ্যুত হয়। রুশ কূটনৈতিক চক্রান্তের জন্যই জাপানকে এই ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। পরিণামে দেখা যায় যে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে একটা বৈরীভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাশিয়ার প্রচেষ্টা হয় দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে জাপানী প্রভাব বিনষ্ট করা, অপরদিকে জাপান স্থির করে যে দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে রাশিয়ার অনুপ্রবেশ বজ্রমুষ্টিতে বাধা দান করা। কিন্তু জাপানের পক্ষে রাশিয়ার মত বৃহৎশক্তিকে (Colossus of the North) একাকী বাধা দেওয়া সম্ভব নয়—এ বিষয়ে জাপান সম্যকরূপেই অবহিত ছিল। সেই কারণে জাপান ইংলণ্ডের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপনে সচেষ্ট হয়। তথাপি একটা বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে জাপান রাশিয়ার সঙ্গে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইয়ামাগাতা প্রোটোকল (Yamagata Protocol) এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে নিশিরোজেন

কনভেনশন (Nishi-Rosen Convention) সম্পাদিত করে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রোটোকল অনুসারে জাপান ও রাশিয়া সম্মত হয় যে, কোরিয়াতে উভয় দেশই সমপর্যায়ভুক্ত হিসাবে গণ্য হবে; উভয় দেশই কোরিয়া থেকে স্ব স্ব সৈন্যবাহিনী অপসারিত করবে, কোরীয় সরকারের হস্তেই কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের দায়িত্ব তথা সেখানে শান্তি শৃংখলা বজায়ের দায়িত্ব অর্পিত থাকবে; কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উভয় দেশই যৌথভাবে চেষ্টা করবে এবং প্রয়োজন-বোধে আর্থিক সাহায্য দান করবে; ইয়ালু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বনসম্পদের উপর রাশিয়ার অধিকার থাকবে এবং তুমেন নদীতীরে খনিজ সম্পদের উপরও রাশিয়ার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে। রাশিয়া কিন্তু এই শর্তগুলি শুরু থেকে অমান্য করতে থাকে, যেমন কোরিয়া সরকারের উপর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের দায়িত্ব অর্পণ না করে রাশিয়া স্বয়ং রাশিয়ান পদ্ধতিতে সৈন্যবাহিনী সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোরিয়ার অর্থনীতির উপরও রাশিয়া প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং প্রোটোকলটি কার্যকরী হয় না। তথাপি জাপান নূতনভাবে রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য কথাবার্তা চালাতে থাকে। ফলে স্বাক্ষরিত হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের কনভেনশনটি। এই কনভেনশন অনুযায়ী, কোরিয়াতে রাশিয়া ও জাপানের পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্নির্ধারিত হয়। স্থির হয় যে, উভয় দেশই কোরিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিক ক্ষমতা স্বীকার করবে এবং পূর্বেই একে অপরের সম্মতি না নিয়ে (রাশিয়া বা জাপান) কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের জন্য বা অর্থনৈতিক সাহায্যদানের জন্য অগ্রসর হবে না, রাশিয়া স্বীকৃত হয় যে, কোরিয়াতে জাপানের বাণিজ্যিক ও শিল্প-সংক্রান্ত স্বার্থসিদ্ধিতে বাধাদান করবে না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কোরিয়াতে রুশ-জাপান রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় নিশি-রোজেন কনভেনশনের শর্তানুসারে। রাশিয়া কিন্তু জাপানকে মিত্র হিসাবে লঘুজ্ঞান করে। আকাগির[২] মতে, জাপানের শক্তির যথোপযুক্ত মূল্যায়ন না ক'রে রাশিয়া বালির ভিত্তির উপর তার দূরপ্রাচ্যের সাম্রাজ্য গঠনে প্রয়াস পায়।

সৌহার্দের ভিত্তিতে রুশ-জাপান বোঝাপড়া সম্ভব না হওয়ায় জাপান ইংলণ্ডের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপনে মনস্থ করে। এই মিত্রতাস্থাপন সম্ভব হয় এই কারণে যে, জাপান ও ইংলণ্ড উভয় শক্তিই দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। রাশিয়া পরিগণিত হয় উভয় রাষ্ট্রের সাধারণ বৈরী রূপে।

রুশ-জাপান বৈরিতার কারণ:

উভয় দেশেরই কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ

(২) Roy Hidemichi Akagi, Japan's Foreign Relations, 1542-1936)

ছিল। রাশিয়া উভয় অঞ্চলেই জাপানকে কোণঠাসা করবার নীতি অনুসরণ করে। রুশ কূটনৈতিক চক্রান্তেই লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার বন্দর জাপানের হস্তচ্যুত হয়। তারপর কনসেশনের দ্বন্দ্বে যোগদান ক'রে রাশিয়া স্বয়ং উক্ত উপদ্বীপ ও বন্দরের উপর ২৫ বৎসরের ইজারা লাভ করে, মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথটি ভ্লাডিভস্টক বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত করে এবং রেলপথটির নিরাপত্তার জন্য রুশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে। বক্সার বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে রাশিয়া চীনের পক্ষ অবলম্বন ক'রে উত্তর চীনের উপর সামরিক আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়। বক্সার বিদ্রোহকালে জাপান ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে তাদের সেনাবাহিনী উত্তর চীনে প্রেরণ করে। রাশিয়া দাবি জানায় বিদ্রোহ দমনের পর বিদেশী সৈন্যবাহিনী যেন চীন থেকে অপসারিত করা হয়। রাশিয়া এইভাবে চীনের নিকট প্রমাণিত করতে সচেষ্ট হয় যে, রাশিয়ার ন্যায় চীনের পরম মিত্র অপর কোন রাষ্ট্র নয়। রাশিয়া স্বয়ং অবশ্য মাঞ্চুরিয়া থেকে রুশ সৈন্য অপসারিত করে নি, কারণ রাশিয়ার চক্ষে মাঞ্চুরিয়া তখন চীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাই মাঞ্চুরিয়া গণ্য হত এক স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসাবে। মূলতঃ, রাশিয়া বক্সার বিদ্রোহের পর মাঞ্চুরিয়ার উপর সামরিক অভিভাবকত্ব স্থাপনের দাবি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে চীনের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করে। রুশ নেতা আলেক্সিভের (Alexeiev) প্ররোচনায় চিং গবর্ণর-জেনারেল টিসেং (Tseng) এই চুক্তির একটা খসড়াও প্রস্তুত করেন। ইংলন্ড, আমেরিকা ও জাপান যখন এই খসড়ার বিষয়বস্তু জানতে পারে তখন ঐ সকল দেশ চীনের উপর চাপ সৃষ্টি করে, খসড়া-চুক্তিটি বাতিলের জন্য। ফলে চুক্তিটি বাতিল হয়। বক্সার আন্দোলনের সুযোগে রাশিয়া কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া গ্রাসের চক্রান্ত এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু রুশ-জাপান সম্পর্কে যে চিড় ধরে তা আর মেরামত হয় না।

রুশ-ইংলণ্ড বৈরিতার কারণ:

দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতিতে ইংলন্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থ ব্যাহত হয়। রাশিয়া যে ভাবে মাঞ্চুরিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয় তাতে মাঞ্চুরিয়ার সঙ্গে ইংলন্ডের বাণিজ্যিক-সম্পর্কের অবনতির নিশ্চিত সম্ভাবনায় ইংলন্ড আতঙ্কিত হয়। তাই ইংলন্ডের নিকট রাশিয়ার অগ্রগতিতে বাধাদান করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। এইকালে পেকিং থেকে ইয়াংৎসি অববাহিকার অন্তর-দেশে অবস্থিত হ্যানকাও (Hankow) পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মিত হয়। মূলধন জোগান দেয় বেলজিয়াম। তখন বেলজিয়াম ছিল ফ্রান্স ও রাশিয়ার মিত্রদেশ। ফলে পেকিং-হ্যানকাও রাজপথটি রুশ-প্রভাবাধীন হয়। এই

রাজপথটি নির্মাণের ফলে তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সমর্থন লাভ ক'রে রাশিয়া এইভাবে অধিকতর শক্তিশালী হয়, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি রুশ-ইংলণ্ড সম্পর্কে তিক্ততা ও বৈরিভাব সৃষ্টি। রাশিয়া এইভাবে ইংলণ্ড ও জাপানের চক্ষে সাধারণ বৈরী রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় ইংলণ্ড ও জাপানের মধ্যে মিত্রতাস্থাপন সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

যে সমস্ত বৃটিশ কূটনীতিক ইঙ্গ-জাপান চুক্তি সমর্থন করেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন স্যার এলিস অ্যাশমিড বার্টলেট (Sir Ellis Ashmead Bartlett)। তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই চুক্তির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কাউন্ট ইটোর মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাইকাউন্ট মুনেমিৎসু (Viscount Munemitsu) কিন্তু ইঙ্গ-জাপান চুক্তি সম্পাদনে খুব উৎসাহী ছিলেন না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মন্তব্য করেন যে, এরূপ চুক্তি একটা সুখকর স্বপ্ন (Sweet dream) ব্যতীত আর কিছু নয়। কিন্তু ১৮৯৬-৯৮ খৃষ্টাব্দে জাপান যে-ভাবে কনভেনশন ও প্রোটোকল সম্পাদনের মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকে এবং যেভাবে রাশিয়া এই সদিচ্ছার যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে বিরত থাকে, এ সব ইংলণ্ডের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। ফলতঃ ইংলণ্ডের মনে স্বভাবতই এই চিন্তা উদিত হয় যে, জাপানের সঙ্গে একটি চুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এরূপ একটি চুক্তির সম্ভাবনাকে স্বাগত জানিয়ে স্যার এলিস ১লা মার্চ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হাউস অব কমন্স-এ মন্তব্য করেন যে, দূর প্রাচ্যের রাজনীতিতে জাপানের অভ্যুদয় ইংলণ্ডের পক্ষে সৌভাগ্য-সূচক, কারণ উদীয়মান জাপানের সাহায্যে ইংলণ্ড চীন সমস্যা তথা উত্তর প্রশান্তমহাসাগরীয় সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ সলস্‌বেরি (Salisbury) মন্ত্রিসভার সদস্য, (উপনিবেশ সমূহের সেক্রেটারী অব ষ্টেট) জোসেফ চেম্বারলেন একটি ভোজসভায় তৎকালীন জাপানী মন্ত্রী কেটো টাকাকি-কে (Kato Takaaki) বলেন যে, ইংলণ্ড জাপানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে প্রস্তুত আছে। ফলে কেটো টাকাকি ২৬শে মার্চ একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে ইংলণ্ডকে জানান যে রুশ-জাপান মিত্রতা অসম্ভব এবং ইঙ্গ-জাপান চুক্তি একান্ত কাম্য। কেটো টাকাকি এরূপ প্রস্তাবও করেন যে, পোর্ট আর্থার বন্দরের উপর রাশিয়া কর্তৃক ইজারা স্থাপনের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-জাপানীয় নৌবাহিনীর একটি সম্মিলিত প্রতিবাদ একান্ত বাঞ্ছনীয়। কাউন্ট ইটো কিন্তু ছিলেন রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিসম্পাদনের স্বপক্ষে। ইটোর যুক্তি, রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করলে জাপানের পক্ষে কোরিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপন সহজসাধ্য হবে। তৎপরিবর্তে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। অপর পক্ষে ইয়ামাগাতা ও কাৎসুরা ছিলেন রাশিয়া-বিরোধী।

রুশ অগ্রগতি রোধের জন্য তাঁরা জাপানের সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর উন্নতি সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইংলণ্ডের স্যার এলিস ও চেম্বারলেন ব্যক্তিগতভাবে জাপানের সঙ্গে চুক্তির স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করলেও তৎকালীন বৃটিশ সরকার গোড়ার দিকে জাপানের মত একটা ক্ষুদ্র এশীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের উৎকর্ষ উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই বৃটিশ সরকার তখন জার্মানীর সঙ্গে মিত্রতাস্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। জার্মানী জাপান অপেক্ষা বৃহত্তর দেশ এবং একটি ইউরোপীয় শক্তি। কিন্তু জার্মানী বৃটেনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে কোন সঙ্গত, গ্রহণযোগ্য যুক্তি খুঁজে পান নি। জার্মানির প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল অভিজাততন্ত্র। বৃটেনের উদারপন্থী প্রশাসনের প্রভাবে জার্মানীর প্রশাসনিক অভিজাততন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। অধিকন্তু ঊনবিংশ শতকে অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক এবং ফ্রান্সেব সঙ্গে যুদ্ধে যখন জার্মানী লিপ্ত থাকে তখন বৃটেনের ঔদাসীন্য ও নিরপেক্ষতা জার্মানীকে মর্মাহত করে। সেই বৃটেনের সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদন করতে জার্মান মন স্বতঃই সায় দেয় না। এতদ্ব্যতীত জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম রাজনীতিতে অতীব উগ্রতার পরিচয় দিয়ে ক্রমশঃ ইংলণ্ডের অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর বিবাট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, উগ্রজাতীয়তাবাদ, আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি, নৌশক্তিতে বৃটেনকে অতিক্রম করার পরিকল্পনা-সূচক নৌভ বিল, বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত বুয়োরদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য সহানুভূতি প্রদর্শন ইত্যাদি কারণে ইঙ্গ-জার্মান মিত্রতা সম্পাদনে ক্রমশঃ শিথিলতা দেখা দেয়। পরন্তু উভয় দেশের মধ্যে বৈরিভাবই পরিস্ফুট হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষ বৎসরে ট্রান্সভালের সঙ্গে যুদ্ধে যখন বৃটেনের পরাজয় ঘটে তখন দ্বিতীয় উইলিযাম ট্রান্সভালের প্রেসিডেন্ট ক্রুজারকে (Kruger) অভিনন্দনসূচক এক তারবার্তা প্রেরণ করেন। ক্ষুব্ধ ইংলণ্ড প্রতিবাদ জানিয়ে মন্তব্য করেন যে, এই তারবার্তা একটি অননুমোদনীয় ধৃষ্টতামাত্র। দ্বিতীয় উইলিয়ম এই তারবার্তা প্রেরণেব জন্য তাঁর মন্ত্রীদের উপর দোষারোপ করেন। ইঙ্গ-জার্মান চুক্তির পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন জার্মানীর প্রতি বৃটেনের জনগণের মনোভাব ছিল ঐকান্তিকতাহীন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাব্যঞ্জক, অপর পক্ষে জার্মানীতে বৃটেনের প্রতি মনোভাব ছিল সন্দেহাতীত রূপে শত্রুতাপূর্ণ। মূলতঃ বিশাল স্থলবাহিনী-শক্তি এবং বিরাট নৌবাহিনী-শক্তির মধ্যে কোন মৈত্রীর বন্ধন সম্ভব হয় নি।

জাপানের নিকট রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি মিত্রশক্তির সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে বৃটেনের নিকটও একটি মিত্রশক্তির সহযোগিতা কাম্য মনে হয়। জার্মানীর সঙ্গে বৃটেনের মিত্রতাস্থাপন সম্ভব হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মিত্রহিসাবে গ্রহণযোগ্য হয় না, কারণ বৃটেনের প্রতি সদিচ্ছা পোষণ করলেও

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের কোন যুদ্ধে যোগদান করতে অন হা প্রকাশ করে। অবস্থার পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবাদের অধিক কিছু করতে প্রস্তুত নয়। সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য মিত্র হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রও বাতিল হয়। অবশিষ্ট থাকে ফ্রান্স। কিন্তু ফ্রান্স তখন রাশিয়ার শিবিরভুক্ত। কাজেই সম্ভাব্য মিত্র হিসাবে ফ্রান্সও গ্রহণযোগ্য হয় না। অবশেষে অনেক ইতস্ততের পর ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী লর্ড ল্যান্সডাউন এবং জাপানের পক্ষে লণ্ডনস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূত ব্যারণ হায়াশি ইঙ্গ-জাপান চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। সেদিন ছিল ৩০শে জানুয়ারী, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ। বক্সার বিদ্রোহকালে (১৯০০ খৃষ্টাব্দ) বৃটেন জাপানের সহযোগিতা পায়। আবার বুয়োর যুদ্ধে প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর বৃটেনে হতাশার ভাব উদ্রেক হয়। আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপে বৃটেনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এই অবস্থায় বৃটেনের নিকট একটি মিত্রশক্তির সহযোগিতা বিশেষ কাম্য হয়ে ওঠে। জাপান সেই মিত্রশক্তি হিসাবে সুবিবেচিত হয়। কাজেই বক্সার বিদ্রোহ ও বুয়র যুদ্ধ ইঙ্গ-জাপান চুক্তি সম্পাদনে সহায়ক কারণ হিসাবে গণ্য।

জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে গররাজি হলেও ইঙ্গ-জাপান চুক্তি সমর্থন করে। চীন-জাপান যুদ্ধ চলাকালীন এবং যুদ্ধ-সমাপ্তির অব্যবহিত পরেও জার্মানী জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সমর্থক থাকে। জার্মানী ত্রিশক্তি মিত্রতার অন্যতম শরিকও ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে রাশিয়ার দ্রুত অগ্রগতিতে জার্মানী ক্রমশঃ আতংকগ্রস্ত হয়, আতংক এই কারণে যে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত জার্মানীর প্রভাবাধীন শানটুং প্রদেশ রাশিয়ার হস্তগত হতে পারে। এহেন আতংক সত্ত্বেও জার্মানী দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রভাব বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করে। কারণ, ইউরোপের রাজনীতিতে রুশ-জার্মান সম্পর্ক তিক্ত থাকায় দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে জার্মানী রাশিয়ার সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। ইউরোপে রুশ-জার্মান রিইনস্যুরান্স সন্ধির (Reinsurance treaty) মেয়াদ শেষে জার্মানী তার নবীকরণ করে নি। ফলে রাশিয়া ক্ষুণ্ণ হয়। ইউরোপে এইরূপ রুশ-জার্মান সম্পর্কের অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানী দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে রাশিয়ার মনস্তুষ্টি করা কূটনৈতিক বিচারে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে। এক্ষেত্রে জার্মানীর পক্ষে ইংলণ্ডের সঙ্গে রুশ-বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া কূটনীতিতে সমর্থনযোগ্য নয় নি। অথচ জার্মানীর বিবেচনায় দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি রোধ করা অত্যাবশ্যক। সেই কারণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের হাত শক্ত করবার উদ্দেশ্যে জার্মানী ইঙ্গ-জাপান চুক্তিকে স্বাগত জানায়। এই যুক্তির ভিত্তিতেই ডিনাক মন্তব্য করেন যে ইঙ্গ-

জাপান চুক্তির জন্য প্রাথমিক প্রস্তাব আসে জার্মানীর নিকট থেকে।[৩]

ইঙ্গ-জাপান চুক্তির শর্তাদি :

(১) চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় জাপান ও ইংলণ্ডের সমতার ভিত্তিতে। (২) চীন ও কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার মাধ্যমে ইংলণ্ড ও জাপান দূরপ্রাচ্যে সাধারণ শান্তি ও অবস্থা (Status Quo) বজায় রাখতে স্বীকৃত হয়। (৩) চীন ও কোরিয়াতে সকল দেশেরই বাণিজ্যিক সমান অধিকার থাকবে। (৪) ইংলণ্ডের স্বার্থ বিজড়িত থাকবে প্রধানতঃ চীনের সঙ্গে কিন্তু জাপানের থাকবে চীন ও কোরিয়া উভয় দেশের সঙ্গে। ইংলণ্ড ও জাপানের স্বার্থ হবে অনাক্রমণাত্মক (non-aggressive)। (৫) ইংলণ্ড ও জাপান পরস্পরের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্ব স্ব প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বনের অধিকার স্বীকার করে। (৬) ইংলণ্ড ও জাপান পরস্পরকে আত্মরক্ষার সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুত হয়। যদি এই দুই অংশীদারের মধ্যে কেহ একজন নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য কোনও বিপক্ষরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে অপর অংশীদার সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকবে। কিন্তু যদি অপর কোন রাষ্ট্র বিপক্ষরাষ্ট্রটিকে সাহায্যদানে অগ্রসর হয়, তাহলে নিরপেক্ষ অংশীদার নিরপেক্ষতার ভূমিকা বর্জন ক'রে স্বীয় মিত্ররাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হলে ইংলণ্ড নিরপেক্ষ থাকবে, কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্স বা জার্মানী যোগদান করলে ইংলণ্ড নিরপেক্ষ না থেকে জাপানের পক্ষ অবলম্বন ক'রে যৌথভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই শর্তটির কিছু রদবদল হয় প্রথমতঃ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এবং পুনরায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রদবদলে স্থির হয় যে, জাপান এবং রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে অপর কোন রাষ্ট্র (ফ্রান্স অথবা জার্মানী) রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করুক বা না করুক ইংলণ্ড তৎক্ষণাৎ জাপানের পক্ষ অবলম্বন করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এই রদবদলের ফলে শর্তটির সামরিক ভিত্তি অধিকতর প্রশস্ত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের রদবদল অনুসারে, ইঙ্গ-জাপান চুক্তি ইংলণ্ডকে জাপানের পক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করবে না, যেহেতু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি আরবিট্রেশন সন্ধি (Arbitration Treaty) স্বাক্ষরিত হয়। জাপানও একই বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ-নিবারক রুট-টাকাহিরা (Root Takahira) নামে একটি চুক্তি সম্পাদিত করে। (৭) শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকাকালীন ইংলণ্ড ও জাপান পরস্পরের নৌবাহিনীকে পরস্পরের বন্দর ব্যবহার করতে দিতে

তিলক, তদেব। পৃ. ১৭৪

সম্মত হয়। (৮) ইংলণ্ড ও জাপান প্রত্যেকে দূরপ্রাচ্যের সমুদ্রে যে-কোন তৃতীয় শক্তির নৌবাহিনী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নৌবাহিনী মোতায়েন রাখতে স্বীকৃত হয়। (৯) এই চুক্তিটির স্থায়িত্বকাল হবে প্রথম পর্যায়ে পাঁচ বৎসর। প্রথম পাঁচ বৎসরের মেয়াদ অন্তে ইহার কার্যকাল অধিকতর একবৎসর বৃদ্ধি পেতে পারে।

ইঙ্গ-জাপান চুক্তির গুরুত্ব :

(১) দূর প্রাচ্যের তথা পৃথিবীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এই চুক্তিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিনয় স্বরূপ। (২) জাপানের নিকট এই চুক্তিটির গুরুত্ব অপরিসীম। এর ফলে জাপানের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। জাপান প্রথম সারির দেশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। জাপান এক্ষণে ইংলণ্ডের সহায়তায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে শক্তির দ্বন্দ্বে যোগদানের ক্ষমতা অর্জন করে। বৃটিশ নৌবাহিনীর সহযোগিতায় জাপানের নৌশক্তি প্রভুত বৃদ্ধি পায়। আসন্ন রুশ-জাপান যুদ্ধে অন্য কোন ইউরোপীয় শক্তি জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করতে সাহসী হবে না। (৩) ইহা জাপানের পক্ষে কম গৌরবের ছিল না যে, বৃটেনের মত একটি ইউরোপীয় শক্তি জাপানের মত একটি এশীয় শক্তির সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে মিত্রতাস্থাপনে সম্মত হয়। (৪) এই চুক্তির তাৎপর্য এই যে দূরপ্রাচ্যে রাশিয়াকে কোণ-ঠাসা করবার জন্য বৃটিশ ও জাপানী কূটনীতি একত্র পোকিং-এ তৎপর থাকবে। যদি কুটনীতির মাধ্যমে জাপান রাশিয়াকে ঠেকিয়ে না রাখতে পারে তাহলে জাপান তখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তখন ইংলণ্ডের কর্তব্য হবে রাশিয়া যাতে অপর কোন রাষ্ট্রের নিকট হতে কোন সাহায্য না পায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। (৫) অবস্থা পরিবর্তনে রাশিয়া চীনের প্রস্তাব অনুযায়ী মাঞ্চুরিয়া থেকে রুশ সৈন্য অপসারণে সম্মত হয়। এই মর্মে রাশিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া কনভেনশন স্বাক্ষরিত করে। এই কনভেনশন অনুযায়ী স্থির হয় যে, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া থেকে ছয় মাসের মধ্যে এবং মধ্য মাঞ্চুরিয়া থেকে বার মাসের মধ্যে রাশিয়া তার সৈন্যবাহিনী অপসারিত করবে, যদি অবশ্য সৈন্য অপসরণকালে কোন গোলমাল বা বাধার সৃষ্টি না হয়। আসলে কিন্তু রাশিয়া তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না। (৬) ইঙ্গ-জাপান চুক্তি রুশ-জাপান যুদ্ধ ত্বরান্বিত করে। (৭) ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর ইংলণ্ড ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। চুক্তিটির ফলে কি বৃটেনের এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত হয়? এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেয়ারব্যাঙ্কের মতে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে।[৪] ভিনাকের[৫] বিবেচনায়

৪ কেয়ারব্যাঙ্ক, তদেব। পৃ ৪৭৯

৫ ভিনাক, তদেব। পৃ ১৭৬

ইংলণ্ড চুক্তিটি সম্পাদিত ক'রে বিচ্ছিন্ন অবস্থার অবসান ঘটায়। জে পি. টি. বিউরীর[৬] মতে ইঙ্গ-জাপান চুক্তিটি দূরপ্রাচ্যে বৃটেনের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটায়। বিউরীর এই উক্তিটি বেশ সতর্কতামূলক। কিন্তু এ. জে. পি. টেলার[৭] মনে করেন যে, চুক্তিটির ফলে বৃটেনের বিচ্ছিন্নতা বরং স্থিরীকৃত (Confirmed) হয়, ইহার অবসান ঘটে নি। এখানে রাজনীতিতে বিচ্ছিন্ন অবস্থার অর্থ হচ্ছে ইউরোপীয় ব্যালান্স অব পাওয়ার (Balance of Power) বা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহের বলসাম্য থেকে পৃথক থাকা বা নির্লিপ্ত থাকা। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের চুক্তির পরও বৃটেন ইউরোপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের বলসাম্য থেকে পৃথক বা নির্লিপ্তভাবেই অবস্থান করে। অথচ ইউরোপীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করেই তখন যত কিছু কূটনৈতিক চক্রান্ত চলতে থাকে। সে ক্ষেত্রে ইউরোপের রাজনীতিতে বৃটেনের বিচ্ছিন্নতার অবসান হয় নি বলেই মনে হয়। এই অবস্থার অবসান ঘটে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত (Anglo-French Entente, 1904) স্বাক্ষরিত হবার পর। তবে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে দূর প্রাচ্যের রাজনীতিতে বৃটেনের বিচ্ছিন্নতাব অবসান ঘটে। বিউরীও এই মত সমর্থন করেন। (৮) ইঙ্গ-জাপান চুক্তিটির একাধিকবার পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে চুক্তিটি সর্বপ্রথম পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয়বার পরিবর্তিত হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। তখন স্থির হয় যে চুক্তিটির মেয়াদ থাকবে ১৩ই জুলাই ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ চুক্তিটির মেয়াদ তৃতীয়বার বর্ধিত না হলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই উহা বাতিল হবার কথা। চুক্তিটি মূলতঃ রাশিয়া ও জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জার্মানী ও রাশিয়া, উভয় দেশই দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর শোচনীয় পরাজয়ের পর জার্মানীর সামরিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতা অনুমেয়। আবার, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নূতন রুশ সরকার ব্যস্ত থাকে। সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে সে অবস্থায় কোন আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করা কল্পনারও বাহিরে ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর ইঙ্গ-জাপান চুক্তিটির পুনরায় মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রস্তাবের পশ্চাতে কোন যুক্তি না থাকারই কথা। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চুক্তিটি বাতিল করবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করে কিন্তু সে প্রস্তাব চুক্তির শরিক রাষ্ট্র দুটি অগ্রাহ্য করে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পরও চুক্তিটি বজায় রাখার সুদূরপ্রসারী অর্থ এই যে, জাপান বা ইংলণ্ড কোন কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত

৬ New Cambridge Modern History, Vol XII, ed. 2, পৃ. ১২৪

৭ A. G. P. Taylor, Struggle for the Mastery in Europe, পৃ. ৪০০

হলে উভয় রাষ্ট্রই সম্মিলিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। যুক্তরাষ্ট্রও এই অর্থ সম্যক উপলব্ধি করে। জাপান এবং ইংলণ্ড অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রকে এই আশ্বাস দেয় যে, চুক্তিটি বজায় থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এই আশ্বাসবাণী অর্থহীন হিসাবে প্রতীয়মান হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থহীন ভাষায় জানায় যে, ইংলণ্ড বা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে যুক্তরাষ্ট্র ভীত নয়। তবে ঐ চুক্তিটি অযথা দূরপ্রাচ্যে জাপানের সাম্রাজ্যবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। মোট কথা চুক্তিটির তৃতীয়বার নবীকরণের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হয় এবং জাপানের 'ডানা কেটে' দেওয়ার উদ্দেশ্যে জাপানের নৌবাহিনীর বহর সীমিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় ওয়াশিংটন সম্মেলনে (১৯২১-২২)।

(৯) সুতরাং ইঙ্গ-জাপান চুক্তি আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। দূরপ্রাচ্যের তথা ইউরোপীয় রাজনীতিতে জাপান-বিরোধী মনোভাব ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাত্র দুবৎসর পরই রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-০৫) শুরু হয়। ফলে দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫) ঃ

ইঙ্গ-জাপান চুক্তি রুশ-জাপান যুদ্ধ ত্বরান্বিত করে।

দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সিমোনোশেকি সন্ধি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পর থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রই পরস্পরকে ভীতি ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখতে থাকে। এই ভীতি ও বিদ্বেষ দ্বিতীয়ত্ব বোধ থেকে সৃষ্ট হয় অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীর উপস্থিতিই এই ভীতি ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ (শ্রীমদ্ভাগবত) অর্থাৎ দ্বিতীয়ত্ব বোধ থেকে ভয় জন্মে। সৃষ্টির সুপ্রভাতে যখন একজন মাত্র পুরুষ সৃষ্ট হন তখন তিনি বিশাল বিশ্বরাজ্যে একাকী অবস্থান করতে ভীত হন। সঙ্গী প্রাপ্তির বাসনা তাঁর মনে উদ্রেক হয়। কিন্তু পরে প্রবোধ জন্মে—যৎ মদন্যাৎ নাস্তি কুতো নু বিভেমি। কস্মাৎ ব্যভেষ্যৎ? দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি (বৃহদারণ্যকোপনিষদ, প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণ) অর্থাৎ আমি ব্যতীত যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই তখন কাকে ভয় করব? ভয় কিভাবে জন্মায়? দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থান থেকেই ভীতির সঞ্চার হয়। যদি দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে জাপান বা রাশিয়া যে কেহ একটি রাষ্ট্র লিপ্ত থাকত তাহলে উভয়ের মধ্যে কোন ভীতির কারণ থাকত না এবং দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে শান্তিও বিঘ্নিত হত না। কিন্তু দুটি বিরোধী মনোভাবাপন্ন রাষ্ট্রের দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে একত্র অংশ গ্রহণের ফলে

উভয়েরই মনে ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভীতি থেকে জন্মায় আক্রমণাত্মক মনোভাব। ফলশ্রুতি যুদ্ধ-ঘোষণা।

ইঙ্গ-জাপান চুক্তি রুশ-জাপান যুদ্ধ ত্বরান্বিত করেছিল মাত্র কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ছিল না। প্রকৃত কারণ ছিল মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়ায় উভয় দেশের স্বার্থের সংঘর্ষ। ইঙ্গ-জাপান চুক্তির উপর আলোচনা প্রসঙ্গে মাঞ্চুরিয়াতে সংঘর্ষের কারণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কোরিয়াতে জাপানের আদর্শ ছিল, সেখানে বিদেশী প্রভাবান্বিত কোন এলাকা গড়ে উঠতে না দেওয়া এবং প্রশাসনিক সংস্কারকার্য সাধনের মাধ্যমে কোরিয়াকে একটি অতি আধুনিক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা। চীন সরকার জাপানের এই আদর্শকে কোন মর্যাদা দেওয়া যুক্তিসম্মত বিবেচনা করে নি। কোরিয়ার রানীও আদর্শের বিরোধিতা করেন। ফলে জাপান-বিরোধী কোরিয় রানী নিহত হন। তখন কোরিয়ার রাজা আশু প্রতিশোধ গ্রহণে অপারগ হয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন এবং কোরিয়া-স্থিত রুশ দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাময়িকভাবে রুশ দূতাবাস থেকেই কোরিয়ার প্রশাসন চালিত হতে থাকে। জাপান তখন কোরিয়া সম্পর্কে রাশিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার উদ্দেশ্যে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইয়ামাগাটা-লোবেনফ প্রোটোকল ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে নিশি-রোজেন কনভেনশন স্বাক্ষরিত করে। প্রোটোকল বা কনভেনশন কোনটিই ফলপ্রসূ হয় নি। ইঙ্গ-জাপান চুক্তির উপর আলোচনা প্রসঙ্গে এবিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং রুশ-জাপান সম্পর্কে যে চিড় ধরে তা আর মেরামত হয় না। ১৮৯৮-১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া কোরিয়ার একটি বন্দর দখলীভূত করতে তৎপর থাকে, জাপানও তৎপর থাকে মাঞ্চুরিয়াতে স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। ফলতঃ ১৮৯৮-১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাপান যেমন কোরিয়াতে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ প্রভূতভাবে বৃদ্ধি করে, তেমনি রাশিয়াও মাঞ্চুরিয়াতে সামরিক অভিভাবকত্ব স্থাপনে সচেষ্ট হয়। রাশিয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চীনের সঙ্গে আলেক্সিভ-টিসেং চুক্তি সম্পাদনে অগ্রসর হয়। চুক্তির খসড়াও প্রস্তুত হয়, কিন্তু শেষ অবধি মূলতঃ জাপানের চক্রান্তে সে খসড়া বাতিল হয়ে যায়। রুশ-জাপান বিরোধে ইহা যে ইন্ধনের কাজ করে তাতে সন্দেহ নাই। বক্সার বিদ্রোহের দু বৎসর পর অর্থাৎ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ইঙ্গ-জাপান চুক্তি। এই চুক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানকে প্রভূত শক্তিদান করে। বৃটেনের সাহায্যে রাশিয়াকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কোণঠাসা করা জাপানের পক্ষে এখন সহজসাধ্য হয়। বিপাকে পড়ে রাশিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে একটা মাঞ্চুরিয়া কনভেনশন স্বাক্ষরিত করে এই মর্মে যে আঠার মাসের মধ্যে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া থেকে সমগ্র রুশসৈন্য অপসারিত করবে। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য অপসারণের নামে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার এক অংশ থেকে সৈন্য

অপসারণ ক'রে অপর এক অংশে প্রেরণ করে। আবার অনেক সৈন্য কাউরিয়া-রূপে মাঞ্চুরিয়া থেকে ইয়ালু-নদীর তীরবর্তী রুশ-অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলে প্রেরিত হয়। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া কনভেনশন মান্য না করায় জাপান ক্ষুব্ধ হয়।

এতাবৎকাল অর্থাৎ ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপান তার কোরীয় এবং চীন সম্পর্কিত নীতিদ্বয় স্বতন্ত্রভাবে অনুসরণ করে আসে। কোরিয়ার উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য জাপান অপর কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ করত না। স্বীয় বিবেচনা ও স্বার্থ অনুযায়ী সে সব সমস্যার সমাধান করত। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে জাপান অন্যান্য শক্তির সঙ্গে পরামর্শ করত। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের পর জাপান স্থির করে যে কোরিয়া এবং চীন উভয় রাষ্ট্রের ব্যাপারেই রাশিয়ার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সমস্যা সমূহের মোকাবিলা করবে। সেইজন্য ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে চীন ও কোরিয়া সম্পর্কে জাপান রাশিয়ার নিকট কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থাপন করে। জাপানের প্রস্তাবগুলি ছিল : (১) জাপান এবং রাশিয়া উভয় দেশই চীন তথা কোরিয়ার স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা মান্য করবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুক্তদ্বার নীতি অনুসরণ করবে ; (২) কোরিয়াতে জাপানের বিশেষ স্বার্থগুলি রাশিয়া স্বীকার করবে, কোরিয়ার প্রশাসনিক সংস্কারের ব্যাপারে কোরিয়া সরকারকে জাপানের উপদেশ দেবার অধিকারও রাশিয়া স্বীকার করবে ; (৩) তৎপরিবর্তে জাপান মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ার রেলপথ-সংক্রান্ত বিশেষ স্বার্থ মান্য করবে।

উপরোক্ত জাপানী প্রস্তাবগুলির উত্তরে রাশিয়ার প্রতি-প্রস্তাবগুলি ছিল :(১) জাপান ও রাশিয়া কেবলমাত্র কোরিয়ার স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা স্বীকার করবে, চীনের নয় ; (২) রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানের বিশেষ স্বার্থসমূহ মান্য করবে, এমন কি কোরিয়ার প্রশাসনিক সংস্কার-সাধনে কোরিয়া সরকারকে জাপানের উপদেশ দিবার অধিকারও স্বীকার করবে। রাশিয়া কোরিয়াতে জাপানের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে বাধাদান করবে না, (৩) উত্তর কোরিয়া (৩৯° সমান্তরাল) নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত হবে ; (৪) কোরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে কোন দুর্গ নির্মাণ করা চলবে না কিংবা কোরিয়ার কোন অংশ সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে না ; (৫) জাপান মাঞ্চুরিয়া ভূখণ্ড (উপকূলবর্তী অঞ্চল সমেত) তার বিশেষ প্রভাবাধীন এলাকার বহির্ভূত হিসাবে গণ্য করবে।

ভিনাকের[৮] বিবেচনায় রাশিয়ার প্রস্তাবগুলির সার মর্ম হচ্ছে জাপান রাশিয়াকে চীনে তথা মাঞ্চুরিয়াতে অবাধ প্রভাব বিস্তারে সম্মতি দেবে, অপর

৮ ভিনাক, তদেব। পৃ. ১৮০

পক্ষে রাশিয়া জাপানকে অনুমতি দেবে কোরিয়াতে কেবলমাত্র শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করতে।

রাশিয়ার প্রতি-প্রস্তাবগুলির উত্তরে জাপান পুনরায় প্রস্তাব করে যে, (১) কোরিয়াতে জাপানের উপর যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রস্তাব হয়েছে সেই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ রাশিয়ার উপরও মাঞ্চুরিয়াতে আরোপিত হবে; (২) জাপান মাঞ্চুরিয়া রেলপথের উপর রাশিয়ার স্বার্থ মান্য করবে, এবং সমগ্র মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলকে স্বীয় স্বার্থসীমার বহির্ভূত হিসাবে গণ্য করবে।

রাশিয়া কিন্তু তার প্রাথমিক প্রদত্ত প্রস্তাবগুলির কোন রদবদলে সম্মত হয় না।

রাশিয়া ও জাপান যখন এইভাবে আলোচনারত, তখন রাশিয়ার জার ছিলেন দ্বিতীয় নিকোলাস। তাঁর বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধ ঘোষিত হওয়া বা শান্তি বিরাজিত থাকা তাঁর একক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। তিনি মনে করতেন যে, জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করবে না, পরন্তু রাশিয়া কর্তৃক স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ ক'রে সন্তুষ্ট থাকবে। জারের উপদেষ্টাগণও জাপানের স্থলবাহিনী তথা নৌশক্তির সম্যক্ মূল্যায়ন করে নি। ফলে জার জাপান সম্পর্কে এমন সব বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার পরিণতি হয় যুদ্ধ-ঘোষণা অথচ তিনি যুদ্ধ-জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য পূর্বাহ্নে দেশকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করেন নি। জারের অনুগ্রহ-প্রার্থী তিনটি রাজনৈতিক দল তখন রুশ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট থাকে: (১) প্রথম দলটির নেতা ছিলেন অর্থমন্ত্রী কাউন্ট ওয়াইট (Count Witt)। তাঁর পরিকল্পনা ছিল রেলপথ বিস্তারের মাধ্যমে এবং রুশ মূলধন বিনিয়োগ ক'রে রুশ সরকার চীনে তথা মাঞ্চুরিয়াতে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তৃত করবে। (২) দ্বিতীয় দলটি ছিল বেজোব্রাজভ (Bezobrazov) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বেজোব্রাজভ ছিলেন একজন ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসিক নেতা। তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে রাশিয়ার অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে পক্ষপাতী ছিলেন। (৩) তৃতীয় দলটি ছিল স্থল ও নৌ-বাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল একটি কোরীয় বন্দর অধিকার করা এবং মাঞ্চুরিয়ার উপর সামরিক প্রভাব বিস্তার করা। এই দলটির উদ্যোগেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়াতে এক বিশাল রুশ সেনাবাহিনী প্রেরিত হয় এবং টিয়েন্টসিন এর উত্তরে পেকিং-মুকডেন রেলপথের সংযোগস্থল রাশিয়ার অধিকারে আসে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের পর জারের মন্ত্রিসভায় বেজোব্রাজভের দলটি প্রাধান্য লাভ করে। ফলে বিচক্ষণ অর্থমন্ত্রী কাউন্ট ওয়াইট অপসারিত হন। বেজোব্রাজভ দলের কার্যকলাপ তথা কোরিয়া-মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে রুশ-জাপান আলোচনার ব্যর্থতা জাপানকে এত বেশি শঙ্কিত ক'রে তোলে যে যুদ্ধ ঘোষণা

যা শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার সিদ্ধান্ত জাপান শেষ অবধি রাশিয়ার হস্ত থেকে স্বহস্তেই গ্রহণ করে। জাপানের সিদ্ধান্ত হয় যুদ্ধ-ঘোষণা। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাপান প্রথমে ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, ৮ই ফেব্রুয়ারী পোর্ট আর্থার বন্দর অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে রুশ নৌ-বাহিনীকে হতচকিত করে, এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

যুদ্ধের-গতি ঃ জাপান কোরিয়া ও লিয়াওটাং উপদ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করে এবং নৌবাহিনী মোতায়েন করে ভ্লাডিভস্টক ও পোর্ট আর্থার বন্দর দুটিতে। এই দুই বন্দরে রুশ নৌবাহিনী পূর্ব থেকেই মোতায়েন ছিল। জাপানী সেনাপতি নোগি (Nogi) পোর্ট আর্থার বন্দর অবরোধ করলে রুশ সেনাপতি কুরোপটকিন (Kuropotkin) পোর্ট আর্থার বন্দর উদ্ধারকল্পে মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত মুকডেন থেকে পোর্ট আর্থারের অভিমুখে অগ্রসর হন। ফলে মুকডেনের দক্ষিণে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। সতের দিন যুদ্ধের পর জাপান জয়লাভ করে। ফলে মুকডেন তথা পোর্ট আর্থার বন্দর জাপানের হস্তে সমর্পিত হয়। তখন জানুয়ারী ১৯০৫। লিয়াওটাং এর যুদ্ধেও জাপান জয়লাভ করে। এ অবস্থায় রাশিয়ার শেষ সম্বল ছিল তার বাল্টিক নৌবাহিনী। স্বভাবতঃই রাশিয়া দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য বাল্টিক সাগরস্থিত স্বীয় নৌবহর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইঙ্গ-জাপান চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বৃটেন রুশ বাল্টিক নৌবহরকে সুয়েজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে অনুমতি দেয় না। ফলে বাল্টিক নৌবাহিনী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে যাত্রা ক'রে আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ ক'রে অধিক বিলম্বে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভ্লাডিভস্টক বন্দরে উপস্থিত হয়। ওই বাল্টিক নৌবাহিনীতে ছিল ৪৫টি যুদ্ধ জাহাজ, যেগুলিতে যুদ্ধোপযোগী সাজসরঞ্জামের অভাব ছিল। এহেন নৌবহরটি ভ্লাডিভস্টক থেকে জাপান ও কোরিয়ার মধ্যবর্তী শুসিমা (Tshusima) প্রণালীর পথে অগ্রসর হয়। শুসিমা প্রণালীতে জাপানী নৌবলাধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল টোগো (Togo) এবং রুশ অ্যাডমিরাল রডজেস্ট-ভেনসকি-র (Rodjestvensky) মধ্যে ২৭শে মে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তুমুল জলযুদ্ধ হয়। ৩২টি রুশ জাহাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং রাশিয়ার পরাজয় ঘটে। জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করে। ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধের পর নাকি এতবড় নৌযুদ্ধ আর হয় নি।[১]

শুসিমা জলযুদ্ধে পরাজয়ের পর রাশিয়া পরাজয় স্বীকার ক'রে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে। রুশ-জাপান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(১) D. M. Ketelbey, A short-history of modern times. পৃ, ৫১৭

ইঙ্গ-জাপান চুক্তি কি এই যুদ্ধ অনিবার্য ক'রে তুলেছিল ? চুক্তিটি রুশ-জাপান যুদ্ধ সম্ভাব্য করে তুলেছিল কিন্তু অনিবার্য করেনি। নিকোলাসের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাহেতু তাঁর মন্ত্রিসভায় বেজোব্রাজভের মত উদ্ধত-স্বভাব এবং আক্রমণপ্রবণ নেতা প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁর ষড়যন্ত্রে কাউন্ট ওয়াইটের মত বিচক্ষণ অর্থমন্ত্রী পদচ্যুত হন। ওয়াইটের পতনের ফলে বেজোব্রাজভের রাজনৈতিক উত্থানে এবং দূরপ্রাচ্যে রুশ ভাইসরয়ের হিসাবে অ্যাডমিরাল আলেক্‌সিভের নিয়োগে রাশিয়ার প্রশাসনে এক অদ্ভুত চক্রান্তপ্রবণ গোষ্ঠী (Sinister camarilla) প্রাধান্য লাভ করে। এই গোষ্ঠী যুদ্ধের মাধ্যমে রুশ-জাপান সমস্যাগুলি সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। রুশ রাজনীতিতে এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন যুদ্ধপ্রবণ গোষ্ঠীর উত্থান ও প্রাধান্যলাভ তথা কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে রুশ-জাপান বিরোধ যুদ্ধ অনিবার্য ক'রে তোলে। ইঙ্গ-জাপান চুক্তি যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে মাত্র।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের অদূরদর্শিতা, রুশ-রাজনীতিতে যুদ্ধ-প্রবণ বেজোব্রাজভ-আলেক্‌সিভ গোষ্ঠীর উত্থান ও প্রভাব বিস্তার, কাউন্ট ওয়াইটের পদচ্যুতি, আলোচনার মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ায় জাপানের ব্যর্থতা, জাপানের স্থলবাহিনী তথা নৌশক্তির শ্রেষ্ঠতা, ইংলণ্ডের বাধাদানের ফলে রাশিয়ার বাল্টিক নৌবহরের অতি বিলম্বে সুশিমা প্রণালীতে উপস্থিতি, এবং সুশিমার নৌযুদ্ধে বড়জেস্টভেনস্কির শোচনীয় বিপর্যয় এবং সর্বোপরি জাপানের বলিষ্ঠ স্বাদেশিকতা—এই সব কারণে রাশিয়ার পরাজয় ঘটে এবং জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করে।

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি (Treaty of Portsmouth, ১৯০৫)

তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্টের মধ্যস্থতায় ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে পোর্টস্‌মাউথ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

শর্তাদি ঃ

(১ রাশিয়া স্বীকৃতি দান করে যে কোরিয়াতে জাপানের সর্বাধিক রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় থাকবে। কোরিয়া অবশ্য স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বিরাজিত থাকবে। জাপান কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোরিয়াকে জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ; (২) রাশিয়া জাপানের হস্তে লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার বন্দরের ইজারা প্রত্যর্পণ করবে ; (৩) রাশিয়া মাঞ্চুরীয় রেলপথের দক্ষিণাংশ জাপানকে সমর্পণ করবে। ফলে মাঞ্চুরীয় রেলপথ দ্বিধাবিভক্ত হয়—উত্তরাংশ থাকে রাশিয়ার অধীনে এবং দক্ষিণাংশ আসে জাপানের অধিকারে ; (৩) স্থির হয় যে জাপান ও রাশিয়া উভয় দেশই মাঞ্চুরিয়া থেকে স্ব স্ব সৈন্যবাহিনী অপসারিত ক'রে মাঞ্চুরিয়াকে চীনের হস্তে সমর্পণ

করবে। মাঞ্চুরিয়া চীনের সার্বভৌম অধিকারভুক্ত হবে। রাশিয়া ও জাপান স্ব স্ব রেলপথ চৌকি দিবার জন্য স্ব স্ব সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখতে পারবে; (৫) মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ কেবলমাত্র শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। উক্ত রেলপথে লিয়াওটাং উপদ্বীপ ব্যতীত মাঞ্চুরিয়ার অপর কোন অংশ সামরিক সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে না; (৬) দক্ষিণ সাখালিন (৫০° সমান্তরাল) জাপানের হস্তে সমর্পিত হবে; (৭) মাঞ্চুরিয়ার শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে চীন যে সব বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সে সব বিধিব্যবস্থা গ্রহণে রাশিয়া বা জাপান কোন বাধা দান করবে না; (৮) জাপান রাশিয়ার নিকট হতে যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না।

সন্ধির গুরুত্ব: যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপান সুদূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে গণ্য হয়। রাশিয়ার ন্যায় বিশাল শক্তিকে পরাভূত ক'রে দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে জাপানের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। জাপানের এ বিজয় যেন গুরুর পরাভবে শিষ্যের বিজয়স্বরূপ। একটি এশীয় শক্তি একটি বিশাল ইউরোপীয় শক্তিকে পরাভূত করে। এতে একদিকে যেমন জাপানের জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি জাপানে সাম্রাজ্য লিপ্সা ও প্রবল হয়ে ওঠে। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই জাপান কোরিয়া অধিকার করে। উগ্র সাম্রাজ্যবাদের মনোভাব নিয়ে জাপান এক্ষণে রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানে অগ্রসর হয়। এই সাম্রাজ্যবাদিতা ক্রমশঃ উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে। এই যুদ্ধের পরিণাম অবশ্য জাপানের পক্ষে শুভ হয় নাই।

রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের সাফল্য চীনের উপর দুই রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ জাপানকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গ্রহণ ক'রে চীনে আর এক দফা সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। শেষ অবধি তাদের শুভ বুদ্ধি জাগে এবং তারা পারস্পরিক বিনাশ সাধনের বিকল্প হিসাবে দ্বন্দ্বের পরিবর্তে চীনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ, চীনে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণ সৃষ্ট হয়। জাপানের সাফল্যে চীনের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ নূতন উৎসাহে চীনের সার্বিক উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। চীনে পাশ্চাত্য ধাঁচে সংস্কার সাধনের এক উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপীয় সামরিক নীতি অনুযায়ী চীনা সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়। জনসাধারণ পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণে উৎসাহিত হন। পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য চীনা ছাত্রেরা দলে দলে ইউরোপ ও আমেরিকার স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। জাপানে পাড়ি দেয় ২০ হাজার চীনা শিক্ষার্থী। পাশ্চাত্য বিষয়ে অনার্সসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দেশে চাকুরী সহজলভ্য হবে,

এই আশ্বাসের মাধ্যমে চীনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য বিষয়ে জ্ঞান আহরণে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয়। দেশব্যাপী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু হয়, এমন কি বালিকা বিদ্যালয়ও। দশ বৎসরের মধ্যে অহিফেন সেবন নিষিদ্ধ হবে, এই মর্মে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে একটি অনুশাসন প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের অভূতপূর্ব সাফল্যে চীন যে প্রেরণা লাভ করে তারই ফলে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের চীনবিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়। এই বিপ্লবের সাফল্যে চীনে মাঞ্চু রাজত্বের অবসান ঘটে এবং তৎপরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় চীন সাধারণতন্ত্র (চীন রিপাবলিক), ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। ডক্টর সান ইয়াৎ সেন (Sun yat sen) অস্থায়ী সভাপতি হন। স্বল্পকালের ব্যবধানে ইউয়ান শি কাই (Yuan shi kai) স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। যদি চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে চীনে বক্সার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, রুশ-জাপান যুদ্ধ চীনে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

একটি এশীয় শক্তির নিকট পরাজিত হওয়ায় রাশিয়ার জারতন্ত্রের অন্তঃসার-শূন্যতা প্রকাশ পায়। জারতন্ত্রের অবসানের জন্য রুশ বিপ্লবের পথও প্রশস্ত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব ব্যর্থ হলেও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের লেনিনের নেতৃত্বে সাম্যবাদী বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়। ফলে দ্বিতীয় নিকলাস পদত্যাগ করেন। সেই সঙ্গে জারতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে রুশ-জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাশিয়া প্রাচ্যে সাম্রাজ্য-বৃদ্ধি প্রচেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে ইউরোপে বল্কান অঞ্চলে মনোনিবেশ করে। রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অস্ট্রিয়া, বোসনিয়া ও হেরজিগোভিনা অধিকার করলে রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। উপরন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি প্রাচ্যে সহযোগিতাসূচক মনোভাবের পরিচয় দেয় এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে ক্ষান্ত হয়। প্রাচ্যের রাজনীতি অপেক্ষা ইউরোপের রাজনীতিতে তাঁদের দৃষ্টি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। ফলে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রি-শক্তি আঁতাত (Triple entente) স্বাক্ষরিত হয়।

সর্বশেষে, জাপানের সাফল্য সমসাময়িক এশিয়া মহাদেশে পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা দান করে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখযোগ্য, রাশিয়ার পরাজয় ঘটে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে, আর তৎকালীন ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন উক্ত বৎসরের জুলাই মাসে এরপর শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন। অনুমেয় যে এই আন্দোলনে জাপানের জয়লাভ যথেষ্ট প্রেরণা দান করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এশিয়াতে কোথাও স্বাধীনতা আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত না হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হতে থাকে। তখন অবশ্য জাতীয়তাবাদের প্রেরণাদাতা আর জাপান নয়, বরং রাশিয়া। ইতিহাসের গতি বিচিত্র।

পঞ্চম অধ্যায়

রুশ-জাপান যুদ্ধোত্তর কাল (১৯০৫ ১৯১৯)

ফরমোজা, চীন, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় প্রভাব বিস্তার—একুশ দফা দাবি।

রুশ-জাপান যুদ্ধে বিরাট সাফল্যের পর জাপান ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় ফরমোজা, কোরিয়া, চীন ও মাঞ্চুরিয়াতে স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

ফরমোজা : সিমোনোশেকি সন্ধির ফলে ফরমোজা সর্বপ্রথম জাপানের অধিকারে আসে। ফরমোজার উন্নতিসাধনে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক লাভ হবে, অন্যদিকে তেমনি জাপানের ক্রমঃবর্ধমান জনসংখ্যার কিছু অংশ সেখানে বসতি স্থাপন করতে পারবে—এই আশা পোষণ ক'রে জাপান ফরমোজার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে রেলপথ, রাজপথ, বন্দর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রকল্প বাবদ প্রচুর অর্থব্যয় করে। পরিণামে ফরমোজা একটি উন্নতমানের দ্বীপে পরিণত হয়। আহিফেন, লবণ, কর্পূর, তামাকপাতা, চা, চিনি, মাছ, কয়লা, লোহা, সোনা ও পেট্রোলিয়াম—এই সব সম্পদ জাপান ফরমোজা থেকে আমদানি করতে থাকে। ফলে জাপানে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য দেখা দেয়। একদা অনুন্নত ফরমোজা জাপান সরকারের নানাবিধ গঠনমূলক প্রকল্প প্রয়োগের ফলে উন্নততর সোপানে উঠলেও জাপান থেকে আশানুযায়ী জনসংখ্যা ফরমোজায় বসতি স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে নি।

কোরিয়া : পোর্টসমাউথ সন্ধির ফলে কোরিয়ার উপর জাপানের সর্বাধিক সামরিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। কোরিয়া পরিণত হয় জাপানের একটি আশ্রিত রাজ্যে। কাউণ্ট ইটো কোরিয়াতে জাপানের সর্বপ্রথম রেসিডেণ্ট জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজা এবং জাপানের সম্রাটের মধ্যে একটি অধিকার-ভুক্তি সূচক সন্ধি (Treaty of annexation) স্বাক্ষরিত হয়। ফলে কোরিয়া জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় চোসেন (Chosen) নামে। এই অন্তর্ভুক্তির ফলে কোরিয়ায় আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার ও বৈদেশিক শক্তি সমূহের চক্রান্তের অবসান ঘটে। যেমন ফরমোজায়, সেইরূপ কোরিয়ায়, সার্বিক উন্নতি সাধনে জাপান নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার ফলে সেখানে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়, রেলপথ নির্মিত হয়,

বন্দরের উন্নতি সাধিত হয়, কৃষিকার্যের জন্য পতিত জমি উদ্ধার করা হয়, উন্নতমানের কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, উন্নততর স্বাস্থ্য রক্ষা প্রণালীও প্রবর্তিত হয়। সেই সঙ্গে ব্যাংক সম্পর্কীয় আধুনিক নিয়মকানুন চালু হয়, শিল্পের উন্নতি হয় এবং বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানির প্রসার ঘটে। কোরিয়ার ব্যবসায়ের ৯০ শতাংশ জাপানের আয়ত্তে আসে। কোরিয়ায় জাপানী শাসনের যেমন সুফল দেখা দেয়, তেমনি দেখা দেয় কুফলও। কোরিয়ার অধিবাসীদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাপানী ভাষা শিক্ষা করতে হয়, কোরিয়ার নিজস্ব সাহিত্য অবহেলিত হয়, কোরিয়ার জমির উপর কোরিয়ানগণ তাদের দখল হারায়, বেদখল জমি জাপানীদের হস্তগত হয়। এইসব কারণে জাপানী শাসন কোরিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে। কোরিয়া জাপান শাসনের বিরোধিতা ক'রে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিদ্রোহের ফলে কোরিয়াতে জাপানী প্রশাসনিক পদ্ধতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়।

মাঞ্চুরিয়া : রুশ-জাপান যুদ্ধের পর দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের ক্ষমতা সীমিত থাকে। জাপান স্বীয় ক্ষমতাধীন মাঞ্চুরিয়ায় অপর সকল শক্তিকে ব্যবসা বাণিজ্যে সম অধিকার দানে অস্বীকৃত হয়। অর্থাৎ রাশিয়া দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াতে মুক্তদ্বার নীতি অনুসরণ করতে সম্মত হয় না। মাঞ্চুরিয়ার আমদানি-রপ্তানির বাজার, খনিজ সম্পদ, বন-সম্পদ, সমস্তই জাপান একায়ত্ত করে। ১৯০৫-১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাপান মাঞ্চুরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করে। মাঞ্চুরিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ছিল প্রায় ৪০ মিলিয়ন টীল। মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৮, ১৯১১ এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০ মিলিয়ন টীল ,১৮০ মিলিয়ন টীল এবং কিঞ্চিদূর্ধ্ব ৫৪০ মিলিয়ন টীল। মাঞ্চুরিয়াতে সয়াবীন, মিলেট, মেজ, গম, বার্লি, চাউল ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের নিকটবর্তী অঞ্চলে বিদ্যালয়, হাসপাতাল, হোটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেইরেণ (Dairen), মুকডেন, চ্যাং চুন (Chang chun) এবং আনটুং (Antung) অঞ্চলগুলিতে বৈদ্যুতিক যন্ত্র স্থাপিত হয়। মাঞ্চুরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন জাপানের ব্যবসায়ে উন্নতি হয়, অন্যদিকে তেমনি মাঞ্চুরিয়ারও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মার্কিন রেলপথ পরিচালনায় বিশারদ হ্যারিম্যান (Harriman) দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের উপর পরোক্ষভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয় কিন্তু জাপান সরকার সে প্রস্তাব কার্যকরী হতে দেয় নি। পুনরায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন মার্কিণ সেক্রেটারী অব ষ্টেট, পি. সি. নক্স (P. C. Knox) মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের উপর মার্কিণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। এবারেও জাপান সরকার বাধাদান

করেন। মোট কথা, হ্যারিম্যান ও নক্সের রেলওয়ে সংক্রান্ত প্রস্তাব জাপান-মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে।

অপর দিকে, মাঞ্চুরিয়াতে পারস্পরিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে রাশিয়া ও জাপান ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একটি রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত করে। এই চুক্তিতে উভয়দেশই চীনের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বজায় রাখতে এবং চীনে মুক্তদ্বার নীতি মান্য করতে সম্মত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জাপান ও রাশিয়া একটি কনভেনসন স্বাক্ষরিত করে, যার শর্তানুসারে মাঞ্চুরিয়াতে স্বাক্ষরকারী উভয় দেশের স্ব স্ব এলাকা নির্ধারিত হয়, উভয় দেশই প্রতিশ্রুত হয় যে একে অপরের এলাকায় উন্নতিমূলক কার্যাদিতে হস্তক্ষেপ করবে না এবং যদি অপর কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে তাঁদের স্ব স্ব এলাকায় বিশেষ স্বার্থ বিঘ্নিত হয় তাহলে তারা সম্মিলিতভাবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কনভেনসনে চীনের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অক্ষুন্ন রাখার এবং চীনে মুক্তদ্বার নীতি অনুসরণের কোন উল্লেখ নাই।

চীন : মেজী জাপানের অর্থনীতি শিল্প-ভিত্তিক হওয়ায় জাপানে কয়লা ও লৌহ ধাতুর অভাব উত্তরোত্তর অধিকতর অনুভূত হয়। সে কালে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে চীনের মত লৌহ ও কয়লার সমৃদ্ধ দেশ আর ছিল না। এতদ্ব্যতীত চীনের ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারও ছিল এশিয়ার মধ্যে অগ্রগণ্য। তাই রুশ-জাপান যুদ্ধের পূর্ব থেকেই জাপানের তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল চীনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপান চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সুকৌশলে হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ গ্রহণে অধিকতর বদ্ধপরিকর হয়। জাপানের আদর্শ ছিল এশিয়া মহাদেশের অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ দেশ (Economic muscleman) হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করা। রুশ-জাপান যুদ্ধোত্তর যুগে জাপান চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায় সর্বপ্রথম ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, যখন জাপান চীন-বিপ্লবের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিপ্লবী সঙ্ঘকে আর্থিক সাহায্য দেয়। পুনরায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আদর্শে চীনের পুনর্গঠন শুরু হয়। এই পুনর্গঠনে সাহায্য দিবার অজুহাতে জাপান চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের পুনরায় সুযোগ পায়। জাপানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের জন্য জাপান সরকার চীনের ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানান। কুড়ি হাজার চৈনিক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার্থে জাপানে পাড়ি দেয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে জাপান বৃহত্তর সুযোগ পায় চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার। চীন সাময়িকভাবে যুদ্ধে নিরপেক্ষনীতি ঘোষণা করে। ইঙ্গ-জাপান চুক্তির শর্তানুসারে জাপান ইংলণ্ডের পক্ষে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে

১৫ই আগস্ট, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। ইংলণ্ডের মিত্র হিসাবে যুদ্ধে যোগদান করেই জাপান বার্লিণে শাংটুং চরমপত্র (Shantung ultimatum) প্রেরণ করে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শিমোনোসেকি সন্ধির পর কনসেসনের দ্বন্দ্বে যোগদান ক'রে জার্মানী তদানীন্তন চীন সরকারের কাছ থেকে শানটুংয়ের উপর ৯৯ বৎসরের ইজারা আদায় করে। চীনের পক্ষ অবলম্বন ক'রে জাপান ১৫ই অগাস্টের চরমপত্রে জার্মানীকে উপদেশ দেয় যেন ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে জার্মানী শানটুং প্রদেশটি চীনকে প্রত্যর্পণ করে। জার্মানী এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে যেন সাতদিনের মধ্যে একটি উত্তর প্রেরণ করে, অন্যথায় যুদ্ধের মাধ্যমে শানটুং অধিকার করা হবে—এ উপদেশ ও জাপান চরমপত্রে লিপিবদ্ধ করে। জার্মানী নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কোন উত্তর না দেওয়ায় জাপান ২৩শে অগাস্ট শানটুং আক্রমণ করে। তৎকালীন জাপানের মিনিস্টার-প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা ঘোষণা করেন যে জাপানের কোন রাজ্যজয়ের লিপ্সা নাই ; জাপানের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রাচ্যে শান্তি রক্ষা করা। শান্তিরক্ষার নামে জাপান চীনের নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য ক'রে শানটুং আক্রমণ করে এবং নভেম্বরের গোড়ার দিকে শানটুং এর সিংতাও (Tsingtao) বন্দর অধিকার করে। তারপর জাপান সমগ্র শানটুং প্রদেশটি স্বীয় অধিকারভুক্ত করে এবং সেখানকার রেলপথ অঞ্চলে জাপানী সামরিক পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে। যে শানটুং জাপান জার্মানীর অধিকার থেকে উদ্ধার করে চীনের হস্তে প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে, সেই শানটুং শেষপর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয় জাপান সাম্রাজ্যে।

একুশ-দফা দাবি ঃ

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে শানটুং প্রদেশ অধিকারের অব্যবহিত পরেই জাপান সরকার ১৮ই জানুয়ারী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে চীনের নিকট একুশ-দফা সম্বলিত একটি দলিল—অস্বাভাবিক দলিল—পেশ করেন। পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ যখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত এবং প্রাচ্যের রাজনীতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে অপারগ তখন জাপান সরকার সুযোগমত চীন সরকারের নিকট দাবি-গুচ্ছ পেশ করেন। তখন ওকুমা ছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী এবং ইউয়ান শিকাই চীনের প্রেসিডেন্ট। ইউয়ান শিকাই প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। পরন্তু তিনি চীনে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী তথা সচেষ্ট ও ছিলেন। কার্যতঃ তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে চীনের সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং তাঁর রাজত্বের নামকরণ করেন হুং-সিয়েন (Hung-hsien) বা মহান নিয়মতান্ত্রিক যুগ (Grand constitutional era)। ৬ই জুন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর অকাল মৃত্যু না হলে চীনের রাজনীতিতে কি ধরণের বিপর্যয় ঘটত তা

অনুমেয়। ১৮ই জানুয়ারী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাত্রির অন্ধকারে ওকুমা-মন্ত্রী-সভার এক সদস্য, হিয়োকি (Hioki) দলিলটি ইউয়ান শিকাই এর হস্তে অর্পণ করেন এবং দলিলে লিখিত দাবিগুলি সম্বন্ধে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেন।

চীনের প্রেসিডেন্টের উপর জাপান দ্বিবিধ চাপ সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ, যদি তিনি দাবিগুলি অগ্রাহ্য করেন তাহলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, জাপানে বহু চীনা নাগরিকের বসবাস। তাদের অধিকাংশই ছিলেন ইউয়ান শি কাই-এর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধী। ইউয়ান দাবি গ্রহণ না করলে জাপান সরকার জাপানে প্রবাসী চীনা নাগরিকগণকে আর্থিক তথা সামরিক সাহায্য দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উত্তেজিত করবেন। অন্যথায় দাবিগুলি গৃহীত হলে জাপান চৈনিক প্রেসিডেন্টকে চীনে রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সর্বপ্রকার সহায়তা দান করবে। ইউয়ান জাপানের নিকট নতি স্বীকার করেন।

একুশ-দফা দাবিগুলি নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) শানটুং সম্পর্কিত দাবি

(২) দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব অন্তর্মঙ্গোলিয়া-সম্পর্কিত দাবি

(৩) মধ্যচীনে কয়লা ও লৌহধাতু সম্পর্কিত দাবি

(৪) চীনের উপসাগর, বন্দর, তীরবর্তী দ্বীপ প্রভৃতি হস্তান্তরিত না-করা সম্বন্ধীয় দাবি

(৫) এমন কতকগুলি দাবি যেগুলি স্বীকার করে নিলে চীন সরকারও চীনের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রহিত হবে।

(১) শানটুং এর উপর জার্মানীর ইজারা জাপানের উপর বর্তাবে। ইজারার এই হস্তান্তরকরণে জার্মানী ও জাপানের মধ্যে যে সমস্ত চুক্তি হবে, সে সব চুক্তি চীনের স্বীকৃতি লাভ করবে। শানটুং-এর অন্তরবর্তী বা তীরবর্তী কোন অঞ্চল চীন কোন তৃতীয় শক্তিকে সমর্পণ করতে পারবে না বা ইজারা দিতে পারবে না। চীন শানটুং প্রদেশে জাপানকে রেলপথ সংক্রান্ত কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দান করবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বন্দর উন্মুক্ত করবে।

(২) জাপানের উপনিবেশ হিসাবে এবং জাপানের মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রহিসাবে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় জাপানের সংরক্ষিত অঞ্চল রূপে পরিগণিত হবে। অন্তর্মঙ্গোলিয়া জাপানের অন্তর্ভুক্ত ক'রে জাপানের উত্তর সীমানা সম্প্রসারিত করতে হবে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া তথা অন্তর্মঙ্গোলিয়ার রেলপথের উপর জাপানী ইজারার মেয়াদ ২৫ বৎসর থেকে ৯৯ বৎসর বর্ধিত করতে হবে। ঐ দুই অঞ্চলে বসবাসকারী জাপানী রেলকর্মীদিগকে তথা অন্যান্য বেসামরিক জাপানী নাগরিকদিগকে শুধু রেলপথ অঞ্চলে নয়, পরন্তু সর্বত্র

নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, যথা ভ্রমণের এবং বসবাসের সুযোগ, ব্যবসায়ের সুযোগ, শিল্পোন্নতি বা কৃষির উদ্দেশ্য জমি ক্রয়ের বা ইজারা গ্রহণের সুযোগ, বাণিজ্যের সুযোগ, এবং খনি খননের সুযোগ। চীনকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া এবং পূর্ব অন্তর্মঙ্গোলিয়াতে কোন বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগ করবার পূর্বে জাপানের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। চীনকে আরও প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে টোকিওর প্রাথমিক সম্মতি পাবার পর পেকিং অপর কোন রাষ্ট্রকে রেলপথ সম্পর্কিত কোন সুযোগ সুবিধা দিতে পারবে অথবা উক্ত দুই অঞ্চল থেকে প্রাপ্য রাজস্বের ভিত্তিতে অপর কোন রাষ্ট্র থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব অন্তর্মঙ্গোলিয়া সংক্রান্ত এই দাবিগুলি মেনে নেওয়ার পরিণতি হবে ঐ অঞ্চল দুটিতে জাপানের প্রভূত প্রভাব বৃদ্ধি, চীনের সার্বভৌমত্বের অবসান এবং মুক্তদ্বার নীতির প্রহসনে পর্যবসান।

(৩) হ্যান ইয়ে পিং (Han Yeh Ping) নামে একটি চৈনিক ব্যবসায়ী কোম্পানী মধ্যচীনে কয়লা ও লৌহধাতুর খনি পরিচালনা করত। জাপান দাবি জানায় যে এই খনিগুলিকে জাপান ও চীনের যৌথ প্রকল্প হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই প্রসঙ্গে জাপান জানায় যে জাপানের বিনা সম্মতিতে চীন এই কোম্পানী-সংক্রান্ত কোন অধিকার হস্তান্তর করতে পারবে না; কোম্পানীর অনুমতি ব্যতীত চীন অপর কোন রাষ্ট্রকে কোম্পানীর অধীন খনিগুলির সন্নিকটে অন্য কোন খনি খনন করতে অনুমতি দেবে না; প্রয়োজনীয় সম্মতি না পেলে অপর কোন রাষ্ট্র খনি সংক্রান্ত এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে না যাতে পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে হ্যান ইয়ে পিং কোম্পানীর স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে। জাপানের এই সকল প্রস্তাবে চীনের সম্মতি দানের অর্থ মধ্যচীনে ইয়াংৎজী (Yangtze) উপত্যকায় শিল্পসংক্রান্ত ব্যাপারে জাপানকে মধ্যমণি করা। কোম্পানীটি তখন অর্থনৈতিক দুরবস্থার কবলে। তাই কোম্পানীটিকে জাপানের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। স্বাভাবিক কারণেই কোম্পানীটির উপর জাপানের প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই সুযোগে জাপান কোম্পানীর উপর স্বীয় নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত ক'রে নিজস্ব কয়লা ও লৌহের অভাব পূরণে তৎপর হয়।

(৪) জাপানের দাবি, চীন যেন কোন পাশ্চাত্য শক্তির হস্তে চীনের কোন উপসাগর, বন্দর, বা চীনের তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত কোন দ্বীপ অর্পণ না করে। এ হেন দাবির মূলকথা হচ্ছে, এশিয়ার দরজা যেন ইউরোপের কাছে রুদ্ধ থাকে। ফলতঃ এ দাবি জাপান কর্তৃক এশীয় মনরো ডকট্রিণ ঘোষণার দাবি।

(৫) জাপান দাবি জানায়, চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সামরিক

ব্যাপারে জাপানী উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন; চীনের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে মোতায়েন পুলিশবাহিনীর উপর চীন-জাপান উভয় দেশের যৌথ নিয়ন্ত্রণ থাকবে; চীন যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের ৫০ শতাংশ বা ততোধিক অংশ জাপান থেকে ক্রয় করবে; চীনে একটি যৌথভাবে নিয়ন্ত্রিত অস্ত্রাগার থাকবে যেখানে বিশেষজ্ঞ হবেন জাপানী এবং সেখানে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ আমদানি করা হবে জাপান হতে; চীনের অভ্যন্তরে জাপানীদের জন্য হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্ম-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জমি দিতে হবে; ধর্মপ্রচারে স্বাধীনতা থাকবে; জাপানের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন আলোচনা না ক'রে ফুকিয়েনের (ফরমোজার বিপরীত দিকে অবস্থিত) উন্নতিকল্পে চীন কোন বৈদেশিক মূলধন আমদানি করতে পারবে না।

উপরে আলোচিত জাপানের দাবিগুলি যে চীনের পক্ষে অসম্মানজনক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তথাপি জাপানের দাবিগুলি চীন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি। প্রথমতঃ, চীনা সরকার বিভিন্ন দাবির উপর পৃথক পৃথক আলোচনার প্রস্তাব করেন কিন্তু জাপান সে প্রস্তাবে সম্মত হয় না। অবশেষে ৭ই মে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনকে একটি চরম পত্র প্রেরণ করে, এই মর্মে যে বিনা আলোচনাতেই দাবিগুলি মেনে না নিলে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত সূচক রণতরী ও কামানের জলছাপ প্রদত্ত কাগজের উপর চরম পত্রটি লিখিত হয়। ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত প্রেসিডেন্ট ইউয়ান সি কাই জাপানের প্রস্তাবে সম্মতি দান ক'রে ২৫শে মে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের সঙ্গে কয়েকটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করেন এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি 'নোটের' (ক্ষুদ্র পত্রের) আদান-প্রদান করেন। এই সব চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ক'রে এবং 'নোট' আদান প্রদান ক'রে চীন সরকার প্রথম চারটি শ্রেণীর দাবিগুলিতে সম্মতি দান করেন। পঞ্চম শ্রেণীর দাবিগুলি ভবিষ্যতে বিবেচ্য হবে ব'লে স্থির হয়। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ মন্ত্রী স্যার জন জরড়ান (Sir John Jordan) মন্তব্য করেন—চীনের প্রতি জাপানের এই আচরণ বেলজিয়ামের প্রতি জার্মানীর আচরণ অপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণ্য।

একুশ-দফা দাবির অধিকাংশই চীন সরকার মেনে নিতে স্বীকৃত হওয়ার পর জাপান দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের সঙ্গেও দাবিগুলি সম্পর্কে বোঝাপড়া করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাপান ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কতকগুলি চুক্তি সম্পাদিত করে। ইংলণ্ডের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ইংলণ্ড শানটুং এর উপর জাপানের অধিকার স্থাপনে স্বীকৃতি দান করে, অপর পক্ষে জাপানও বিষুবরেখার উত্তরস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহের উপর ইংলণ্ডের অধিকার স্থাপনে সম্মতি দান করে। এই দ্বীপপুঞ্জ ও শানটুং

প্রদেশ উভয়ই পূর্বে জার্মানীর অধিকারভুক্ত ছিল। ফ্রান্স ও ইটালির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ইটালি ও ফ্রান্স চীনের উপর জাপানের দাবিগুলি মেনে নিতে সম্মত হয়, এই সর্তে যে জাপান চীনের উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে চীনকে তাঁদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করতে উৎসাহিত করবে। একুশ-দফা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্যের স্থিতাবস্থায় যে সব পরিবর্তন ঘটে রাশিয়া সে সব মেনে নিতে সম্মত হয়। অপর পক্ষে, জাপানও ১৯১২-১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহির্মঙ্গোলিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতিতে স্বীকৃতি দান করে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এক চুক্তি যা পরিচিত হয় লানসিং ইসাই চুক্তি (Lansing-Ishii Agreement) নামে। ভাইকাউন্ট ইসাই এর অধিনায়কত্বে একটি জাপানী কমিশন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করে। উক্ত চুক্তিটি এই পরিদর্শনের ফলশ্রুতি। এই চুক্তিদ্বারা যুক্তরাষ্ট্র শানটুং-এর উপর জাপানেব অধিকার মেনে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তিতে ভৌগোলিক নৈকট্য হেতু জাপান চীনে বিশেষ অধিকার দাবি করতে পারে। পরে একটি গোপন 'নোটের' মাধ্যমে লানসিং জাপানকে একটু সংযত করবার উদ্দেশ্যে অবহিত করে যে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চীনে জাপানের পক্ষে এমন সব অধিকার দাবি করা উচিত হবে না যার ফলে চীনস্থিত অপরাপর মিত্ররাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

এইভাবে একুশ-দফা দাবির ফলে চীনের উপর জাপানের প্রভুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের উপর জাপানের এই প্রভাব বিস্তারে স্বীকৃতি দান করে। জাপানের জয় পতাকা প্রাচ্যের গগণে সগৌরবে উড্ডীন হয়।

মূলতঃ দাবিগুলি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল। এই দাবিগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানের বৈদেশিক নীতিতে রাজ্যজয়ের লিপ্সা অপেক্ষা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভই অধিকতর গুরুত্ব পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় জাপানের শিল্পে বিশেষ উন্নতি ঘটে। তখন জাপানে সামরিক ও বে-সামরিক শিল্পজাত দ্রব্যাদির চাহিদা প্রভূতভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে জাপানে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই সব শিল্পোৎপাদনের উপযোগী খনিজ দ্রব্যাদির সরবরাহ একুশ-দফা দাবির মাধ্যমে অনেকটা সহজসাধ্য হয়। ওকুমা সরকার জনপ্রিয়তা লাভ করে।

চীনে একুশ-দফা দাবিগুলি রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। চীনা জনসাধারণ এই সব দাবি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই দাবিগুলি বাতিল করবার জন্য চীনে জাপান-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের ব্যয় সঙ্কুলনার্থে একটি অর্থনৈতিক ভাণ্ডার স্থাপিত হয়, নাম ন্যাশনাল স্যালভেশন ফাণ্ড (National Salvation Fund)। এই ভাণ্ডারটি

ছিল সর্বশ্রেণীর আর্থিক সাহায্যে পুষ্ট। প্রেসিডেণ্ট ইউয়ান সি কাই কিছুটা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশায় এবং কিছুটা শুকুমা সরকারের চাপে চীনাজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে একুশ-দফা দাবিগুলি গ্রহণে সম্মত হন। ইউয়ান সি কাই এর মৃত্যুর পর পুনঃপ্রবর্তিত প্রজাতন্ত্র সরকার দাবিগুলি বাতিল ব'লে ঘোষণা করেন, মূলতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ, দাবিগুলি চীনজনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক তৎকালীন প্রেসিডেন্টের নিকট হতে আদায় করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, দাবিগুলি চীনের সংসদ অনুমোদন করে নি। নূতন চীন সরকারের বিরুদ্ধ মনোভাবে হতোদ্যম না হয়ে জাপান দাবিগুলি পূরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যে কয়েকটি দাবি গৃহীত হয় নি সে গুলিও যাতে গৃহীত হয় তজ্জন্য চাপ দিতে থাকে। ফলে মাঞ্চুরিয়াতে চীনা অধিবাসী ও জাপানীদের মধ্যে ক্রমাগতই বিরোধ চলতে থাকে। অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনাও ঘটে। এরূপ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে চেংচিয়াতুনে (Chengchiatun) এ, যখন একটি জাপানী পুলিশ একটি চীনা পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রেতার বিপনী থেকে কিছু দ্রব্য বিনামূল্যে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। এইভাবে যে গোলমালের সৃষ্টি হয় তাতে উভয় দেশের সৈন্যগণ যোগদান করে। ফলে জাপান চীনের উপর অধিকতর চাপ সৃষ্টি করে এবং চীনকে আরও কিছু দাবি মেনে নিতে বাধ্য করে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চীনে জাপান-বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়। জন-সমাবেশ, হরতাল, জাপানী দ্রব্য বয়কট এবং প্রতিবাদমূলক বক্তৃতাদির মাধ্যমে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। লিয়াং চি চাও প্রভৃতি লেখকের লেখনী চালনা এই আন্দোলনকে ক'রে তোলে অধিকতর জোরদার। চীনের রাজ-নীতিতে এই কালে এক নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। এই নৈরাশ্য ছিল তু-চুনদের (Tu Chun বা War Lord বা Military Governor, সামরিক শাসনকর্তা) আবির্ভাব-প্রসূত। দশবৎসর কাল (১৯১৭—১৯২৭), মতান্তরে বার বৎসর কাল (১৯১৬—১৯২৮), তু-চুনদের হস্তেই চীনের সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা সীমিত থাকে। এই সমস্ত সামরিক শাসনকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মাঞ্চুরিয়ার শ্যাং শো লিন (Tsang Tso—Lin), মধ্য চীনের উ পি—ফু (Wu Pei—Fu), এবং ফেং ইউ—সিয়াং (Fing Yu—Hsiang)। ইয়ান সি কাই অভিহিত হতেন তু-চুনদের জনক হিসাবে। তু-চুনদের ক্ষমতাসীন থাকাকালীন প্রজাতন্ত্র নামমাত্রে পর্যবসিত হয়।

চীন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের চরম পত্র ভুলতে পারে নি। সমগ্র চীনা জাতির প্রতি অপমান জনক চরম পত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে চীনের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সম্মিলিতভাবে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনে

-মে ফোর্থ মুভমেন্ট (May Fourth Movement) নামে খ্যাত। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীরা ঐ দিনটি জাতীয় অবমাননা-সূচক দিবস (National Humiliation Day) হিসাবে পালন করে। এই আন্দোলন চীনের জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি করে। চীনে যেন এক নবযুগের আবির্ভাব সূচিত হয়, যে যুগ সিন চাও (Hsin Chao বা New Tide) এর যুগ হিসাবে চিহ্নিত হয়। হাটে, বাজারে, দেবালয়ে, সর্বত্র জনগণের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, দক্ষিণ চীনে নাগরিক শিক্ষাপ্রসার সম্পর্কিত অভিযান সুরু হয়। চীনের জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনধারা যেন এক নবরূপ পরিগ্রহ করে। রাজনৈতিক জীবনে কিন্তু তখনও তু-চুনদের প্রতিক্রিয়াশীল আধিপত্য বিরাজমান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হলে চীন প্রথমে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নিরপেক্ষতা নীতি বর্জন ক'রে চীন জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। আশা ছিল, মিত্রশক্তি জয়ী হ'লে চীন সুবিচার পাবে এবং চীনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। যুদ্ধান্তে মিত্রশক্তি জয়লাভ করে। ১৮ই জানুয়ারী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিস শহরে শান্তি সম্মেলনের অধিবেশন হয়। চীন সরকারের দুজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁরা দাবি করেন, চীনকে শানটুং প্রদেশ প্রত্যর্পণ করতে হবে, চীনস্থ বিদেশীদের অতিরাষ্ট্রিক ক্ষমতার বিলোপ ঘটাতে হবে, শুল্ক নীতি নির্ধারণে চীনকে পূর্ণ অধিকার দিতে হবে, বিদেশী প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলি বাতিল ক'রে দিতে হবে, বিদেশী সৈন্য অপসারিত করতে হবে, বিদেশী ডাক ও তার বিভাগের অফিসগুলি বন্ধ ক'রে দিতে হবে এবং বিদেশীদের অবৈধ অধিকার সমূহ বিলুপ্ত করতে হবে।

কিন্তু চীনের কোন দাবিই সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হয় না। শান্তি-বৈঠকের প্রতিনিধিদের কমণ্ডলু থেকে এক বিন্দু ও শান্তিবারি চীনের উপর বর্ষিত হয় নি। শানটুং জাপানের অধীনেই থেকে যায়। জাপান চীনকে মৌখিক আশ্বাস দেয়, শানটুং-এর উপর জাপান অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করবে কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার থাকবে চীনের হাতে। কিন্তু অর্থনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত থেকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির অর্থ সারাংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে অসারে তৃপ্ত থাকার মত। ক্ষুব্ধ চীনা প্রতিনিধিরা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না ক'রেই রিক্তহস্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অপর দিকে জাপানী প্রতিনিধিরা প্রত্যাবর্তন করেন সাফল্য মণ্ডিত হয়ে। ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের সাম্রাজ্য গঠনে যে জয়যাত্রা শুরু হয় তার প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৯ খৃষ্ট অপাতদৃষ্টিতে জাপানের জয় সূচিত হলেও জাপান বিরোধী শক্তি সমূহের, বিশেষতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের, হিংসার পাত্র হয়ে ওঠে। তার প্রমাণ মেলে ওয়াশিংটন সম্মেলনে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঘটনা প্রবাহ (১৯২১—৩৬)

ওয়াশিংটন সম্মেলন—মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণ—সামরিক শাসন।

ওয়াশিংটন সম্মেলন (Washington Conference

(১২ নভেম্বর ১৯২১—২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের (১৮৯৪—৯৫) অবসানের পর থেকে প্যারিস শান্তি সম্মেলন (১৯১৯) পর্যন্ত জাপানের বৈদেশিক নীতিতে চমকপ্রদ সাফল্য জাপানকে পাশ্চাত্য দেশগুলির ঈর্ষার পাত্র ক'রে তোলে। সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্য দেশগুলির মতে দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে জটিলতা সৃষ্টির জন্য একমাত্র জাপানই দায়ী। অপর পক্ষে জাপানের বিবেচনায় এই জটিলতার জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলির দায়িত্ব কম নয়, অথচ তাঁরা সব দায়িত্ব এড়াতে চান, যেন যত দোষ সীজারের এবং ব্রুটাশই একমাত্র মাননীয় ব্যক্তি। এইভাবে যখন পাশ্চাত্য দেশগুলি এবং জাপান পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপে ব্যস্ত থাকে তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানের অগ্রগতি রোধের মানসে ওয়াশিংটনে একটি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং মূলতঃ জাপানের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং সে ক্ষমতা সীমিত করার প্রয়োজনীয়তা তথা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে ক্রমঃবর্ধমান বৈরিতা—এই সব উপাদান মিলিতভাবে ওয়াশিংটন সম্মেলনের পটভূমিকা রচনা করে।

যখন ওয়াশিংটন সম্মেলন আহূত হয় তখন জাপান দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ১৮৯৫—১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পঁচিশ বৎসরে জাপান চীনকে যুদ্ধে পরাভূত করে, ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়, রাশিয়ার মত বিশাল শক্তিকে ধরাশায়ী করে, চীনের উপর একুশ-দফা দাবী পেশ ক'রে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করে এবং প্যারিস শান্তি সম্মেলনে যোগদান ক'রে প্রথম সারির রাষ্ট্রের গৌরব অর্জন করে। জাপানের সাম্রাজ্যবাদিতার এক নূতন 'ডাইমেনশন' সংযোজিত হয়। চীনের নিকট থেকে ফরমোজা ও কোরিয়া, রাশিয়ার নিকট থেকে দক্ষিণ সাখালিন ও মাঞ্চুরিয়া, এবং জার্মানীর নিকট থেকে শানটুং লাভ ক'রে জাপান তার সাম্রাজ্য গঠনে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এই সব অধিকৃত এলাকা শুধু যে জাপান সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করে তা নয়, জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতিও ত্বরান্বিত করে।

কোরিয়ার সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যিক সম্পর্কে জাপান লাভবান হয়। কোরিয়া থেকে আমদানি-করা চাউল জাপানীদের প্রধান খাদ্যের অভাব পূরণ করে। মাঞ্চুরিয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার, মাঞ্চুরিয়ার খনিজ সম্পদ জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রভূতভাবে সহায়তা করে। অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চল থেকেও জাপানের আয় বৃদ্ধি পায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জাপান এইভাবে দূরপ্রাচ্যে একটি কর্তৃত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সাখালিনের উত্তরে ওখোটস্ক সাগর (Sea of Okhotox), ভ্লাডিভস্টকের দক্ষিণে জাপান সাগর (Sea of Japan) এবং কোরিয়ার দক্ষিণস্থিত ইয়েলো সাগর (Yellow Sea)—সবই তখন জাপানের নিয়ন্ত্রাধীন। এই তিনটি সাগরের উপর জাপানের একচ্ছত্র আধিপত্যের ফলে চীনের সঙ্গে জাপানের সংযোগস্থাপন সহজসাধ্য হয়। অধিকন্তু মাঞ্চুরিয়ার উত্তরে আমুর নদীর (Amur River) উপর প্রভাব-বিস্তার জাপানের বাণিজ্যিক উন্নতির সহায়ক হয়। কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও শানটুং এর উপর আধিপত্য হেতু জাপানের পক্ষে পেকিং এর উপরও প্রভাব-বিস্তার সুগম হয়। দূরপ্রাচ্যে জাপানের এ হেন কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানের শক্তি খর্ব করতে বদ্ধপরিকর হয়। সুতরাং জাপান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

জাপান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘর্ষ ঃ

কমোডোর পেরির অভিযানের পরবর্তী কয়েক বৎসর জাপান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণই ছিল। দূরপ্রাচ্যে ভূখণ্ড অধিকারে বা প্রভাবাধীন এলাকাস্থাপনে যুক্তরাষ্ট্রের আদৌ আগ্রহ ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র ভূখণ্ড-বিভাজনের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় নি। দূরপ্রাচ্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদেশী শক্তির মত অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রেরও অতিরাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধা ছিল। এতদ্ব্যতীত সন্ধিপত্র দ্বারা নির্ধারিত কিছু কিছু পণ্যশুল্ক সংক্রান্ত সুবিধাও যুক্তরাষ্ট্র ভোগ করত। অন্য কোন প্রকার বিশেষ সুবিধা আদায়ে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহান্বিত ছিল না। সে ক্ষেত্রে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের বিরোধ সৃষ্টির কোন অবকাশ না থাকারই কথা। রুশ-জাপান যুদ্ধের পূর্বে উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। এই বাণিজ্যিক লেন-দেন উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী-সম্পর্কেরই পরিচায়ক। কিন্তু এই সম্পর্কে চির দেখা যায় রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়ের পর। পোর্টস্মাউথ সন্ধির পরবর্তী বৎসর-গুলিতে যে ভাবে জাপানের সাম্রাজ্যবাদিতা ও জঙ্গীভাব বৃদ্ধি পায় তাতে যুক্তরাষ্ট্র আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্র দূরপ্রাচ্যে মুক্তদ্বার নীতির সমর্থক ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পরে যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা হয়, জাপান তার অধিকার-ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে মুক্তদ্বার নীতি বাতিল ক'রে দিতে পারে। ইঙ্গ-জাপান চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ইংলণ্ড জাপানের বিরোধিতা করতে পারে না। তাই

যুক্তরাষ্ট্রকেই শেষ অবধি জাপানী শক্তিকে খর্ব করবার গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়। জাপানও বুঝতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী-রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণে তৎপর। ফলে যুক্তরাষ্ট্র-জাপান সম্পর্কে তিক্ততা শুরু হয়। ঘটনাচক্রে এই তিক্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। অভিবাসন সমস্যা (Immigration Question) এই তিক্ততা বৃদ্ধির সহায়ক হয়।)

(শিল্প-বিপ্লব বা শিল্প-বিবর্তন শুধুমাত্র ইউরোপকে নয়, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রকেও প্রভাবান্বিত করে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপের মত, যুক্তরাষ্ট্রেও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন পদ্ধতিতে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। বৃহদায়তন শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। এই বৃহদায়তন শিল্পের অন্যতম উপাদান শ্রম। প্রয়োজনমত শ্রমিকের অভাবে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়। আবার, শিল্পপতিদের লক্ষ্য থাকে স্বল্পতম মজুরীতে শ্রমিক নিয়োগ ক'রে মুনফার বহর বৃদ্ধি করার দিকে। ঊনবিংশ শতকের শেষে প্রশান্তমহাসাগরের উপকূলবর্তী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্টেটগুলিতে (যথা ক্যালিফর্ণিয়া) শ্রমিকের অভাবে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়। শ্রমিকের অভাব ঘটে বিশেষতঃ যখন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস আইনতঃ চীনা শ্রমিকদের নিয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে বিংশ শতকের প্রথম থেকে জাপানী শ্রমিক দলে দলে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী স্টেটগুলিতে রুটির সন্ধানে পাড়ি দিতে থাকে। স্থানীয় সরকার তাদের স্বাগত জানায়, মূলতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ, জাপানী শ্রমিক খুবই শ্রমশীল, কর্মপটু ও নির্ভরযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ, জাপানী শ্রমিকের মজুরী শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের মজুরীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় জাপানী শ্রমিকের নিয়োগে শিল্পপতির মুনফা বৃদ্ধি পায়। জাপান সরকারও জাপানী শ্রমিকদের আমেরিকায় পাড়ি দিতে উৎসাহিত করে, মূলতঃ দুটি কারণে, যথা দেশে খাদ্য সমস্যার কিছুটা সমাধান সাধন এবং দেশে বাসোপযোগী স্থানের অভাব দূরীকরণ। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলবর্তী রাষ্ট্রসমূহে জাপানী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর থেকে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জাপানী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ২৪ হাজারের কিঞ্চিদধিক। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭২ হাজার। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তাদের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় লক্ষাধিক। যুক্তরাষ্ট্রে তখন শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় পীতাঙ্গদের জনসংখ্যা অতি নগণ্য ছিল কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের মনে ভীতির সঞ্চার হয় যে কালক্রমে পীতাঙ্গদের জনসংখ্যা প্রভুতভাবে বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে হয়ত তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করতে পারে। অধিকন্তু স্বল্প মজুরীতে তুষ্ট লক্ষ লক্ষ জাপানী শ্রমিক সহজ লভ্য হলে মার্কিন শিল্পপতিরা অধিক মজুরীর বিনিময়ে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক নিয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে। এর পরিণামে

শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মধ্যে বেকার অবস্থা-জনিত বিক্ষোভ দেখা দেবে। জাপানীদের সংখ্যাধিক্যের আরও একটা দিক শ্বেতাঙ্গদের চিন্তিত করে। তাঁদের বিবেচনায় জাপানীরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নিম্নমানের। জাপানীদের সংস্পর্শে তাদের জাতীয় আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হবে। অতএব যুক্তরাষ্ট্রবাসী শ্বেতাঙ্গগণ দাবি জানান যে জাপানীদের শ্রমিক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চিকাগোতে একটি শ্রমিক সম্মেলনের (Labour Convention) অধিবেশন হয়। সেই সম্মেলন কর্তৃক নিয়োজিত কমিশন জাপানী অভিবাসন সমস্যা পর্যালোচনা ক'রে জাপানী শ্রমিকের প্রবেশের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সানফ্রানসিসকোতে জাপানী ও কোরিয়ার অধিবাসীদের আমেরিকা থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি লীগ গঠিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সানফ্রানসিসকো স্কুল বোর্ড এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে প্রাচ্য দেশ থেকে আগত ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাগ্রহণ করবে কেবলমাত্র প্রাচ্যদেশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষায়তনে। জাপানী সরকার এ হেন অপমানসূচক বৈষম্যমূলক প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট জাপানী শ্রমিকদের অভিবাসন বন্ধ করার আশ্বাস দিয়ে উক্ত প্রস্তাবটি বাতিল করেন। এই আশ্বাসের ফলশ্রুতি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের Gentleman's Agreement. এই এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী জাপানী শ্রমিকদিগকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেবার ছাড়পত্র দান না করতে জাপান সরকার সম্মত হন। উক্ত একই এগ্রিমেন্টে হাওয়াই (Hawaii) এবং মেক্সিকোতেও (Mexico) জাপানী শ্রমিকদের ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি দেবার সুযোগ না দিতে জাপান সরকার স্বীকৃত হন। যদিও জাপান সরকার ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের এগ্রিমেন্ট কার্যকরী করতে নিষ্ঠা এবং কর্তব্যবোধের পরিচয় দেন, তথাপি ক্যালিফর্ণিয়ার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা দাবি জানান যে জাপানী শ্রমিকদের আগমন বিধিবদ্ধভাবে বন্ধ করতে হবে। ফলে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয় ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট (Immigration Act)। জাপানীদের জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের মাধ্যমে জাপানের উপর ক্রমঃবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ হ্রাসের যে সম্ভাবনাটুকু দেখা দিয়েছিল তা অন্তর্হিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিপাইনস অধিকারে এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হাওয়াই-এর অন্তর্ভুক্তিতে বহু পূর্বেই এই তিক্ততার আভাস পাওয়া যায়।)

(জাপান-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এইভাবে যে তিক্ত বিরোধ শুরু হয় তাতে ইন্ধন যোগায় আমেরিকার পুঁজিপতিদের চীনে মূলধন বিনিয়োগের প্রচেষ্টা। চীনের রেলপথগুলিতে মূলধন বিনিয়োগ ক'রে যুক্তরাষ্ট্র চীনের অর্থনীতির উপর

প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথ-বিশারদ হ্যারিম্যান দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের উপর যাতে ইজারা পান তজ্জন্য জাপান সরকারের কাছে আবেদন করেন। হ্যারিম্যানের পরিকল্পনা ছিল ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের উপর অধিকার লাভ করা, আতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয়কে বাষ্পীয় পোত দ্বারা বেষ্টন করা এবং এইভাবে বিশ্বব্যাপী একটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করা। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের উপর ইজারা গ্রহণ সম্পর্কে ইটো ও হ্যারিম্যান একটা মতৈক্যে উপনীত হন কিন্তু জাপানের রাষ্ট্রদূত কাউন্ট কোমুরার বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত ইটো-হ্যারিম্যানের মতৈক্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পাঁচ বৎসর পর যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় চেষ্টা করে যাতে শুধু দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার নয়, সমগ্র মাঞ্চুরিয়ার রেলপথগুলি যুক্তরাষ্ট্রের কুক্ষিগত হয়। সেই উদ্দেশ্যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন মার্কিণ সেক্রেটারী অব ষ্টেট পি সি নক্স মাঞ্চুরিয়ার রেলপথগুলি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব করেন : সর্বপ্রথম একটি আন্তর্জাতিক সিণ্ডিকেট গঠন করতে হবে। তারপর চীন সরকার যাতে চীনস্থ জাপানী ও রুশ রেলপথগুলি জাপান ও রাশিয়ার কাছ থেকে ক্রয় করে নিতে সমর্থ হয় তজ্জন্য নবগঠিত সিণ্ডিকেট চীন সরকারকে ঋণদান করবে। জাপান ও রাশিয়ার নিকট হতে চীন মূল্যের বিনিময়ে রেলপথগুলি পুনরধিকার করলে রেলপথগুলি নিরপেক্ষ হিসাবে গণ্য হবে এবং যতদিন পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না হয় ততদিন রেলপথগুলি আন্তর্জাতিক রেলপথ হিসাবে গণ্য হবে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে যুক্তরাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক সিণ্ডিকেটের প্রধান সভ্য হিসাবে ঋণের বৃহদংশ বহন করবার এবং পরোক্ষভাবে চীনের রেলপথগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করবার সুচতুর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরূপ পরিকল্পনায় জাপানের আতঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ইংলণ্ডের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের উপরোক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। জাপান আশ্বস্ত হয়। তৎসত্ত্বেও পরিকল্পনাটির মাধ্যমে জাপানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যে মনোভাব পরিস্ফুট হয় তাতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ততরই হয়। ইংলণ্ডের সুচিন্তিত মতে, মাঞ্চুরিয়া অ-জাপানী মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্র নয়; পরন্তু রেলপথ উন্নয়নের তথা মূলধন বিনিয়োগের দিক থেকে মাঞ্চুরিয়া গণ্য হবে জাপানের সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে।)

(লানসিং-ইশাই চুক্তি (১৯১৭) সাময়িকভাবে দুটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে তিক্ততা কিছুটা হ্রাস করে। এই চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করে যে ভৌগোলিক নৈকট্য হেতু জাপানের চীনের উপর বিশেষ অধিকার থাকবে। কিন্তু দুটি দেশের প্রেস (সংবাদপত্র) চুক্তিটিকে স্বাগত জানায় নি। দেশের জনগণের ধারণায় উভয় দেশের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় পরস্পরকে অত্যধিক

সুযোগ দান ক'রে একে অপরের নিকট নতি স্বীকার করেছে। সুতরাং লানসিং-ঈশাই চুক্তিটি উভয় দেশের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধিই করে।

জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নৌবহর গঠনের প্রয়াসে এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপান চুক্তি বাতিলে অনিচ্ছা প্রকাশে যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে একটি সম্মেলন আহ্বান ক'রে জাপানের নৌশক্তি খর্ব করতে হবে, যাতে জাপানের সাম্রাজ্যবাদিতা তথা জঙ্গীবাদের জোয়ারে ভাটা পড়ে।

তৎকালীন মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং (Harding) ওয়াশিংটনে সম্মেলন আহ্বান করেন ১২ই নভেম্বর, ১৯২১ খৃষ্টাব্দ। সম্মেলনের অধিবেশন চলে ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। রাশিয়া ব্যতীত অপর সকল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বলসেভিক বিপ্লবের পর নবজাত সোভিয়েত রাশিয়া সম্মেলনের তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় নি। সেই কারণে বোধ হয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানায় নি।

এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যগুলি ছিল : (১) নৌশক্তি সমূহের নৌবাহিনী ও জলযুদ্ধোপকরণ সীমিত করা, (২) ইঙ্গ-মার্কিণ সম্পর্ক নিরূপণ করা, (৩) চীন-জাপান সম্পর্ক নির্ধারিত করা এবং (৪) প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহের পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সুবিবেচনা করা। এই সব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সম্মেলনে তিনটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়—চতুঃ-শক্তি সন্ধি (Four-Power Treaty), পঞ্চঃ-শক্তি সন্ধি (Five-Power Treaty) এবং নব-শক্তি সন্ধি (Nine-Power Treaty)।

চতুঃ-শক্তি সন্ধি : এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি ছিল ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ফ্রান্স। এই সন্ধিটি প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি চুক্তি-বিশেষ (Agreement)। ইহা স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলিকে কোন মৈত্রী বন্ধনে (Alliance) আবদ্ধ করে নি। এই চুক্তিটির উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমূহের স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষা করা এবং পরস্পরের মধ্যে কোন বিবাদ বা বিরোধ দেখা দিলে সেই বিবাদ বা বিরোধের মীমাংসার জন্য একটি পদ্ধতির নির্দেশ দেওয়া; অপি চ রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের প্রত্যেকে প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপগুলির উপর পারস্পরিক অধিকারে স্বীকৃতি দান করবে এবং কেহই দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবেন না। এই চুক্তিটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ-সম্পর্কিত একটি ঘোষণাপত্র সংযোজিত হয়। এই ঘোষণাপত্র অনুসারে, প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার তত্ত্বাবধানে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির (Mandates) সঙ্গে মার্কিণ সরকারের কোন পৃথক চুক্তি সম্পাদিত করতে বাধা থাকবে না। ঘোষণাপত্রে এরূপ নির্দেশও থাকে যে চতুঃশক্তি চুক্তিতে যে ধরণের বিরোধের উল্লেখ আছে তাহা কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিবাদ বা বিরোধ থেকে পৃথক

হিসাবে গণ্য হবে। এরূপ আভ্যন্তরীণ বিবাদের মীমাংসার জন্য অপর কোন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে অভিবাসন সমস্যা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা আন্দোলন-সংক্রান্ত ব্যাপার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হবে এবং এরূপ ব্যাপারে অপর কোন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ঐতিহাসিক ই. এইচ কার (E. H Carr) এই চুক্তিটির দ্বিবিধ গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, জাতিসংঘ বর্জনের পর এই সর্বপ্রথম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্পে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনায় যোগদানে সম্মত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বহুবিতর্কিত ইঙ্গ-জাপান চুক্তিটি বাতিল হয়। সেই সঙ্গে ল্যান্সিং ইশাই চুক্তিটিরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

পঞ্চ-শক্তি সন্ধি: এই সন্ধি স্বাক্ষরিত করে পাঁচটি রাষ্ট্র—ইংলন্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইটালী ও ফ্রান্স। এই সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল জলযুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ সীমিত করা, বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নৌশক্তির সমতা প্রবর্তন করা, এবং জাপানের যুদ্ধোপযোগী নৌবাহিনীর শক্তি স্থিরীকৃত করা। আসল উদ্দেশ্য ছিল জাপানের নৌশক্তি হ্রাস করা। স্বাক্ষরকারী পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকে কে কত টন ওজনের যুদ্ধ জাহাজ রাখতে পারবে, নৌযুদ্ধের উপকরণাদি কি পরিমাণে সীমিত হবে ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর সম্মেলনে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে মার্কিণ সেক্রেটারি অব স্টেট হিউজ (Hughes) যে সমস্ত প্রস্তাব করেন, সেই সব প্রস্তাবই শেষ অবধি গৃহীত হয়। হিউজের প্রস্তাবগুলি ছিল: (১) বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকে ৫,২৫,০০০ টন পর্যন্ত যুদ্ধ জাহাজ (Capital ship) রাখতে পারবে; (২) জাপানের যুদ্ধোপযোগী নৌবাহিনীর সর্বাধিক শক্তি হবে বৃটিশ বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত নৌবাহিনীর ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ৩,১৫,০০০ টন, (৩) ফ্রান্স ও ইটালীর সর্বাধিক নৌশক্তি সীমিত হবে বৃটিশ বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির ৩৫ শতাংশ বা ১,৭৫,০০০ হাজার টন। ফলে যুক্তরাষ্ট্র, ইংলন্ড, জাপান, ইটালী ও ফ্রান্সের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ যুদ্ধোপযোগী নৌবাহিনীর শক্তির অনুপাত দাঁড়ায় ৫ : ৫ : ৩ : ১,৭৫ : ১.৭৫; (৪) হাল্কা দ্রুতগামী রণপোত (Light cruiser), জাহাজ-বিধ্বংসী রণপোত (Destroyer), ডুবো জাহাজ বা অন্য কোন সহায়ক পোতের উপর সীমারেখা টানা হবে না; (৫) প্রশান্তমহাসাগরের অধিকাংশ দ্বীপপুঞ্জে আত্মরক্ষামূলক দুর্গনির্মাণে এবং নৌঘাঁটি নির্মাণে স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে; (৬) সিঙ্গাপুরের পূর্বে এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে কোন ইঙ্গ-মার্কিণ নৌঘাঁটি সম্প্রসারিত করা হবে না।)

ইংলন্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোপযোগী নৌশক্তির তুলনায় জাপানের নৌশক্তি

এইভাবে যথেষ্ট হ্রাস পেলেও ইংলন্ড বা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একক শক্তিতে জাপানকে জলযুদ্ধে পরাস্ত করা সম্ভব নয়—ইহাই ছিল তৎকালীন নৌযুদ্ধে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

এরূপ বিশেষজ্ঞের মতে কোন রাষ্ট্রের নৌবল জাপানের নৌবলের দ্বিগুণ না হলে সে রাষ্ট্রের পক্ষে জাপানকে জলযুদ্ধে পরাভূত করা অসম্ভব। অধিকন্তু জাপানের নিকটবর্তী কোন সুরক্ষিত নৌঘাঁটি থেকে জাপানকে আক্রমণ করতে না পারলে জাপানকে জলযুদ্ধে পরাভূত করা সম্ভব নয়। পঞ্চশক্তি সন্ধি অনুযায়ী ইংলন্ড বা যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব নৌবল জাপানের নৌশক্তির দ্বিগুণের কম ছিল। সে ক্ষেত্রে ইংলন্ড বা যুক্তরাষ্ট্র কেহই একক শক্তিতে সাফল্যের আশা নিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে জলযুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না। অধিকন্তু প্রশান্তমহাসাগরীয় অধিকাংশ দ্বীপপুঞ্জে আত্মরক্ষামূলক দুর্গ ও নৌঘাঁটি নির্মাণে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত জাপানের পক্ষে সুবিধাজনকই হয়। তদুপরি চতুঃশক্তি চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলি প্রতিশ্রুত হন যে তাঁরা দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবেন না। এরূপ প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ইংলন্ড বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জাপান আক্রমণ করা সম্ভব, চতুঃশক্তি চুক্তি লঙ্ঘন ক'রে। অপর দিকে, জাপানের পক্ষে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার ক'রে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য ছিল। ওয়াশিংটন সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র নৌবল সীমিত ক'রে জাপানের শক্তিখর্বের কৌশল অবলম্বন করেন। সে কৌশল কার্যকরী হয় নি।

নব-শক্তি সন্ধি: এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নয়টি রাষ্ট্র—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স, চীন, হল্যাণ্ড, স্পেন, পর্তুগাল ও বেলজিয়াম। এই সন্ধিতে আলোচ্য বিষয় ছিল মূলতঃ চীন-পরিস্থিতি। কার্যতালিকায় সাইবেরিয়ার উল্লেখ থাকলেও সম্মেলনে আলোচনাকালে সাইবেরিয়ার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। সাইবেরিয়া সম্পর্কে জাপান ঘোষণা করে যে সম্ভবপর হলেই সাইবেরিয়া থেকে জাপানী সৈন্য অপসারণ করা হবে এবং সাইবেরিয়া সম্পর্কে জাপান কখনও আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করে নি।

চীন-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে চৈনিক প্রতিনিধি দশ দফা মূলনীতি সম্বলিত একটি বিবৃতি দান করেন। চৈনিক প্রতিনিধির মূলনীতিগুলি অগ্রাহ্য ক'রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি এলিহু রুট (Elihu Root) চীন সম্পর্কে নিম্নলিখিত চারটি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেন: (১) চীনের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা মান্য করতে হবে; (২) সকল রাষ্ট্র চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে; (৩) চীনে যাতে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য সকল প্রকার সুযোগ চীনকে দিতে হবে;

(৪) বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোন বিদেশী রাষ্ট্র যেন চীনে এমন কোন বিশেষ অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টা না করে যাতে মিত্রস্থানীয় অপর রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

আলোচনার পর উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত চীন সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধানগুলিও অনুমোদন লাভ করেঃ (১) অতীতে পণ্যশুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রে বা রেলপথে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগে যে সমস্ত নীতি-বিগর্হিত বৈষম্য অনুসৃত হত, বর্তমানে যে সমস্ত বৈষম্য দূরীভূত হবে; (২) চীন প্রজাতন্ত্র যদি কোন যুদ্ধের সরিক না হতে চায়, তাহলে চীন সরকার সে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে চীনকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সকল বাধ্যবাধকতা মান্য করতে হবে; (৩) চীনে বৈদেশিক শক্তিগুলির আঁতরাষ্ট্রিক অধিকার বিদ্যমান থাকবে কি না স্থির করবার উদ্দেশ্যে সম্মেলন একটি কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিশন তদন্ত শুরু করে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। তদন্ত শেষে কমিশন সুপারিশ করে যে বৈদেশিক শক্তিবর্গ কর্তৃক চীনে অবস্থিত স্ব স্ব নাগরিকদের উপর অধিকার বর্জনের পূর্বে চীন সরকারকে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আঁতরাষ্ট্রিক অধিকার বিলুপ্ত হবে শর্তাধীনে; (৪) পণ্যশুল্ক আদায়ের পূর্ণ স্বাধীনতা চীনকে দেওয়া হবে না। তথাপি শুল্কের ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধাদানের ফলে চীন সরকারের পণ্যশুল্ক থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। মোট কথা, চীনে পণ্যশুল্ক আদায়ের অধিকার বৈদেশিক শক্তিদের হাতেই থেকে যায়। (৫) ওয়াশিংটন সম্মেলনের বহু পূর্ব থেকে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি চীনে স্ব স্ব ডাকঘরের মাধ্যমে স্বদেশের সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে আসছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চীনে জাপানী ডাকঘরের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২৫, বৃটেন ও ফ্রান্স প্রত্যেকের ছিল ১২টি, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ছিল ১টি। এই সব ডাকঘরের মাধ্যমে যে সব চিঠিপত্র আদান প্রদান হত অথবা অহিফেন এবং মরফিন জাতীয় মাদকদ্রব্যাদি বিনা শুল্কে আমদানি-রপ্তানি হত সে সবের উপর চীন সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাই চীন সরকার দাবি জানান যে চীনে অবস্থিত বিদেশী ডাকঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিতে হবে। ওয়াশিংটন সম্মেলন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী নাগাদ বিদেশী ডাকঘরগুলি বন্ধ হবে এই শর্তে যে একজন বিদেশী কো-ডিরেক্টর জেনারেলের (Co-Director General) তত্ত্বাবধানে চীন একটি দক্ষ ডাক-তার বিভাগের ব্যবস্থা করবে। সুতরাং আঁতরাষ্ট্রিক ক্ষমতা বিলোপ-সাধনের মত বিদেশী শক্তি নিয়ন্ত্রিত ডাকঘরগুলির বিলোপসাধনও শর্তাধীন হিসাবে সম্মেলনে গণ্য হয়। সম্মেলনে ইহাও স্থির হয় যে চীনে বিদেশী শক্তি বর্গের ইজারাভুক্ত অঞ্চল থেকে বিদেশী ডাকঘরগুলি বন্ধ হবে না। (৬)

নীতিগতভাবে স্থির হয় যে চীন ভূখণ্ড থেকে বৈদেশিক সৈন্য অপসারিত করা হবে। এই অপসারণ কার্যকরী হবে পেকিং এ অবস্থিত বিদেশী শক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের সুবিধা অনুযায়ী। (৭) চীনে বৈদেশিক শক্তির অধীনে ইজারাভুক্ত অঞ্চলসমূহ বিদেশীদের হস্তেই ন্যস্ত থাকবে। এরূপ ইজারাভুক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শানটুং এর অন্তর্গত উই-হাই-উই (Wei-Hai-Wei) এবং হংকং-এর বিপরীত দিকে অবস্থিত কাউলুন (Kowloon) (বৃটেনের ইজারাধীন), হংকং এর দক্ষিণে অবস্থিত ফ্রান্সের ইজারাভুক্ত কোয়াংচোয়ান (Kwangchowan) এবং জাপানের ইজারাভুক্ত পোর্ট আর্থার বন্দর এবং ডেরিয়েন (Darien)।

(৮) শানটুং সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হয় যে সমগ্র প্রদেশটি চীনকে প্রত্যর্পণ করা হবে। ভূতপূর্ব জার্মাণ সরকারের দখলীভূত যাবতীয় সম্পত্তিও চীনের অধিকারে আসবে। তজ্জন্য চীন সরকারকে কোন আর্থিক মূল্য দিতে হবে না। তবে যদি জাপান উক্ত সম্পত্তির উন্নয়ন বাবদ কোন ব্যয় করে থাকে, চীন সরকারকে সেই ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এই সঙ্গে ইহাও স্বীকৃত হয় যে সিংতাও (Tsingtao) শহরে প্রস্তাবিত জাপানী কনসুলেট এর প্রয়োজনমত সম্পত্তি তথা জাপানীদের জন্য স্কুল- মন্দির প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি জাপান সরকারের অধীনেহ থাকবে। এতদ্ব্যতীত সিংতাও সিনান (Tsingtao-Tsinan) রেলপথ বরাবর সমগ্র জাপানী সেনাবাহিনী যতশীঘ্র সম্ভব অপসারণ করা হবে। সিংতাও এর শুল্কভবন চীনা নৌশুল্ক প্রতিষ্ঠানের (Chinese Maritime Customs) অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হবে। জাপান সিংতাও-সিনান রেলপথটি চীনকে প্রত্যর্পণ করবে কিন্তু তৎপরিবর্তে চীন জাপানকে দেবে জার্মান রিপারেসনস্ কমিশন (German Reparations Commission) কর্তৃক নির্ধারিত রেলপথটির তথা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সম্পত্তির অর্থমূল্য। সেই সঙ্গে রেলপথটির উন্নতিকল্প ও প্রশাসন বাবদ জাপান যত মূলধন বিনিয়োগ করেছে চীনকে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

ওয়াশিংটন সম্মেলনে স্বাক্ষরিত নবশক্তি সন্ধিটি এই ভাবে চীনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। ভিনাকের মতে চীন নঞর্থকভাবে উপকৃত হয় কারণ সন্ধিটির ফলে চীনের কোন ক্ষতি হয় নি।

ওয়াশিংটন সম্মেলনের মূল্যায়ন

ই. এইচ. কারের মতে সম্মেলনটি ছিল বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত। কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে যে রাজনৈতিক বলসাম্য বিরাজিত ছিল তা পুনর্প্রবর্তিত হয়। জাপানের নৌশক্তি বৃটেন বা যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস করা

হয়। জাপান অন্ততঃ সাময়িক ভাবে নৌশক্তিতে বৃটেন বা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমতা দাবি না ক'রে বিনা বিরোধে এই হ্রাস মেনে নেয়। জাপান নৌশক্তিতে বৃটেন বা যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষতা অর্জন করতে না পারায় সাম্রাজ্যবাদিতায় জাপানের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সম্মেলনে চীনের সার্বভৌম অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা স্বীকৃত হওয়ায় জাপানের পক্ষে চীনের স্বাধীনতা হরণ করা বা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ভঙ্গ করা সম্ভবপর হয় না। এই ভাবে জাপানের জঙ্গীবাদে ও সাম্রাজ্যবাদিতায় যে প্রতিবন্ধক সৃষ্ট হয় তজ্জন্য যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে।

কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে জাপান চাপে পড়ে স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিতে বাধ্য হয়। প্রথম সুযোগেই জাপান তার অগ্রগতির পথে সকল বাধা দূরীভূত ক'রে পুনরায় জয়যাত্রা শুরু করে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইহা সঠিক নির্ধারিত হয় নি, জাপান এবং বৃটেনের মধ্যে কোন রাষ্ট্রটি দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করবে। মাত্র দশ বৎসর (১৯২১-৩১) এই প্রাধান্য-লাভ জনিত রেষারেষি স্থগিত থাকে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ক'রে প্রমাণিত করে যে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ওয়াশিংটন সম্মেলন আহ্বান ফলপ্রসূ হয় নি। সম্মেলনের পক্ষে জাপানকে দাবান সম্ভবপর হয় নি। সম্মেলনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে পিফার মন্তব্য করেছেন—সম্মেলনটি ছিল একটি ঘৃণ্য প্রহসন বিশেষ, অন্তঃসারশূন্য মিথ্যাদাবির সমারোহ এবং বিশ্বের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপহাস-স্বরূপ।[১] ফেয়ারব্যাঙ্কের মতে, ওয়াশিংটন সম্মেলনে স্বাক্ষরিত সন্ধিগুলি দূরপ্রাচ্যে আন্তর্জাতিক স্থিরতা প্রবর্তন করে এবং 'নেশন' হিসাবে চীনের উত্থানের বুনিয়াদ রচনা করে। এই স্থিরতা প্রবর্তন ও বুনিয়াদ রচনা সম্ভবপর হয় এই কারণে যে জাপান তার উপর আরোপিত বাধানিষেধ সাময়িকভাবে নতশিরে গ্রহণ করে। জাপানের এই নীতি স্বীকার ছিল নিতান্ত সাময়িকই। সকল বন্ধনের শিকল ভেঙে জাপান স্বরূপ ধারণ করে দশ বৎসরের মধ্যে। ওয়াশিংটন সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার উপযোগী কোন উপায় বা পথ নির্দিষ্ট হয় নাই। জাপান সম্মেলনের এই ত্রুটির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে।

মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণ—১৯৩১—৩২ :

পটভূমিকা : ওয়াশিংটন সম্মেলনের শিকল ভেঙে জাপান ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণে অগ্রসর হয়। বহুবিধ সমস্যা জর্জরিত জাপানের

(১) 'The Washington conference was a shabby farce, a parade of hollow pretence and a mockery of world's hopes.' Nathaniel Peffer, Far East দ্রষ্টব্য।

পক্ষে মাঞ্চুরিয়ার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত না ক'রে কোন উপায় ছিল না। মূলতঃ সমস্যাগুলি ছিল জনসংখ্যার আধিক্য, অত্যল্প আবাদী জমি এবং স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদের সংস্থান। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পূর্বেই সন্নিবেশিত হয়েছে।[২] মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের প্রাক্‌কালে অর্থাৎ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জাপানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬৪·৫০ মিলিয়ন (৬৪,৪৫০,০০৫) অথচ তখন মাত্র ১৫ শতাংশ জমি আবাদের উপযোগী ছিল। সে ক্ষেত্রে আবাদী জমিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। ফলতঃ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জাপানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব সমসাময়িক অন্যান্য দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনায় ছিল অত্যধিক। নীচে প্রদত্ত তালিকা থেকে ইহা প্রমাণিত হয়ঃ

দেশের নাম		১৯৩১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ প্রতিবর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব
জাপান	—	১৬৯
ইংলণ্ড	—	২২৬
জার্মানী	—	১৪৫
সুইজারল্যাণ্ড	—	১৬৮
ফ্রান্স	—	১০৮
স্পেন	—	৯০
হল্যাণ্ড	—	২৭৩
ইটালি	—	৩০৫
বেলজিয়াম	—	৩১৪

মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের প্রাক্‌কালে জাপানে জনসংখ্যার আধিক্য, আবাদী জমির স্বল্পতা এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের উচ্চতা মূলতঃ দুটি পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়, যথা উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বাসস্থানের অভাব এবং প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্যের অনটন। এই অভাব-অনটন মেটাতে জাপানের পক্ষে মাঞ্চুরিয়া দখল করা হয়ে ওঠে অপরিহার্য। এতদ্ব্যতীত মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত হলে শিল্পোন্নতির সহায়ক খনিজ দ্রব্যের জোগান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। মাঞ্চুরিয়ার ক্রয়বিক্রয়ের বাজারও ছিল আকর্ষণীয়। মাঞ্চুরিয়া থেকে সয়াবীন আমদানি এবং মাঞ্চুরিয়ার বাজারে জাপানে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয় —দুই-ই সম্ভব হবে যদি মাঞ্চুরিয়া জাপানের অধিকারভুক্ত হয়। ১৯২৯-৩১ খৃষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের পূর্বে জাপান মার্কিণ বাজারে কাঁচা রেশম রপ্তানি করত এবং কার্পাস বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যাদি

(২) চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রপ্তানি করত চীনে (মাঞ্চুরিয়া বাদে)। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের রেশম-রপ্তানি ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। অপর দিকে, চীনের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল অবস্থা তথা চীন-অনুসৃত জাপানী দ্রব্যাদি বয়কটের নীতি চীনের সঙ্গে জাপানের কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি ব্যবসায়ে অবনতি আমন্ত্রণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাপান স্বাভাবিক কারণেই ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসাবে মাঞ্চুরিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মাঞ্চুরিয়ার অর্থনৈতিক সম্পদ শোষণ করতে হলে এবং মাঞ্চুরিয়ার বাজারের উপর জাপানের একচেটিয়া অধিকার স্থাপন কার্যকরী করতে হলে জাপানের পক্ষে যা একান্ত প্রয়োজন তা ছিল মাঞ্চুরিয়াকে নিজ অধিকারভুক্ত করা।)

১৯২১-এর দশকে মাঞ্চুরিয়াতে চীনা জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। জাপান-অধিকৃত দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের মাধ্যমে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য মাঞ্চুরিয়াতে আমদানি হত। ফলে মাঞ্চুরিয়া খাদ্যদ্রব্যের দিক থেকে একটি প্রাচুর্যের দেশ হিসাবে আশু সুবিদিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের প্রলোভনে চীনের উত্তরাঞ্চল থেকে তথা শানটুং প্রদেশ থেকে দলে দলে চীনা-অধিবাসীরা মাঞ্চুরিয়াতে বসতি স্থাপন শুরু করে। ফলে মাঞ্চুরিয়াতে চীনা জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এতে জাপান আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। জাপানের আশঙ্কা জন্মে এই কারণে যে এই ক্রমবর্ধমান চীনা জনসংখ্যা মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করবে। তাই জাপান সমগ্র মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। মাঞ্চুরিয়া জাপানের অধিকারভুক্ত হলে চীনা বাসিন্দাদের বাধা প্রদানের কোন গুরুত্ব থাকবে না।

চীনের জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী প্রভাব বিস্তার বিঘ্নিত করে। যাতে জাপানী দ্রব্যাদি মাঞ্চুরিয়ার বাজারে প্রবেশ করতে না পারে বা বিক্রীত না হয় তজ্জন্য চীনা অধিবাসীরা বয়কট আন্দোলন চালু করে। রেলপথে জাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে চীন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় এক হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রেলপথও নির্মাণ করে। ফলে মাঞ্চুরিয়াতে চীন-জাপান সম্পর্ক তিক্ততার পর্যায়ে ওঠে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ইউরোপীয় সংশ্লিষ্ট শক্তিবর্গ মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের প্রভাব বিস্তারে ঘোরতর বিরোধিতা করে। জাপান মাঞ্চুরিয়াতে মুক্তদ্বার নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল না। অথচ মাঞ্চুরিয়াতে এই নীতি চালু না থাকলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সমূহ বিপদ, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে। মাঞ্চুরিয়াতে মুক্তদ্বার নীতি সম্পর্কে জাপানের বিরুদ্ধ মনোভাব সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে তাঁদের দূরপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় চিন্তিত ক'রে তোলে। ফলে পাশ্চত্য শক্তিবর্গ মাঞ্চুরিয়ার উপর জাপানের

একক প্রভাব বিস্তারে বাধা দান করতে দৃঢ়সংকল্প হয়। জাপান পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের এহেন সংকল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্র মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যুক্তরাষ্ট্র মাঞ্চুরিয়ার রেলপথে মূলধন বিনিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বেই অর্থাৎ ১৯০৫—৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হারিম্যান ও নক্সের রেলপথ পরিকল্পনা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের এহেন মূলধন বিনিয়োগের আগ্রহের প্রমাণ মেলে।[৩] জাপানের বিরোধিতায় যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথে মূলধন বিনিয়োগের পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে নাই। ফলে যুক্তরাষ্ট্র মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের বিরোধী পক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে মাঞ্চুরিয়াতে ভবিষ্যতে জাপানের প্রভাব কতদূর বিদ্যমান থাকবে, এই দুশ্চিন্তা স্বতঃই জাপানকে পেয়ে বসে। চৈনিক প্রেসিডেন্ট ইউয়ানসি কাইকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে এবং তাঁর রাজতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের স্বপ্নকে রূপায়িত করবার ব্যাপারে মদত জুগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র চীনের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে অগ্রসর হয়। এতে জাপানের আতংক অধিকতর বৃদ্ধি পায় এই ভেবে যে অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র হয়ত জাপানকে মাঞ্চুরিয়া থেকে অপসারণে তৎপর হতে পারে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের লানসিং ইসাই চুক্তিতে জাপান সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সদিচ্ছার প্রকাশ পেলেও দুটি দেশের প্রেস চুক্তিটিকে স্বাগত জানায় নি।[৪] ফলে চুক্তিটি উভয় দেশের মধ্যে তিক্ততাই বৃদ্ধি করে। জাপানের আশংকা ছিল, স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলেই যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতা করবে। আশংকা যে অমূলক নয় তা প্রমাণিত হয় যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হারডিং ওয়াশিংটন সম্মেলন আহ্বান ক'রে জাপানের নৌশক্তি হ্রাসের জন্য পঞ্চশক্তি চুক্তি সম্পাদিত করেন। উক্ত সম্মেলনে সম্পাদিত নবশক্তি চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র মাঞ্চুরিয়া সহ চীনের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ও ঘোষণা করে। ফলে মাঞ্চুরিয়া সহ সমগ্র চীনে জাপানের প্রভাব বিস্তারে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। দূরপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের, এ হেন ভূমিকা জাপানকে প্রথম সুযোগেই প্ররোচিত করে মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণ করতে।

আবার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সদুদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ (League of Nations) সকল সভ্যরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করে ([illegible] অনুচ্ছেদ)। জাপানের নিকট জাতিসংঘের এহেন নীতি তার

([illegible]) [illegible] অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
(৪) [illegible] অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মাঞ্চুরিয়া সংক্রান্ত পরিকল্পনা সার্থক ক'রে তোলার পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপে বিবেচিত হয়। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের, প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং জাতিসংঘের উল্লিখিত নীতি জাপানকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণে বাধ্য করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপানে নবগঠিত সেনাবাহিনী মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে সৈন্যবাহিনী গঠন প্রণালীতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। পুরাতন সামরিক নেতাদের মধ্যে কিছু সংখ্যকের মৃত্যু হয়, অনেকে পদত্যাগ করেন বা অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যু, পদত্যাগ তথা অবসর গ্রহণ জনিত শূন্য পদগুলিতে যাঁদের নিয়োগ করা হয় তাঁরা ছিলেন বয়সে নবীন এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁদের অধিকাংশ ছিলেন কৃষকপরিবার-ভুক্ত। এহেন কোন কোন পরিবারের হস্তে স্বল্প পরিমাণ জমি ছিল, আবার কোন কোন পরিবার ছিল অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল কৃষক-পরিবার। ১৯২০-২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নবনিযুক্ত সামরিক অফিসারদের মধ্যে ৩০ শতাংশ ছিলেন এইরূপ মানের পরিবারভুক্ত। মোটকথা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপানে নব নিযুক্ত সামরিক অফিসারগণের অধিকাংশেরই পারিবারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। এঁদের প্রকৃতি ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারোচিত প্রকৃত। তাই সামরিক বা বেসামরিক শাসনে এঁরা অভিজাত মনোবৃত্তি বা অভিজাত কার্যকলাপ সহ্য করতে পারতেন না। কৃষিপরিবার-ভুক্ত হওয়ায় তাঁরা কৃষকশ্রেণীর প্রতি ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন। সেনাবাহিনীতে সাধারণ সৈন্যগণ (Rank and File) স্বাভাবিক কারণেই ছিলেন অস্বচ্ছল কৃষক-পরিবার-ভুক্ত। এইভাবে গঠিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপানী সেনাবাহিনী আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতির সমর্থক হন। বিশেষতঃ কোয়ানটুং(K wantung) সেনাবাহিনী, যার উপর কোয়ানটুং নামে জাপানের ইজারাপ্রাপ্ত অঞ্চল এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল, অতীব আক্রমণপ্রবণ ছিল। এই সেনাবাহিনীই যুদ্ধের মাধ্যমে মাঞ্চুরিয়া দখলের দাবি করে। অর্থনৈতিক কারণে কোয়ানটুং সেনাবাহিনী মাঞ্চুরিয়া জয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। ১৯২৯-৩১ খৃষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের কালে যখন জাপানী কাঁচা সিল্ক ও কার্পাস বস্ত্রের রপ্তানি যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং ফলে হাজার হাজার জাপানী মধ্যবিত্ত পরিবার কর্মচ্যুত হয় তখন উক্ত কোয়ানটুং সেনাবাহিনী দাবি তোলে যে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ, খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আকর্ষণীয় আমদানি রপ্তানির বাজার সম্বলিত মাঞ্চুরিয়া অধিকার একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলে মুখ্য বিরোধী ছিলেন চ্যাং সো লিন (Chang tso Lin)। ম্যাঞ্চুরিয়ার তু-চুন (Ward-lord) এর

পদ থেকে উন্নীত হয়ে চ্যাং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সমগ্র উত্তর চীনের উপর আধিপত্য লাভ করেন। তিনি মাঞ্চুরিয়া সমেত চীনের কোন অংশেই বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মোট কথা, তিনি জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া-আক্রমণ প্রতিহত করবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। অপর দিকে জাপানী কোয়ানটুং সেনাবাহিনীও মাঞ্চুরিয়া অধিকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রয়োজন বোধে চ্যাং শো লিনকে নিহত করতেও প্রস্তুত। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুন একটি বিশেষ ট্রেণে পেকিং মুকডেন রেলপথ ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের সংযোগস্থল অতিক্রম কালে চ্যাং শো লিন কোয়ানটুং সেনাবাহিনী কর্তৃক বোমা নিক্ষেপের ফলে নিহত হন। তখন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তানাকা (Tanaka, ১৯২৭-২৯)। তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন হামাগুচি (Hamaguchi)। ধর্মোন্মত্ত এক যুবকের গুলিতে তিনি আহত হন। তখন সাময়িকভাবে সিদেহারা (Sidehara) প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। গুলিবিদ্ধ হামাগুচির শেষ অবধি মৃত্যু হয় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে। তখন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন ওয়াকাৎসু (Wakatsu)। সিদেহারা যখন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হন তখন মাঞ্চুরিয়ার রাজনীতি কোন পথে চলবে এই নিয়ে তাঁর ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যেদিন সিদেহারা প্রকাশ্যভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে চীন ও জাপানের মধ্যে এমন কোন সমস্যাই নাই যার শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে মীমাংসা সম্ভব নয়, তার ২৪ ঘণ্টা বাদে কোয়ানটুং সেনাবাহিনী দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া-স্থিত মুকডেন আক্রমণ করে। সেদিন ছিল ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ। কোয়ানটুং সেনাবাহিনীর প্রধান কর্মকেন্দ্র (হেড কোয়ারটারস) ছিল মুকডেন।

দুটি ঘটনা কোয়ানটুং সেনাবাহিনীকে আশু মুকডেন আক্রমণে প্ররোচিত করে—একটি ওয়ানপেয়োশান (Wanpaoshan) সংক্রান্ত এবং অপরটি নাকামুরা (Nakamura) সংক্রান্ত। দুটি ঘটনাই ঘটে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে। মুকডেনের উত্তরে অবস্থিত চ্যাংচুন (Chang chun) অঞ্চলের ১৮ মাইল উত্তরে ওয়ানপেয়োশান গ্রাম। এই গ্রামে মাঞ্চুরিয়া-অধ্যুষিত কতকগুলি কোরিয়ার নাগরিক চ্যাং নুং অগ্রিকালচারাল কোম্পানী (Chang Nung Agricultural Company) নামক একটি কৃষি সংক্রান্ত সংস্থার নিকট হতে একখণ্ড জমির উপর ইজারা লাভ করে। যখন কোরিয়ার অধিবাসিগণ তাদের ইজারা-প্রাপ্ত জমিতে পরিখা ও বাঁধ নির্মাণে ব্যস্ত থাকে তখন কয়েকজন প্রতিবেশী চীনা-ভূম্যধিকারী তাদের কার্যে বাধাদান করে। তখন জাপানী দূতাবাসের কিছু সংখ্যক পুলিশ কোরিয়ানদের সাহায্যে অগ্রসর হয় এবং তাদের আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করবার সুযোগ দেয়। জাপানী পুলিশের হস্তক্ষেপের ফলে চীনা সৈন্যদের সঙ্গে জাপানী পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। কেহ অবশ্য হতাহত হয়

নাই। কিন্তু জাপানে ও কোরিয়ায় এই সংঘর্ষের উত্তেজনাকর বিবরণ প্রকাশিত হয়। চীনেও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ফলে চীন ও জাপানের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। কোয়ানটুং সেনাবাহিনীও মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের একটি অজুহাত পায়। দ্বিতীয় ঘটনাটি নাকামুরা সংক্রান্ত। ক্যাপ্টেন নাকামুরা ছিলেন মাঞ্চুরিয়ার নিযুক্ত একজন জাপানী সামরিক অফিসার। তিনি কয়েকজন চীনা দস্যুর হাতে প্রাণ হারান। ক্যাপ্টেন নাকামুরার হত্যাকাণ্ড মাঞ্চুরিয়া-স্থিত কোয়ানটুং সেনাবাহিনীকে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে এবং চীন সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বন করতে প্ররোচিত করে। কোয়ানটুং সেনাবাহিনী অবশেষে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে রাত্রির অন্ধকারে মুকডেনের উপর গোলাবর্ষণ করে। মাঞ্চুরিয়ায় আক্রমণ শুরু হয়। রাত্রি প্রভাত হলে সচকিত মুকডেনবাসী বুঝতে পারে যে মুকডেন জাপানের অধিকারভুক্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট মাঞ্চুরিয়া অনতিবিলম্বে জাপান সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন হবে। ঐ তারিখ রাত্রে কর্তব্য-রত জাপানী প্রহরীদের আশংকা হয় যে চীনা সৈন্যেরা মুকডেন বরাবর দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ বিস্ফোরণ দ্বারা ধ্বংস করতে উদ্যত। এই আশঙ্কার ভিত্তিতে সৈন্যবাহিনী তলব করা হয়। সামান্য সংগ্রামের পর মুকডেনে দশ হাজার চীনা সৈন্য নিরস্ত্র অথবা ছত্রভঙ্গ হয়। চারদিনের মধ্যে উত্তর মুকডেনের সমস্ত শহরাঞ্চল জাপানের অধিকারভুক্ত হয়। ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে চিন চাউ (Chin chow) দখলীকৃত হয় এবং ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জাপানী সৈন্য মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তস্থিত Shanhaikwan-এ পেঁছায়। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকার সম্পূর্ণ হয়।

জাপানের রাজনৈতিক চিন্তায় মাঞ্চুরিয়া সমস্যার সমাধান ছিল মাঞ্চুরিয়া অধিকারে। তাই শেষ অবধি মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত হয়। কিন্তু জাপান সরকার মাঞ্চুরিয়াকে জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত না ক'রে মাঞ্চুকুয়ো (Manchukuo) নাম দিয়ে চীনের চিং-বংশীয় সর্বশেষ প্রতিনিধি পু-য়ি-র (Pu-yi) তত্ত্বাবধানে জাপানের একটি অনুগত (Puppet) রাষ্ট্রে পরিণত করে। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে মাঞ্চুকুয়োকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাঞ্চুকুয়ো পরিণত হয় জাপানের একটি সংরক্ষিত অঞ্চলে। মাঞ্চুকুয়োর প্রশাসনে জাপানী উপদেষ্টাদের প্রাধান্য হয় স্বীকৃত। ফলে মাঞ্চুরিয়া পরিচিত হয় জাপানের প্রচ্ছন্নভাবে অধীনস্থ একটি রাষ্ট্র হিসাবে (Veiled dependency of Japan)।

মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের প্রতিক্রিয়া :

চীনের উপর প্রতিক্রিয়া গুরুতর আকারে দেখা দেয়, স্বাভাবিক কারণেই।

সর্বাগ্রে লক্ষণীয়, চীনা কম্যুনিস্ট দল এবং চিয়াং কাই শেকের জাতীয় সরকার (National government), এই দুয়ের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি সাময়িক ঐক্য স্থাপিত হয়। জাপানের উগ্র সাম্রাজ্যবাদিতা চীনের জনসাধারণকে নূতন ক'রে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে। জাপানী আক্রমণাত্মক নীতির প্রতিবাদে চীনাবাসিগণ জাপানের বিরুদ্ধে তাদের চিরাচরিত অস্ত্রের পুনঃপ্রয়োগ শুরু করে অর্থাৎ চীনাবাসীরা জাপানী দ্রব্যাদি বয়কট করে। সেই সঙ্গে আরম্ভ করে জাপানী সম্পত্তির লুঠতরাজ ও জাপানী নাগরিকদের উপর উৎপীড়ন। নানকিং, শাংহাই, হানকাউ প্রভৃতি চীন অঞ্চলে জাপান-বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংস্থা (National Anti-Japanese Association) গড়ে ওঠে। এই সব অঞ্চলে জাপানী কোম্পানীগুলির পণ্যাগার সমূহ লুণ্ঠিত হয়। চীনে অবস্থিত জাপানী জনসাধারণকে চীনাদের হস্তে দুর্ব্যবহার ও অবমাননা সহ্য করতে হয়। স্বাভাবিক কারণেই চীন-জাপানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি ঘটে।

সাংহাই এ জাপান-বিরোধী আন্দোলন উগ্র আকার ধারণ করে। বয়কট আন্দোলন ব্যতীত জাপানী সাধুদের উপর আক্রমণ চলে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষে একদল জাপানী সাধু আক্রান্ত হন। তাদের মধ্যে একজন নিহত হন। প্রতিবাদে জাপান সরকার সাংহাই এ সৈন্য প্রেরণ করে। চাপেই (Chapei) অঞ্চলের উপর আকাশ থেকে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে অঞ্চলটি দগ্ধ-প্রায় হয়। তৎকালে সাংহাইকে সাম্রাজ্যভুক্ত করার কোন পরিকল্পনা জাপানের ছিল না। তাই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সাংহাই থেকে জাপানী সৈন্য অপসারিত হয়।

মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের পর জাপান সমগ্র বিশ্বের দরবারে বিরূপ সমালোচনা তথা নিন্দার পাত্র হয়ে ওঠে। জাপানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে জাপান জাতি সংঘের চুক্তি, কেলগ প্যাকট (Briand-Kellogg Pact) এবং ওয়াশিংটন সম্মেলনে স্বাক্ষরিত নবশক্তি সন্ধি অগ্রাহ্য ক'রে মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণ করে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জাতি সংঘের দশম অনুচ্ছেদে এই নীতি গৃহীত হয় যে সভ্যরাষ্ট্রগুলি পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মান্য করবে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ব্রীয়া-কেলগ চুক্তির অথবা পিস প্যাক্ট অব প্যারিস (Peace pact of Paris)-এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি ছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, জাপান, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বৃটিশ ডমিনিয়মগুলি এবং ভারতবর্ষ। এই চুক্তি অনুসারে, স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি একমত হন যে যুদ্ধ নিন্দনীয়, যুদ্ধ বর্জনীয়, এবং আন্তর্জাতিক সকল সমস্যার সমাধান করণীয় শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে। ওয়াশিংটন সম্মেলনে স্বাক্ষরিত নবশক্তি-চুক্তি অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি স্থির

করেন যে চীনের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

যুদ্ধের মাধ্যমে মাঞ্চুরিয়া সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করায় জাপান উক্ত তিনটি চুক্তিই লঙ্ঘন করেছে বলে আন্তর্জাতিক অভিমত প্রকাশিত হয়।

সোভিয়েত দেশ জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের নিন্দা করে এবং ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এই চীন-সোভিয়েত কূটনৈতিক সম্পর্ক-স্থাপন জাপানের প্রতি সোভিয়েত দেশের বিরূপ মনোভাবেরই পরিচায়ক। যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে জাপান কর্তৃক সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রকেও বিচলিত করে। ৭ই জানুয়ারী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সেক্রেটারী অব স্টেট স্টিমশন (Stimson) ঘোষণা করেন যে কেলগ চুক্তি (১৯২৮) লঙ্ঘন ক'রে যুদ্ধনীতির অনুসরণে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থায় কোন পরিবর্তন সাধিত হলে যুক্তরাষ্ট্র সে পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দেবে না। স্টিমশনের এই ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের Doctrine of Non-recognition নামে পরিচিত। জাপান কিন্তু রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের এরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব সত্ত্বেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। জাপানের লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভ। এই লক্ষ্য ধরেই জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের পরই ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত জেহোল (Jehol) অঞ্চলটি অধিকার ক'রে মাঞ্চুরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে।

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মুকডেন জাপানী অধিকারে আসে। হতচকিত চীন রাষ্ট্রসংঘের শরণাপন্ন হয় ২১শে সেপ্টেম্বর। রাষ্ট্রসংঘের চুক্তিপত্রের (Covenant) একাদশ সংখ্যক অনুচ্ছেদ উল্লেখ ক'রে চীন রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করে। একাদশ অনুচ্ছেদ অনুসারে, যুদ্ধ ঘোষণার ফলে বা যুদ্ধের হুমকিতে রাষ্ট্রসংঘের কোন সভ্য রাষ্ট্রের আশু কোন বিপদের সম্ভাবনা থাক বা না থাক, এরূপ যুদ্ধঘোষণা বা যুদ্ধের হুমকি রাষ্ট্রসংঘের সকল সভ্যেরই উদ্বেগের কারণ হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং রাষ্ট্রসংঘকে চীনের আবেদনে সাড়া দিতে হয়। ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের কাউন্সিল জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের উপর আলোচনায় যোগদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানবার প্রস্তাব করে। জাপানের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ফলে জেনিভায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল গিলবার্ট (Gilbert) ১৬ই অক্টোবর প্রার্থিত প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরিত হন। তাঁর উপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নির্দেশ ছিল যে কেলগ চুক্তি সম্পর্কিত কোন আলোচনা হলে তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করবেন, অন্যথায় শুধুমাত্র পরিদর্শক হিসাবে সভায় উপস্থিত থাকবেন। রাষ্ট্রসংঘের কাউন্সিলের আলোচনায় স্থির হয় যে চীনে একটি অনুসন্ধানমূলক কমিশন (A commission of enquiry) প্রেরিত হবে। এই কমিশনটি গঠিত হয়

যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মান ও ইটালি দেশীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে। কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন লর্ড লিটন (Victor Alexander George Robert Bulwer Lytton)। তাঁর পিতা লর্ড লিটন বৃটিশ ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত ছিলেন ১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মাঞ্চুরিয়া কমিশনের চেয়ারম্যান লর্ড লিটন ৯ই অগাস্ট ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সিমলাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলার গবর্ণর নিযুক্ত হন এবং ভাইসরয় লর্ড রেডিং (Lord Reading) এর ছুটিতে থাকাকালীন অস্থায়ী ভাইসরয় নিযুক্ত হন। তারপর তিনি মাঞ্চুরিয়া কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে তিনি মাঞ্চুরিয়া যাত্রা করেন। সবিশেষ তদন্তের পর তিনি ২রা অক্টোবর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ জেনিভাতে তাঁর রিপোর্ট (Lytton Report) প্রকাশিত করেন। নভেম্বরে রিপোর্টটি রাষ্ট্রসংঘের কাউন্সিলে পেশ করা হয়।

লিটন রিপোর্টে শুধু যে মাঞ্চুরিয়া সমস্যা আলোচিত হয়েছে তা নয়। রিপোর্টটিতে চীন-জাপানের আনুপূর্বিক সমস্যা সমূহের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। রিপোর্টে সন্নিবেশিত মাঞ্চুরিয়া-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল :

(১) জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণ নিন্দনীয়। এই অধিগ্রহণের সমর্থনে জাপানের সকল যুক্তিই পরিত্যাজ্য। 'স্বাধীন মাঞ্চুকুয়ো' হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব (Fiction)। যদিও চীনের প্রতি জাপানের আচরণ নিন্দার্হ তথাপি ইহাও সত্য যে অতীতে জাপানের প্রতি চীনের মনোভাব ছিল উত্তেজনাব্যঞ্জক এবং ন্যায়বিরুদ্ধ। (২) মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের স্বার্থ ও অধিকারে (Righs) স্বীকৃতি দিয়ে এবং মাঞ্চুরিয়াকে চীনের সার্বভৌমত্বের অধীনে স্বায়ত্বশাসন দান ক'রে মাঞ্চুরিয়া সমস্যার সমাধান করতে হবে। (৩ স্থিতাবস্থা (Status Quo) পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা অননুমোদনীয়। (৪ মাঞ্চুরিয়ার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে স্থানীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (Gendarmerie) সাহায্যে। অন্যান্য সশস্ত্রবাহিনী অপসারিত করতে হবে। (৫) চীন-জাপানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে চীনের পুনর্গঠন বাঞ্ছনীয়। (৬) জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান প্রকৃতপক্ষে ছিল পুলিশের কার্যকলাপ—জাপানের এহেন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। (৭) অতএব মাঞ্চুরিয়া সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে স্থিতাবস্থা প্রবর্তনেব মাধ্যমে নয়, অবাস্তব মাঞ্চুকুয়োকে স্বীকৃতি দান করে নয়, পরন্তু সমস্যাটির যথার্থ সমাধান হবে রাষ্ট্রসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় চীন-জাপানের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে মাঞ্চুরিয়াতে চীনের অধীনে স্বায়ত্বশাসন

প্রতিষ্ঠা করা।

উপরোক্ত লিটন রিপোর্টটি রাষ্ট্রসংঘের কার্যকরী সমিতি (Council), সাধারণ সভা (Assembly) এবং সাধারণ সভার কার্যনির্বাহক সমিতি (Assembly Committee) কর্তৃক ক্রমান্বয়ে বিবেচিত হয়। তৎপরে শেষোক্ত সমিতি রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে লিটন রিপোর্টের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত রিপোর্টটি প্রকাশিত করেঃ ১) রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভার কার্যনির্বাহক সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় জাপান ও চীনের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার পর জাপান তার সৈন্যবাহিনী মাঞ্চুরিয়া থেকে অপসারিত করবে এবং সার্বভৌম চীনের অধীনে মাঞ্চুরিয়া একটি স্বায়ত্বশাসন অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত হবে। (৩) রাষ্ট্রসংঘ মাঞ্চুকুয়োকে স্বীকৃতি দেবে না। (২) রাষ্ট্রসংঘ মাঞ্চুরিয়ার বর্তমানে প্রচলিত শাসনপ্রণালী মেনে নেবে না। (৩) রাষ্ট্রসংঘ মাঞ্চুরিয়াতে স্থিতাবস্থার পুনঃপ্রবর্তন অনুমোদন করবে না (৫) মাঞ্চুরিয়া অভিযান কেবলমাত্র একটি পুলিশবাহিনীর কার্যকলাপ ছিল—জাপানের এই বক্তব্য রাষ্ট্রসংঘ গ্রাহ্য করবে না।

উপরোক্ত কার্যনির্বাহক সমিতি আন্তর্জাতিক চুক্তি লংঘনের জন্য জাপানের বিরুদ্ধে কোন অর্থনৈতিক শাস্তি বিধান করে নাই। প্রদত্ত একমাত্র শাস্তি ছিল মাঞ্চুকুয়োকে স্বীকৃতি না দেওয়া। কার্যনির্বাহক সমিতি রাষ্ট্রসংঘের চুক্তিপত্র, প্যারিসের চুক্তি এবং নব-শক্তি সন্ধি অনুযায়ী জাপানের কর্তব্যগুলি পুনরাবৃত্তি করে মাত্র কিন্তু জাপান যে উক্ত কর্তব্যগুলি যথাযথ পালন করে নাই, এই মর্মে কোন বক্তব্য রাখে নাই। মোট কথা, কার্যনির্বাহক সমিতি রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে প্রদত্ত রিপোর্টে এমন কোন মন্তব্য করে নি যার ফলে জাপানের উপর রাষ্ট্রসংঘের চুক্তিপত্রের ষোল-সংখ্যক অনুচ্ছেদে অনুমোদিত অর্থনৈতিক শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারত। কার্যনির্বাহক সমিতি এরূপ মন্তব্য চতুরতার সঙ্গে এড়িয়ে যায়।

মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণকালে সমগ্র বিশ্ব ছিল এক অভুতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকটের কবলে। এহেন সময়ে জাপানের উপর ১৬-সংখ্যক অনুচ্ছেদ প্রয়োগ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক হত না। ১৬-সংখ্যক অনুচ্ছেদের প্রয়োগের অর্থ ছিল জাপানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। এতে বিভিন্ন দেশে অকারণে অর্থনৈতিক সংকট অধিকতর বৃদ্ধি পেত বই হ্রাস পেত না। জাপানের সঙ্গে সম্ভাব্য জলযুদ্ধে তখন জাপানের সমকক্ষতা দাবি করতে পারত একমাত্র বৃটিশ নৌবাহিনী অথচ বৃটিশ নৌবাহিনীর পক্ষে একক শক্তিতে জাপানকে পরাভূত করা সম্ভবপর ছিল না। সে পরিস্থিতিতে জাপানের বিরুদ্ধে ১৬-সংখ্যক অনুচ্ছেদ প্রয়োগ না ক'রে রাষ্ট্রসংঘ রাজনৈতিক বিজ্ঞতারই পরিচয় দেয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের তৎকালীন ৪৪ জন সদস্যদের মধ্যে ৪২ জন অনুমোদন করেন। শ্যামদেশ (বর্তমান থাইল্যান্ড) ভোটদানে বিরত থাকে, আর জাপান নেতিবাচক ভোট দেয়। রিপোর্টটি অনুমোদিত হবার এক মাস পর জাপান রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে।

দেখা যাচ্ছে, জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের পশ্চাতে বিশেষ কয়েকটি চাপ ছিল, যথা আভ্যন্তরীণ বা অর্থনৈতিক চাপ, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের, বিরোধিতার চাপ, চীনা জাতীয়তাবাদের চাপ এবং সর্বোপরি কোয়ানটুং সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক নীতির চাপ। এই চাপগুলির সম্মিলিত ফলশ্রুতি ছিল মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও অধিগ্রহণ।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণ দূরপ্রাচ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ওয়াশিংটন সম্মেলনের প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে শক্তির দ্বন্দ্ব দশবৎসরকাল স্থগিত থাকে তার পুনরাবির্ভাব ঘটে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে। জাপান আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘন ক'রে যুদ্ধনীতির অনুসরণে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে। এতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরাজয়ই সূচিত হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ জাপানকে বাধাদান করতে পারে নি। অতঃপর জাপান কোন্ পথে?

জাপানে সামরিক শাসন (১৯৩২-৩৬ :

মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের সাফল্যমণ্ডিত সামরিক অভিযান এবং ফলে মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণ জাপানে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করে। কোয়ানটুং সেনাবাহিনী নেতৃত্ব গ্রহণ না করলে মাঞ্চুরিয়া জাপানের অধিকারে আসত কি না সন্দেহ। সেনাবাহিনীতে তরুণ বয়স্ক সভ্যেরা যেমন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণে যোগদান করেন, তেমনি যোগদান করেন বয়সে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ সামরিক সভ্যবৃন্দ, যথা কর্ণেল ইতাগাকি, লেফটনান্ট কর্ণেল ইশিওয়ারা (Ishiwara)। সামরিক নেতাদের তৎপরতায় মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত হওয়ায় সেনাবাহিনীর উগ্র জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পায়। জাপানে সামরিক শাসন অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাধারণ কৃষক পরিবারভুক্ত যুবকবৃন্দ অফিসার তথা সাধারণ সৈনিক হিসাবে দলে দলে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। অধিকাংশেরই পরিবারে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ছিল না। ফলতঃ অধিকাংশই ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে এরূপ নবগঠিত সেনাবাহিনী স্বাভাবিক কারণেই সামরিক তথা বেসামরিক প্রশাসনে অভিজাত মনোবৃত্তি

সহ্য করত না। অভিজাত প্রশাসনিক কাঠামোতে ভাঙ্গন ধরাতে হলে সৈন্যবাহিনীর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব থেকেই সেনাবাহিনী দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। সেনাবাহিনী প্রশাসনে বিভিন্ন মতবাদ বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিল। সেনাবাহিনীর আদর্শ ছিল 'এক দেশ, এক দল।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানীতে যেমন ছিল একটিমাত্র দল অর্থাৎ নাৎসি দল, তেমনি সেনাবাহিনীর আদর্শ অনুযায়ী জাপানে থাকবে কেবলমাত্র শোয়া-কাই (Showa Kai) বা সামরিক দল। সেনাবাহিনী বিশ্বাস করত যে মেজী সরকার শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতি তথা সংসদীয়-সংবিধান গ্রহণ ক'রে রীতিমত ভুল করেছে। শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতি অনুসরণের ফলে পুঁজিপতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সংসদীয় সংবিধান প্রবর্তনের ফলে রাজনীতিতে দলগত বিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেনাবাহিনী পুঁজিপতি অর্থনৈতিক কাঠামো তথা দলগত রাজনীতি উভয়ই নির্মূল করবার সংকল্প গ্রহণ করে। সেনাবাহিনীর বিবেচনায় রাজনীতিবিদদের স্বার্থে তথা তাঁদের পুঁজিপতি মিত্রদের অনুকুলে দেশ শাসিত হতে দেওয়া উচিত নয়। একমাত্র সেনাবাহিনীই সাধারণ মেহনতী মানুষের এবং দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি সাধন ক'রে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে সক্ষম। অতএব সেনাবাহিনীর হস্তেই শাসনভার অর্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব হবে স্বার্থগন্ধহীন।

মেজীযুগের রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন কাউন্ট ইটো, গোড়ার দিকে রাজনৈতিকদল-ভিত্তিক প্রশাসন গঠনের বিরোধী ছিলেন। পরে অবশ্য এই বিরোধিতা অবলুপ্ত হয়। স্বয়ং ইটো ১৯০০ খৃষ্টাব্দে রিকেকন সেয়ুকাই নামে একটি রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে সরকার গঠন করেন। কালক্রমে রাজনৈতিক দলগুলি দক্ষহীনতা হেতু জনপ্রিয়তা হারায়। দলগুলি নিজদিগকে ক্ষমতাসীন রাখতে পেরেছিল নির্দলীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা ক'রে এবং অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিদের তথা পুঁজিপতিদের সমর্থন লাভ ক'রে। অভিজাত শ্রেণী ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে এ হেন যোগসাজস রাজনৈতিক দলগুলিকে সমাজে বিবেকবান নাগরিকদের চক্ষে হেয় ক'রে তোলে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর রাজনৈতিক দলগুলি হৃতগৌরব হয়ে কোনও রকমে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে। ইতিমধ্যে জাপানী রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থীদের (Right Wing) প্রতাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দক্ষিণপন্থীদের বিবেচনায় দেশে রাজনৈতিকদল-ভিত্তিক প্রশাসন প্রচলিত থাকলে দেশ অতীব বিপদের সম্মুখীন হবে। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণপন্থীরা দল-ভিত্তিক প্রশাসনের কঠোর সমালোচনা করতে থাকেন। তাঁদের বিচারে, যখন মার্কিণ ও বৃটিশ

সরকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে জাপানীদের অভিবাসনের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, তখন দলগুলি মার্কিন ও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে পারে নি। জাপান-বিরোধী চীনা-নেতৃত্ব, সাংহাই প্রভৃতি অঞ্চলে জাপান-বিরোধী আন্দোলন, দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার, এই সব যখন জাপানী জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে তখন দলগুলি জনমানস থেকে ত্রাস দূরীকরণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণে অবসর হয় নি। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জাপানে সামরিক ও বেসামরিক নেতাদের মধ্যে অনেকেরই আশংকা হয় যে মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া বোধ হয় চীন বা রাশিয়ার কুক্ষিগত হয়ে যাবে। দক্ষিণপন্থীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক দলগুলির মনে এরূপ আশংকা উদিত হয় নি, ফলে দলগুলি উদ্ভূত পরিস্থিতির গুরুত্বও উপলব্ধি করতে পারে নি। অধিকন্তু, রাজনৈতিক দলগুলি গ্রামীণ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের স্বার্থ অবহেলা ক'রে বড় বড় ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষার্থে কোন কার্পণ্য করে নি। ১৯২০ দশকের শেষের দিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটকালে জাপানী গ্রামবাসীদের দুঃখ দুর্দশার প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির কোন কার্যকরী সহানুভূতি প্রদর্শনের পরিচয় মেলে না। দেশের তৎকালীন বৈদেশিক নীতি ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা, উভয়ের উপরই দলগুলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী নেতৃত্বকালে রাজনৈতিক দলগুলি অকৃত্রিম জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। ঘরে বাহিরে তখন যে সংকট উদ্ভূত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক চিন্তানায়কের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে দলগুলি প্রশাসন থেকে তাদের হাত তুলে নিলে দেশের কল্যাণই হবে। দক্ষিণপন্থীরা তখন স্বীকার করত যে দেশের সেনাবাহিনী জাতীয়তাবাদী ভাষায় কথা বলে এবং জনমনে আশার সঞ্চার করতে পারে। দক্ষিণপন্থীদের মত বুদ্ধিজীবিগণও রাজনৈতিক দলগুলির উপর তাঁদের আস্থা হারিয়ে ফেলেন।

রাজনৈতিক দলগুলির এইরূপ জনপ্রিয়তার অভাব সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠায় পরোক্ষভাবে প্রভূত সাহায্য করে। সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে অপর একটি কারণও লক্ষ্যণীয়। মেজী সংবিধান অনুসারে স্থলবাহিনী তথা নৌবাহিনীর প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত মন্ত্রিদ্বয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই সরাসরি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের এবং তাঁকে রাজনৈতিক পরামর্শদানের অধিকারী ছিল। স্থলবাহিনীর প্রতিনিধিমূলক মন্ত্রী এহেন সাংবিধানিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর মনে এই বিশ্বাস জন্মান যে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সামরিক শাসন অনুমোদনযোগ্য। সম্রাট সম্মতি দান করেন। স্বয়ং সম্রাটের সম্মতি দানের পর যদি সেনাবাহিনী প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল ক'রে

থাকে, সে দখলকে অন্যায় দখল রূপে চিহ্নিত করা চলে না। কিন্তু সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ নিষ্কণ্টক করতে হলে সেনাবাহিনীর আশু প্রয়োজন রাজনৈতিকদল-ভিত্তিক শাসনের অবলুপ্তি ঘটান এবং সামরিক শাসনের স্বপক্ষে এবং দলগত শাসনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য জোরদার করা। পেট্রিয়টিক সোসাইটি (Patriotic Society) নামে এক শ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী সমিতির মাধ্যমে এই প্রচারকার্য ত্বরান্বিত হয়। সেই সঙ্গে দল-ভিত্তিক শাসনের অবলুপ্তির উদ্দেশ্যে তৎকালীন ক্ষমতাসীন মিনসিটো (MInseito) দলকে গদিচ্যুত করবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। সামরিক নেতৃত্বের চাপে মিনসিটো দল গদিচ্যুত হয় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। মিনসিটো সরকারের পতনের পরই কিন্তু সেনাবাহিনী আশানুযায়ী প্রশাসনিক অধিকার পায় না। মিনসিটো সরকারের পতনের পর সেয়ুকাই (Seiyukai) নামে অপর একটি রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে। এই দলের নেতৃত্ব করেন ইনুকাই (T. Inukai)। নবগঠিত ইনুকাই সরকারের পতন ঘটাবার জন্য সেনাবাহিনী আক্রমণাত্মক পন্থা অবলম্বন করে। এই পন্থার সমর্থকদের মধ্যে সেনাবাহিনীর অফিসারগণ ব্যতীত ছিলেন আরও অনেকে, যথা ছাত্র ও কৃষক। আন্দোলনকারীরা ছিলেন রাজনৈতিক দল-ভিত্তিক শাসনের বিরোধী তথা দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহীদলভুক্ত। ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভুতপূর্ব অর্থমন্ত্রী ইনোয়ে (Inouye) নিহত হন। একমাস পরে মিৎসুই পুঁজিপতি গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যারণ ডান (Baron Dan) গুলিবিদ্ধ হন। অবশেষে ১৫ই মে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং ইনুকাই নিহত হন। ইনুকাই-এর হত্যা সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করে। সামরিক শাসনের দায়িত্ব যাঁদের উপর অর্পিত হয় তাঁদের মধ্যে কিছু ছিলেন নৌবাহিনীভুক্ত পদস্থ অফিসারগণ। তবে, রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে কোন মতবিরোধ ছিল না। সেইজন্য নৌবাহিনীর অফিসারগণ সরকার গঠন করলেও তাঁদের গঠিত সরকার সামরিক নামেই পরিচিত থাকে।

সামরিক শাসনের স্থায়িত্বকাল ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই পাঁচ বৎসরে দুইজন প্রধানমন্ত্রীর উপর সরকার গঠনের দায়িত্ব অর্পিত হয়—সাইতো মকোতো (Saito Makoto, মে ১৯৩২-জুলাই ১৯৩৪) এবং ওকাদা (Okada, জুলাই ১৯৩৪—মার্চ ১৯৩৬)। উভয়েই ছিলেন নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল (Admiral) এবং মধ্যপন্থী রাজনীতিক। তাঁদের শাসনকাল বিপ্লববাদী দক্ষিণপন্থী শাসনকাল (Revolutionary Right) নামে পরিচিত। ১৯৩৬, মার্চে সামরিক শাসনের অবসান হয়।

সাইতো ও ওকাদার সামরিক শাসনের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

হচ্ছে বিপ্লববাদী দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্বে গঠিত সন্ত্রাসবাদী সমিতির উত্থান, যা স্বদেশ-হিতৈষী সমিতি (Patriotic Society) নামে পরিচিত। এই শ্রেণীর সমিতির গঠনে নেতৃত্বদান করেন সামরিক ও বেসামরিক উভয় শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ। এঁদের হাতে বামপন্থী তথা উদারনীতিবাদী উভয়েই নির্যাতিত হন। বেসামরিক পেট্রিয়টিক সোসাইটির আদর্শ ছিল সমগ্র এশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করা, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে এশিয়া মহাদেশ থেকে বহিভূর্ত করা এবং আন্তর্জাতিকতার বিরোধিতা করা। জাপানী প্রশাসন যাতে দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় তজ্জন্য আন্দোলন করাও ছিল উক্ত সমিতির কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বেসামরিক সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যতম নেতা ছিলেন কিতা ইক্কি (Kita Ikki)। রাজনৈতিক মতবাদে তিনি ছিলেন ফ্যাসিস্ট। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ 'Radical National Socialism' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিতা ইক্কি ব্যতীত অন্যান্য বেসামরিক নেতাও ছিলেন। এই সব নেতৃবর্গ কৃষক-দরদী ছিলেন এবং কৃষক-সম্প্রদায়কে সমাজের ভিত্তিরূপে গণ্য করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের জন্যই জনগণের এত দুর্ভোগ। জাইবাৎসু গোষ্ঠী পুঁজিপতিদের ও তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা রাজনৈতিকদলের এবং আমলাতান্ত্রিক শ্রেণীর ও বিরোধী ছিলেন। সেনাবাহিনীতে উচ্চপদস্থ অফিসারদের তাঁরা বিরুদ্ধ সমালোচক ছিলেন। তাঁরা স্বার্থপরতা ও নীচতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁদের কার্যকলাপ ছিল নৈরাশ্য-প্রসূত।

সামরিক শাসনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী সামরিক শক্তির প্রভাব বিস্তার। তখন সেনাবাহিনী পরিগণিত হত জাপানী ঐতিহ্যগত প্রাচীন মূল্যবোধের আধার স্বরূপ। সেনাবাহিনীতে তখন গ্রামের মানুষেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। তাই গ্রামবাসীর দুঃখদুর্দশা সেনাবাহিনীকে বিচলিত করত।

এইকালে সেনাবাহিনীতে বিভেদ ও পরিলক্ষিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সেনাবাহিনীতে উচ্চপদের উপর যাঁদের একচেটিয়া অধিকার ছিল তাঁরা চোষু-জামদারীর অধিবাসী। ফলে চোষু সামরিক অফিসারগণকে অন্যান্য জমিদারীভুক্ত সামরিক অফিসারদের বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দের পর চোষু সামরিক অফিসারগণ এই একচেটিয়া অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সেনাবাহিনীতে এবং স্থলবাহিনীর কাউন্সিলে কিছু কিছু উচ্চপদ অ-চোষু জমিদারীর অধিবাসীদের অধিকারে আসে। তথাপি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চোষু সেনাপতিদের বংশ সেনাবাহিনীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এই সময় হনশু দ্বীপের অন্তর্গত ওকায়ামার (Okayama) অধিবাসী সেনাপতি উগাকি কাজুশিগে

(Ugaki Kazushige) স্থলবাহিনীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি চোষু জমিদারীর অধিবাসী ছিলেন না। সুতরাং অ-চোষু সেনাপতি উগাকির মন্ত্রীপদে নিয়োগে সেনাবাহিনীতে চোষু আধিপত্যের অবসান ঘটে। তথাপি চোষু এবং অ-চোষু সামরিক অফিসারদের মধ্যে একটা বৈরিভাব বিদ্যমান থেকে যায়।

সেনাবাহিনীতে বিভেদের অপর একটি রূপ ছিল। সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত অফিসারগণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—প্রথম, যাঁরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় অথবা সেনাবাহিনীর জন্য বিশেষ 'Military preparatory school' নামক সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অফিসার হিসাবে শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ ট্রেনিং স্কুলে যোগ দিতেন এবং দ্বিতীয়, যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা অর্জনের পর Army War College এ যোগদানের জন্য মনোনীত হতেন। প্রথম শ্রেণীর অফিসারগণ পরিগণিত হতেন 'নন-এলিট' বা সাধারণ শ্রেণীর অফিসার হিসাবে। এঁরাই বেসামরিক নেতাদের মত Patriotic Society গঠিত করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত অফিসারগণই সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল হতেন এবং সামরিক কাউন্সিলের সভ্য হতে পারতেন। ফলে এই দুই শ্রেণীর অফিসারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

সেনাবাহিনীতে বিভেদ এক নূতন আকারে দেখা দেয় যখন অ-চোষু অফিসারগণ নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে না পেরে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। অ-চোষু সেনাপতি উগাকির নেতৃত্বে যেমন চোষু-বিরোধী অফিসারগণ একটি দল (Clique) গঠিত করেন, তেমনি আবার চোষু-বিরোধী দলের মধ্যে অ-চোষু সেনাপতি উগাকিকে বিরোধিতা ক'রে একটি দল গড়ে ওঠে। এই উগাকি-বিরোধী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেনাপতি ইউয়েহারা (Uyehara), সেনাপতি আরাকি (Araki), সেনাপতি মাজাকি (Mazaki), সেনাপতি ইয়ানাগাওয়া (Yanagawa) প্রভৃতি। এঁরা সকলেই উগাকির চক্রান্তে সেনাবাহিনীর প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্র হতে বহিষ্কৃত হন। এই বহিষ্করণ হেতু তাঁরা উগাকি-বিরোধী শিবিরভুক্ত হন। এঁদের মধ্যে সেনাপতি আরাকি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে গঠিত ইনুকাই ক্যাবিনেটে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। উগাকি তৎকালে কোরিয়ায় অনুপস্থিত থাকায় আরাকির পক্ষে মন্ত্রিত্বপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। কিন্তু আরাকি তাঁর দুই বৎসরের কার্যকালের মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ দলকে শত্রু ক'রে তোলেন এবং ফলে সেনা-মহলে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর তাঁর সর্বপ্রথম কাজ হয় উগাকি দলভুক্ত সমর নায়কদের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদ থেকে অপসারিত করা। যেমন, মাঞ্চুরিয়া অভিযানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সেনাপতি টাটেকাওয়া-কে (Tatekawa) জেনিভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে

১৯৩২) জাপানের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন। অধিকন্তু আরাকি সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারগণের বিরাগভাজন হন। আরাকির নেতৃত্বে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা মাজাকি-কে সমর্থন জানান। এইকালে অপর একটি উগাকি-বিরোধী দল গঠিত হয় সেনাপতি এনগাতা-র (Nagata) নেতৃত্বে। পরবর্তী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে সব জাপানী সেনাপতি যোগদান করেছিলেন—যথা তোজো (Tojo), মুতো (Muto), ইমামুরা (Imamura) প্রভৃতি—তাঁরা সকলেই এনাগাতার নেতৃত্ব স্বীকার করেন। এনাগাতার ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে প্রথমে আরাকি, পরে মাজাকি পদচ্যুত হন। মাজাকির পদচ্যুতি তরুণ অফিসারগণকে অতীব বিক্ষুব্ধ করে, কারণ তাঁদের চক্ষে মাজাকি ছিলেন তাঁদের আদর্শ স্থানীয়। বিক্ষুব্ধ তরুণ অফিসারগণ তখন দলবদ্ধ হয়ে এনগাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা-গ্রহণে তৎপর হন। লেফটনাণ্ট জেনারেল আইজাওয়া (Aizawa) মাজাকির পদচ্যুতির জন্য এনগাতাকে দায়ী সাব্যস্ত ক'রে তাঁর অফিস কক্ষেই তলোয়ারের আঘাতে তাঁকে নিহত করেন। এর পর দুর্বল, শান্তিবাদী সামরিক নেতৃত্বে ক্ষুব্ধ টোকিও-তে মোতায়েন প্রথম ডিভিজনের তরুণ অফিসারগণ ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে টোকিও শহরে বিদ্রোহের নিশান উড্ডীন করে। এই টোকিও বিদ্রোহটি ছিল বিপ্লবী দক্ষিণপন্থীদের শেষ উত্থান। তরুণ অফিসারগণের নেতৃত্বে ১৪০০ বিদ্রোহী সৈনিক টোকিও শহরে সরকারী অফিস সমূহ আক্রমণ করে, এমনকি কিছু সংখ্যক ক্যাবিনেট মন্ত্রী তথা ইম্পিরিয়াল হাউসহোল্ড মিনিস্ট্রির সভ্যকে নিহত করে। এহেন 'রেন অব টেরার' চলে তিনদিন ব্যাপী। তিনদিন ধরে সেনাবাহিনী রাজধানী টোকিও শহরকে অবরোধ করে রাখে। ডায়েট, সামরিক মন্ত্রীর কার্যালয়, পদস্থ সামরিক অফিসারদের বাসস্থান, সরকারী অফিস সবই তখন বিদ্রোহীদের কবলে। মেসিনগান এবং একটি শ্লোগান উৎকলিত পতাকা সহ বিদ্রোহীরা টোকিও-র পথে পথে টহল দিতে থাকে। শ্লোগানটি ছিল সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বস্থ বিশ্বাসঘাতকগণ নিপাত যাক। প্রথমে সেনাপতিদের কেহ কেহ বিদ্রোহীদের জাতীয় পুনর্গঠনের দাবী মেটাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন কিন্তু সর্বশেষ জেনরো প্রিন্স সায়নজির (Prince Saionji) উপদেশে সম্রাট অনড় থাকেন। কার্যতঃ জাপানে তখন দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহী তরুণ অফিসারগণ এবং তাঁদের অনুগত সৈনিকেরা বেসামরিক শ্রেণীর কোন সমর্থন পান নি, এমন কি নৌবাহিনীরও। শেষ অবধি ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিদ্রোহীরা রাজদ্রোহী নামে আখ্যাত হয়। বিদ্রোহ দমনের পর টোকিওতে শান্তিশৃঙ্খলা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তৎপরতা শুরু হয়। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং সামরিক শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস দেখা যায়। বিদ্রোহী সামরিক নেতৃবৃন্দ

এবং বেসামরিক আদর্শবাদী নেতৃত্বয়—কিতা ইক্কি (Kita Ikki) এবং নিশিদা জেই (Nishida Zei)—এদের সকলের বিচারান্তে ফাঁসি হয়। উগাকি ও উগাকি-বিরোধী উভয় দলভুক্ত নেতৃস্থানীয় অফিসারদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয় অথবা তাঁরা যাতে সেনাবাহিনীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল না হতে পারেন তার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সামরিক পুলিশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। বিদ্রোহীদের দমন করার ব্যাপারে সেনাপতি তোজোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন বহু উগ্রপন্থীকে জাপানে ও মাঞ্চুরিয়াতে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যাঁরা ছিলেন বামপন্থী তাঁদের বিরুদ্ধেও সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁদের উপর নির্যাতন শুরু হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ১৫০০ সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট নেতা গ্রেপ্তার হন। পরের বৎসরেও অনুরূপ সংখ্যক সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি নেতা গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পর অনেকে কারারুদ্ধ হন। কারাবাসকালে কিছু কমুউনিস্ট নেতার তথা কমিউনিস্ট লেখক কোবাযাশি টাকিজি-র (Kobayashi Takiji) মৃত্যু ঘটে। চিন্তাধারায় উদারপন্থীরাও আক্রমণের হাত থেকে অব্যাহতি পান নি। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক তাঁর সরকার-বিরোধী মতবাদের জন্য পদচ্যুত হন। বিশ্ববিদ্যালযের প্রেসিডেণ্ট এবং আইন ফেকাল্টি এই পদচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদে কিছু অধ্যাপক পদত্যাগও করেন কিন্তু কোন ফল হয় না। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হতোযামা ইচিরো (Hatoyama Ichiro) ঘোষণা করেন যে প্রয়োজন বোধে সকল অধ্যাপকই পদত্যাগ করতে পারেন।

টোকিও বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সামরিক ও বেসামরিক উভয় শ্রেণীই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন। তরুণ প্রগতিশীল সামরিক অফিসারগণ এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। সৈন্য বাহিনীর মোট সংখ্যার তুলনায় এই বিদ্রোহীদের সংখ্যা অল্পই ছিল। জাপানী সেনাবাহিনীর সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ছিল রক্ষণশীল। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল অংশ সংখ্যালঘু প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সহযোগিতা করে নি। তাই ২৬শে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন সার্থক হয় নি।

টোকিও বিদ্রোহের পর ওকাদা মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। ওকাদার স্থলাভিষিক্ত হন হিরোতা কোকি (Hirota Koki)। হিরোতা কোকি (মার্চ ১৯৩৬—ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭) ছিলেন বেসামরিক রাজনীতিক। তাঁর সরকার গঠিত হয় মধ্যপন্থী সামরিক নেতৃবৃন্দ এবং বেসামরিক আমলাতন্ত্রের পক্ষপাতী নেতাদের নিয়ে। এই নবগঠিত সরকার সামরিক প্রভাবাধীন থাকে। তৎকালীন স্থলবাহিনীর প্রতিনিধিসূচক মন্ত্রীসভার সদস্য সেনাপতি টেরাউচি জুইচি-র (Terauchi Juichi) বিনা অনুমোদনে কোন মন্ত্রী

নিয়োগের ক্ষমতা হিরোতা কোকির ছিল না।

সামরিক শাসনের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া :

সামরিক শাসন কালে কৃষকশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয় নি। তাদের ঋণবৃদ্ধি থেকে ইহা প্রমাণিত হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কৃষি-ঋণের পরিমান ছিল ৪,০০০—৪,৮০০ মিলিয়ন ইয়েন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৬.০০০ মিলিয়ন ইয়েন।

পঞ্চবার্ষিক গম-উৎপাদন পরিকল্পনার ফলে অবশ্য গমের উৎপাদন ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলে বিদেশ থেকে গম আমদানি নিষ্প্রয়োজন হয়। গমের এই উৎপাদন বৃদ্ধি কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থান্তর ঘটায় নি, কারণ কৃষক এখন তার বিকল্প বৃত্তি গুটিপোকার চাষে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতির কারণ, জাপানে উৎপাদিত কাঁচা রেশমের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা যথেষ্ট হ্রাস পায়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের জন্যই এই চাহিদা হ্রাস পায়। কৃত্রিম রেশম উৎপাদন-শিল্পের বৃদ্ধিতেও জাপানের কাঁচা রেশমের বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুটি পোকার চাষ ছিল কৃষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি। বিদেশে রেশমের চাহিদা ও মূল্য উভয়ই হ্রাস পাওয়ায় কৃষকের গুটিপোকার চাষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে কৃষকের অর্থনৈতিক অবনতি ঘটে।

মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণ জাপানে চাষের বা চাষীর পক্ষে শুভ হয় নি অর্থাৎ চাষ তথা চাষীর উন্নতি হয় নি। পরন্তু কৃষককে মাঞ্চুরিয়া অভিযান হেতু বর্ধিত সরকারী ব্যয়ের অসমানুপাতিক ভার বহন করতে হয়। কৃষকের উপর যে কর ধার্য হয় তা সমানুপাতিক হয় নি। আয়ের তুলনায় কৃষকের দেয় করের পরিমাণ ছিল অনেক অধিক। এমন কি ব্যবসায়ী এবং কারিগরের পক্ষে দেয় কর অপেক্ষা কৃষকের দেয় কর অধিকতর ছিল।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পর জাপানী শিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। বর্ধিত পরিমাণে সামরিক উপকরণ উৎপাদন জাপানী শিল্পের উপর অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের পর জাপানে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা বৃদ্ধি পায়। জাপান তখন আমদানী করত প্রধাণতঃ কাঁচা মাল এবং অসমাপ্ত শিল্পদ্রব্য (Semi-finished commodities) এবং রপ্তানি করত সমাপ্ত শিল্পদ্রব্য (Manufactured goods)। ফলে জাপানের রপ্তানি-ব্যবসায়ে কাঁচা রেশম অপেক্ষা রেশমী বস্ত্রের প্রাধান্য দেখা দেয়। জাপান তখন রেশমী বস্ত্র রপ্তানি করত নেদারল্যান্ডস ইন্ডিজে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়। রপ্তানি ব্যবসায় বর্ধিত হারে চালু থাকে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরে লাটিন আমেরিকা ব্যবসায়ে স্থিতিসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জাপানী রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

জাপানে তখন শ্রমিক মিলত কম মজুরীতে। ইয়েনের মূল্যও হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত শিল্পযন্ত্রের আধুনিকীকরণ হয়। এই তিন কারণে জাপানের পক্ষে বিদেশী বাজারে অধিক পরিমাণে মাল রপ্তানি করা সম্ভবপর হয়। ফলে জাপানী শিল্পে কর্মতৎপরতা সৃষ্ট হয়, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি পায় নি। কারণ শিল্পোন্নতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকসম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ভাগ্য অপরিবর্তিত থাকে। অপর দিকে, জাপানী শিল্পের উন্নতিতে জাপানের সঙ্গে কানাডা, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সংঘর্ষ শুরু হয়। শেষোক্ত রাষ্ট্র তিনটি জাপানের রপ্তানি সীমিত করতে প্রয়াস পায়। জাপানের তখন বিশেষ প্রয়োজন উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশী বাজার অথচ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি তথা চীন স্ব স্ব বাজারে জাপানী শিল্পদ্রব্যের আমদানির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে জাপান বাধ্য হয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে।

সপ্তম অধ্যায়

ঘটনা প্রবাহ (১৯৩৭—১৯৭০)

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ—জাপান-মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সংঘর্ষ—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে জাপান (অকুপেশন অব জাপান)—দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধকালে জাপানের অর্থনীতি—যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুত্থান।

সামরিক শাসন (১৯৩২—৩৬) অবসানের পর বেসামরিক নেতা হিরোতা কোকির নেতৃত্বে গঠিত সরকারের উপরও সামরিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহা বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের জাপানী রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর গভীরভাবে জড়িত হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন। জাপানী প্রশাসনের উপর এরূপ ক্রমঃবর্ধমান সামরিক প্রভাব জাপানে একটি বৃহত্তর যুদ্ধের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে। জাপানের রাজনৈতিক গগনে যে একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ মাঞ্চুরিয়া দখলকালে পরিলক্ষিত হয় তা কয়েক বৎসরের মধ্যেই আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র রাজনৈতিক গগনকে আচ্ছাদিত ক'রে ফেলে। পরিণামে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শুরু হয় দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ।

১৬ই আগষ্ট ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ। রাত্রি ন ঘটিকা অতিক্রান্ত। তখন সেন্সি (Shensi) প্রদেশের রাজধানী পাওয়ান (Pao An) এ তেতাল্লিশ বৎসর বয়স্ক এক চীনা বিপ্লবীর সঙ্গে একত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক মার্কিণ সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার চলছিল। এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল চীনা বিপ্লবীর রাজনৈতিক জীবনধারা ও মতবাদের একটা সুস্পষ্ট চিত্র সংগ্রহ করা। যে কক্ষে সাক্ষাৎকার চলছিল তার দেওয়ালগুলি এবং ছাদের অভ্যন্তর ছিল প্রস্তর-নির্মিত এবং মেঝেটি ছিল ইষ্টক দ্বারা নির্মিত। কক্ষমধ্যে মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত ছিল। পার্শ্বের কক্ষে চীনা বিপ্লবীর সহধর্মিনী পীচ ফলের মোরব্বাজাতীয় আহার্য প্রস্তুতে ব্যস্ত। আর ধূমপান-রত চীনা বিপ্লবী তরুণ মার্কিণ সাংবাদিকের সম্মুখে তাঁর কর্মবহুল জীবনের একটি বহুমুখী চিত্র তুলে ধরতে ব্যাপৃত। চীনা বিপ্লবীটি মাও-সে-তুং এবং মার্কিন সাংবাদিক এডগার স্নো। উভয়ের সাক্ষাৎকারের ফলে এডগার স্নো চীনা বিপ্লবীর যে জীবনেতিহাস সংগ্রহ করেন তা লিপিবদ্ধ হয় তাঁর 'Red Star on China' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পন্ন হয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের

জুলাই মাসে। তখন দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের পটভূমিকা :

পূর্ব এশিয়ার জাপানী মনরো ডকট্রিন :

মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের রায় জাপানকে বিক্ষুব্ধ করে। বিক্ষুব্ধ জাপান এই রায়ের প্রতিবাদে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে। এর পর জাপান আত্মনিয়োগ করে মাঞ্চুরিয়ার উপর স্বীয় অধিকার সুদৃঢ় করতে এবং পূর্ব এশিয়ায় একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপন করতে। এই প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাপান যে নীতি গ্রহণ করে তা পূর্ব এশিয়ায় জাপানী মনরো ডকট্রিন (Japanese Monroe Doctrine for East Asia) নামে সুবিদিত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলি স্পেন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ইউরোপের মেটারনিক নীতিতে উদ্বুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিজোট এই বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ছিলেন জেমস মনরো (James Monroe, ১৮১৭-২৫)। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইউরোপের স্বৈরাচারী শক্তিজোটের স্পেনের উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামে অনাবশ্যক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং এক বিখ্যাত ঘোষণার দ্বারা ইউরোপীয় শক্তিজোটকে আমেরিকার কোন ব্যাপারেই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সাবধান করে দেন। 'আমেরিকা থেকে হাত গুটাও' (Hands off America)—১৮২২ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রপতি মনরোর এই তীব্র ঘোষণা বিশ্বের ইতিহাসে মনরো ডকট্রিন নামে খ্যাত। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ দ্বারা প্রভাবান্বিত রাষ্ট্রসংঘের রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জাপানও ঘোষণা করে যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যেন পূর্ব এশিয়ার কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে। জাপানের এই নীতি ঘোষিত হয় বিদেশ মন্ত্রণালয় হতে, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। বাহ্যতঃ জাপানী মনরো নীতি পরিকল্পিত হয় চীনকে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের সাম্রাজ্যবাদিতার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিন্তু নীতিটির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পূর্বএশিয়ায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদিতা কায়েমী করা। জাপান পরিগণিত হবে পূর্ব এশিয়ার শান্তির অভিভাবক হিসাবে তথা চীনের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার রক্ষক হিসাবে। পশ্চিমী দেশগুলি দূরপ্রাচ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিশ্চলতা বজায় রাখার জন্য কোন নীতি গ্রহণ করলে সে নীতি যদি জাপানের সমর্থনযোগ্য না হয় তা হলে তা কার্যকরী হবে না। জাপানী মনরো নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল : ১) জাপান সর্বদা বিদেশী শক্তিগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট কিন্তু পূর্ব এশিয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায়ের পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে একমাত্র জাপানের হাতে। এই দায়িত্ব পালন করা জাপান তার কর্তব্য হিসাবে

গণ্য করে। (২) পূর্ব এশিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র চীন ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্র জাপানের সহযোগিতা করতে পারবে না। (৩) চীনের ঐক্যসাধন, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা, এবং চীনে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রবর্তন করা জাপানের একান্ত কাম্য। (৪) অতএব চীন যেন এই সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাপানের বিরোধিতা ক'রে কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য প্রার্থনা না করে। (৫) মাঞ্চুরিয়া ও সাংহাই-এর ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যদি পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ পূর্ব এশিয়ায় সম্মিলিতভাবে প্রযুক্তি বা শিল্প-সংক্রান্ত সাহায্যদানে অথবা অর্থনৈতিক সাহায্যদানে উদ্যোগী হয় তা হলে বুঝতে হবে যে এই উদ্যোগের পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি আছে। ফলে দূরপ্রাচ্যে জটিলতার সৃষ্টি হবে। এরূপ সম্মিলিত উদ্যোগে জাপানের আপত্তি আছে। (৬) বিদেশী শক্তিবর্গ যদি চীনকে বিমান যোগান দেয় অথবা চীনে বিমান-ঘাঁটি নির্মাণে সহায়তা করে অথবা চীনে নৌবাহিনী তথা স্থলবাহিনীর শিক্ষক এবং সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করে অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থসাহায্য করে তাহলে জাপান উক্ত বিদেশী শক্তিবর্গের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন থাকবে না, চীনের সঙ্গে সম্পর্কও বন্ধুত্বপূর্ণ থাকবে না। ফলে পূর্ব এশিয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। সুতরাং জাপান এ ধরনের পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধী। মোট কথা, জাপানের ঘোষিত নীতির অর্থ হচ্ছে, পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে অর্থাৎ চীন-জাপান সম্পর্কে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যেন কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে। চীন-জাপান সম্পর্ক উভয় দেশের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই নিরূপিত হবে। ২১শে জানুয়ারী ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী হিরোতা কোকি পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিনা হস্তক্ষেপে চীন-জাপান সম্পর্ক নিরূপণের উদ্দেশ্যে ডায়েটে তিনটি নির্দেশ-সম্বলিত একটি বিবৃতি দান করেন। এই তিনটি নির্দেশ হচ্ছে—(১) চীন-জাপান সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস করতে হবে, যাতে জাপানের প্রতি চীনের সকল প্রকার বিরুদ্ধ মনোভাবের অবসান ঘটে। (২) চীন-জাপান সম্পর্ক পূর্বাবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে চীন ও মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সাধারণ অবস্থা ধারণ করে অর্থাৎ যাতে উভয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (৩) কমিউনিজম (গণ-সাম্যবাদ) উচ্ছেদের জন্য জাপানী সরকার চীনের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করবে।

এ হেন এশীয় মনরো নীতি ঘোষণার মাধ্যমে জাপান বাহ্যতঃ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদিতার বিরুদ্ধে চীনের রক্ষক হিসাবে নিজকে জাহির করলেও প্রকৃতপক্ষে এই ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল চীনের উপর জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কায়েমী করা।

(খ) উত্তর চীনের উপর প্রভাব বিস্তার :

মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের পর জাপান সমগ্র উত্তর চীনের উপর স্বীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়। উত্তর চীনের উপর জাপানী আক্রমণাত্মক নীতি প্রয়োগের প্রথম ফলশ্রুতি মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণ। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া (মাঞ্চুকুয়ো) আশাপ্রদভাবে জাপানের অর্থনৈতিক অভাব-অনটন মেটাতে পারে নি। কোয়ানটুং সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঞ্চুরিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মাঞ্চুরিয়া একটি স্বয়ং নির্ভরশীল প্রদেশ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। ফলে মাঞ্চুরিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি জাপানের শিল্পোন্নতির পুরোপুরি সম্পূরক না হয়ে বহুলাংশে প্রতিযোগিতামূলক হয়। যেমন, মাঞ্চুরিয়া থেকে আমদানি-কৃত ঢালাই-না-করা লৌহপিণ্ড (Pig Iron), শেল-অয়েল (Shale oil), রাসায়নিক লবণ প্রভৃতি ছিল জাপানী অর্থনীতিতে সম্পূরক কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার কয়লা, আমোনিয়াম সালফেট, সোডা ইত্যাদি জাপানী বাজারে আমদানি হত প্রতিযোগিতামূলক শিল্পদ্রব্য হিসাবে। ফলে মাঞ্চুরিয়া থেকে আমদানি-কৃত কিছু শিল্পদ্রব্য জাপানী বাজারে অনুরূপ জাপানী শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে তেমনি জাপানী শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের পক্ষে—যে জাতীয় শিল্পদ্রব্য মাঞ্চুরিয়াতেও উৎপাদিত হত—মাঞ্চুরিয়ার বাজার সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে মাঞ্চুরিয়ার সঙ্গে জাপানের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই কারণে জাপান কেবলমাত্র মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণ ক'রেই আত্মতৃপ্ত না থেকে সমগ্র উত্তর চীনের উপর প্রভাব বিস্তারে উদ্‌গ্রীব হয়। উত্তর চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ সার্থকভাবে শোষণ করতে পারলে জাপানী অর্থনীতিতে আশাতীত অগ্রগতি ঘটবে। এই আশায় জাপান উত্তর চীনের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। উত্তর চীনের তুলা, লৌহ; কয়লা, এবং জাপানী শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের উপযোগী সুবিস্তৃত বাজার জাপানের দৃষ্টিতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। সমগ্র উত্তর চীনকে জাপানী পকেটে পরিণত করতে পারলে জাপানী শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উত্তর চীনের বাজারের উপর জাপানের পক্ষে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন সম্ভব হবে। আবার, উত্তর চীনে মাঞ্চুরিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণস্থিত প্রদেশগুলির উপর জাপানের প্রভাব বিস্তৃত না হলে মাঞ্চুরিয়ার (মাঞ্চুকুয়োর) নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। সে দিক থেকেও জাপান উত্তর চীনকে স্বীয় প্রভাব-বহির্ভূত অবস্থায় রাখতে পারে না। উত্তর চীনকে জাপান-সাম্রাজ্যভুক্ত করা জাপান সরকারের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল, উত্তর চীনকে জাপানের অধীনে একটি স্বশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা। জেহোল (Jehol, যেটি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুকুয়োর অন্তর্ভুক্ত হয়), চাহার (Chahar), Suiyuan, এবং নিং-শিয়া (Ning—hsia) নিয়ে

গঠিত ছিল উত্তর-পশ্চিম চীন, এবং হোপেই (Hopei), সানটুং (Shantung) ও শানসি (Shansi) নিয়ে গঠিত ছিল উত্তর-দক্ষিণ চীন। এই সব অঞ্চল জাপানের প্রভাবাধীন হলে সেখানে চিয়াং কাই শেকের কুয়োমিনটাঙ ক্ষমতা বিস্তার লাভ করতে পারবে না। অতএব জাপান হোপেই প্রদেশের পূর্বাংশ নিয়ে গঠিত করে East Hopei Autonomous Council (১৯৩৫, ডিসেম্বর) এবং হোপেই-এর অবশিষ্ট অংশ এবং চাহার নিয়ে গঠিত করে Hopei-Chahar Political Council। এই দুটিই হয় জাপানের প্রভাবাধীন, তবে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রথমটির উপর জাপানী প্রভাব অধিকতর স্থাপিত হয়। কিন্তু শেষ অবধি স্ব-শাসিত অঞ্চল গঠনের মাধ্যমে সমগ্র উত্তর চীনের উপর জাপানী সরকারের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নি। এই বিফলতার প্রধান কারণ কুয়োমিনটাঙের বিরোধিতা। তথাপি উত্তর চীন সম্পূর্ণরূপে জাপানের প্রভাব বহির্ভূত হয় নি। জাপানের অধীনে অন্ততঃ দুটি স্বশাসিত অঞ্চল (উপরোক্ত) স্থাপিত হয়। জাপানের সঙ্গে এই দুই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে, মাদক দ্রব্যের ব্যবসাও চলে। এতদ্ব্যতীত মাঞ্চুরিয়ায় প্রচলিত ইয়েন মুদ্রার সঙ্গে জাপান—প্রভাবান্বিত উত্তর চীনের মুদ্রার সংযোগ (Link) স্থাপিত হয়। ফলে ইয়েলো নদীর উত্তর অঞ্চল ইয়েন মুদ্রার অঞ্চলে পরিণত হয় এবং স্বাভাবিক কারণেই জাপানী অর্থনীতির অধীন হয়। উত্তর চীনে জাপানের এহেন প্রভাব বিস্তারে চীন শঙ্কিত হয়। উভয় দেশের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়।

উত্তর চীনে জাপানের ক্ষমতাবিস্তার ছিল আত্মরক্ষামূলক। চ্যাং শো লিনের (উত্তর চীনের একদা তু-চুণ) পুত্র চ্যাং শুয়ে লিয়াং (Chang Hsueh Liang) জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের পর মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করেন। তাঁর সংকল্প হয় উত্তর চীন থেকে জাপানী প্রভাব উচ্ছেদ করা। এই সংকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে জাপান স্বীয় নিরাপত্তার জন্য কোয়ানটুঙ সেনাবাহিনীকে পেকিং ও টিয়েন্টসিন অঞ্চলে মোতায়েন করে। তখন শঙ্কিত চীন জাপানের সঙ্গে টাঙ্কু ট্রুস (Tangku Truce) নামে একটি যুদ্ধ-বিরতি সূচক সন্ধি স্বাক্ষরিত করে (২৫শে মে ১৯৩৩)। এই সন্ধির শর্তানুসারে সমগ্র পেকিং-টিয়েন্টসিন অঞ্চল থেকে চীনা সৈন্যবাহিনী অপসারিত করতে হবে এবং উক্ত অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হবে চীনা পুলিশ-বাহিনীর উপর। এরূপে পুলিশবাহিনীতে কেহই জাপান-বিরোধী থাকবে না। পেকিং থেকে টিয়েন্টসিনের মধ্য দিয়ে সানহাইকোয়ান (Sanhaikwan) পর্যন্ত রেলপথ প্রহরা দেবার জন্য জাপানের (বক্সার প্রোটোকল অনুযায়ী) স্বীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখার অধিকার থাকবে।

(গ) জাপানী প্রশাসনের উপর সামরিক প্রভাব বৃদ্ধি :

জাপানের পূর্ব এশিয়া সংক্রান্ত মনরো নীতি এবং উত্তর চীনের উপর প্রভাব বিস্তার চীন-জাপান সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধি করে। অপর কয়েকটি কারণে এই তিক্ততা ক্রমশঃ অধিকতর বৃদ্ধি পায় এবং উভয় দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ প্রশস্ত হয়। এরূপ একটি কারণ হচ্ছে জাপানী প্রশাসনের উপর চীন আক্রমণের জন্য জাপানী সেনাবাহিনীর চাপ সৃষ্টি। মাঞ্চুরিয়া দখলের পর থেকেই জাপানী প্রশাসনের উপর সামরিক চাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৩২—৩৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বেসামরিক সরকারের স্থলে সামরিক সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের পর হিরোতা কোকির নেতৃত্বে বেসামরিক সরকার গঠিত হলেও সরকার সামরিক প্রভাবাধীনই থাকে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের টোকিও বিদ্রোহ থেকে হিরোতা এই শিক্ষাই গ্রহণ করেন যে তৎকালীন দুর্দমনীয় সেনাবাহিনীর ইচ্ছানুসারে দেশ শাসন না করলে তাঁর সরকার স্থায়িত্ব লাভ করতে পারবে না। তাই তিনি সামরিক তোষণ নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন : (১) বিপজ্জনক রাজনৈতিক চিন্তা অর্থাৎ সেনাবাহিনী-বিরোধী রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ন্ত্রণের জন্য তথা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সহায়ক উপকরণাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য হিরোতা সরকার কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করেন। (২) জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য সামরিক খাতে অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। (৩) সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা অনুযায়ী হিরোতা সরকারের বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয়। এই নীতি ছিল উত্তর চীনে চাহার ইত্যাদি অঞ্চলের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং দক্ষিণ চীনে জাপানের স্বার্থ রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। (৪) ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর সঙ্গে রুশ-বিরোধী একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (Anti-Comintern Pact)। এই চুক্তির কৃত্রিম উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিজম সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, জাপান সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা আক্রান্ত হলে, জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোন সুযোগ-সুবিধা দেবে না, অথবা জার্মানী আক্রান্ত হলে, জাপান কোন সাহায্য দেবে না, ইহা সুনিশ্চিত করা। (৫) সামরিক বাহিনীর ইচ্ছানুযায়ী হিরোতা সরকার একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন এই মর্মে যে স্থলবাহিনীর এবং নৌবাহিনীর অধ্যক্ষদের মধ্যে যাঁরা কর্মরত (অর্থাৎ যাঁরা অবসর গ্রহণ করেন নি) তাঁদের মধ্য থেকেই স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রতিনিধিসূচক মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের টোকিও অভ্যুত্থানের পর যে সমস্ত সামরিক নেতা (যথা উগাকি) পদচ্যুত হন তাঁদের ভবিষ্যতে মন্ত্রীসভার সভ্য হওয়ার পথ

বন্ধ করা। ফলে হিরোতার পর অবসর-প্রাপ্ত সেনাপতি উগাকির প্রধান-মন্ত্রীত্বের দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। হিরোতার উত্তরাধিকারী হন সেনাপতি হায়াশি (Hayashi, ফেব্রুয়ারী—জুন, ১৯৩৭)।

বেসামরিক হিরোতা সরকারের উপরোক্ত বিধিবন্ধ আইনগুলি থেকে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ১৯৩২-৩৬ খৃষ্টাব্দের সামরিক শাসনের পরও বেসামরিক প্রশাসনের উপর সেনাবাহিনীর প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে।

রাজনৈতিক দলগুলি সেনাবাহিনীর এই প্রশাসনিক প্রভাবের তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে রাজনৈতিক দল ও সামরিক শক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হয় তার গ্রহণযোগ্য মীমাংসার জন্য কোনোয়ে ফুমিমারো-কে (Konoe Fumimaro, জুন ১৯৩৭-জানুয়ারী ১৯৩৯) প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়, যেহেতু তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক দল ও সেনাবাহিনী উভয়েরই একটি যোগসূত্র ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কোনোয়ে দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা করতে সমর্থ হন নি। সেনাবাহিনীর প্রশাসনের উপর প্রভাব অক্ষুণ্ণই থেকে যায়। ফলে চীনের বিরুদ্ধে জাপানের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়ে ওঠে অনিবার্য।

(ঘ) অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের (New Japanism) এর প্রকোপ :

যুদ্ধের এই অনিবার্যতার পশ্চাতে তৎকালীন জাপানে অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। সামরিক-শক্তি ভিত্তিক এ হেন অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদকে নব উন্মেষিত জাপানী মানসিকতা (New Japanism) আখ্যা দেওয়া হয়। নিউ জাপানিজম অর্থে বোঝাত তৎকালীন জাপানে অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদ (Extreme Natınalism), সমাজতন্ত্রবাদ তথা সাম্যবাদ-বিরোধী সামরিক শক্তি (Military Fascism), এবং দম্ভপূর্ণ দেশহিতৈষিতা (Chauvinism)। তৎকালীন জাপানে জাতীয়তাবাদ বলতে উগ্র জাতীয়তাবাদ বোঝাত, যাতে রাজনৈতিক উদারতার কোন স্থান ছিল না। সেনাবাহিনীর মধ্যে ফাসিস্ট মনোভাব গড়ে ওঠে। আপোষ-মীমাংসা বিরোধী সামরিক শক্তি স্বভাবতঃই চীনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। দম্ভপূর্ণ স্বাদেশিকতার পরিবেশ সৃষ্ট হয় কতকগুলি চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী সমিতির মাধ্যমে, যথা ইউজনশা (Yuzonsha)। এই সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিতা ইকিক, ওকাওয়া শুমেই (Okawa Shumei) প্রভৃতি বেসামরিক নেতৃবৃন্দ। এঁরা ছিলেন সামরিক শক্তি-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থক, যা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পর জাপানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলতঃ তখন সামরিক তথা বেসামরিক, এই উভয় শ্রেণীই চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ সমর্থন করত। ফলে ১৯৩০-এর দশকে জাপানী রাজনীতিতে উগ্রভাব প্রবল হয়। শান্তির প্রতিকূল এই উগ্রভাব জাপানকে চীনের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের

দিকে চালিত করে। জাপান উগ্র সাম্রাজ্যবাদিতার পথে পা বাড়ায়।

(ঙ) ১৯৩৩-৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদিতার উপর চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রভাব :

১৯৩৩-৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা জাপানের সাম্রাজ্যবাদিতাকে অধিকতর মদত দেয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর চীন আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও মতভেদের শিকার হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ডক্টর সান ইয়াৎ সেন অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হন। স্বল্পকালমধ্যে তিনি পদত্যাগ করেন এবং ইউয়ান শি কাই স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। ইউয়ান কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর আদর্শ ছিল রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর রাজত্বের নামকরণ করেন হুং সিয়েন (Hung-hsien)। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন তাঁর অকাল মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রজাতন্ত্র পুনর্জীবিত হয়। প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী লি ইউয়ান হুং (Li Yuan Hung) প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু এই সময় তু-চুন (War-Lord) দের আবির্ভাবে চীনের রাজনীতিতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং চীনের রাজনৈতিক একতা বিনষ্ট হয়। এই সময় কুয়োমিনটাং (কে. এম. টি) বা জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয় ক্যানটনে (Canton)। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ডক্টর সান ইয়াৎ সেন কে এম. টির সভাপতি নির্বাচিত হন। ক্যানটনের উপর পেকিং সরকারের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। সান ইয়াৎ সেন রাশিয়ার মাইকেল বোরোদিনকে (Michael Borodin) তাঁর প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করেন। বোরোদিন কে. এম. টির নূতন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং চীনের জাতীয়তা ও সোভিয়েত আন্তর্জাতীয়তার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেন। ১৯২৫ খৃটাব্দে সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর কে. এম. টির নব-নির্বাচিত নেতা হন চিয়াং কাই শেক (Chiang Kai Shek)। চিয়াং কে. এম. টির অধীনে সমগ্র চীনের ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'রে কে. এম. টির প্রধান কর্মস্থল স্থানান্তরিত করেন ক্যানটন থেকে নানকিং-এ। পেকিং-এর স্থলে নানকিং হয় জাতীয়তাবাদী সরকারের অধীনে সমগ্র সম্মিলিত চীনের রাজধানী। চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের নেতৃত্ব অর্পিত হয় চিয়াং এর উপর। রাজনীতিতে চিয়াং ছিলেন কমিউনিস্ট-বিরোধী। সুতরাং তিনি বোরোদিনকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠান এবং বহু চীনা কমিউনিস্টদের কারারুদ্ধ করেন। কোয়াংটুং (Kwangtung) এবং কোয়াংশি (Kwangsi) প্রদেশ দুটি এবং কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াং এর কমিউনিস্ট-বিরোধী মনোভাবের তীব্র

সমালোচনা করে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লিটন কমিশন কমিউনিষ্ট পার্টিকে প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বর্ণনা করে। কমিউনিষ্ট দল কে. এম. টি-র নেতৃত্বে চীনের জাতীয় একতার পয়লা নম্বরের প্রতিবন্ধকরূপে চিহ্নিত হয়। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণকালে অথবা সাংহাই এ বিদ্রোহকালে চিয়াং জাপানের বিরোধিতা করেন নি। তার প্রধান কারণ, চিয়াং এর লক্ষ্য ছিল জাপানের সহায়তায় চীনে কমিউনিষ্ট পার্টিকে দমন করা। কমিউনিজমের প্রতি চিয়াং ও জাপান সরকারের সম মনোভাব উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত রচনা করে। চিয়াং এর চক্ষে জাপান অপেক্ষা কমিউনিস্ম দেশের অধিকতর শত্রু ছিল। সেই কারণে কমিউনিষ্টদের ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে চিয়াং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ চারবার সামরিক অভিযান চালান কিন্তু তিনি তাদের কিয়াংশি (Kiangsi) ঘাঁটি থেকে অপসারিত করতে সক্ষম হন নি। অবশেষে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে চিয়াং এর পক্ষে কমিউনিষ্টদের কিয়াংসি থেকে অপসারণ করা সম্ভব হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কমিউনিষ্টদের নূতন কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় উত্তর-পশ্চিম চীনে। উত্তর-পশ্চিম চীনে জাপানের প্রভাব পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে সেখানে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হওয়ায় উত্তর চীনে জাপান এবং চীনা কমিউনিষ্টদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। উত্তর চীনে রাজনৈতিক অবস্থা জটিলতর হয় যখন চিয়াংও সেখানে সৈন্য প্রেরণ করে। কমিউনিষ্ট দল জাপান-বিরোধী শ্লোগান তুলে চীনে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। কমিউনিষ্ট শ্লোগান শুধুমাত্র দলগত প্রচারকার্য ছিল না। এ যেন ছিল রণধ্বনি। কমিউনিষ্ট দল ব্যতীত ক্যানটনের নেতৃবৃন্দও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার দাবি জানান। এই সময় চীনা কমিউনিষ্টগণ তাঁদের রাজনৈতিক কৌশল কিছুটা পরিবর্তিত ক'রে চিয়াং এর কে. এম. টির সঙ্গে হাত মেলাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে কমিউনিষ্টদের নিকট কে. এম. টির সহযোগিতা ছিল খুবই কাম্য ও গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস কমিউনিষ্ট পার্টি উত্তর চীনে কে. এম. টিকে সমর্থন জানিয়ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে কে. এম. টির সঙ্গে মৈত্রী-স্থাপনের পথ সুগম করবার উদ্দেশ্যে কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ যথা মাও সে তুং, চু তে (Chu Teh) এবং চাও এন লাই জাপান-বিরোধী গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সংস্থা (Democratic United Front) গঠন করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মাও সংস্থার উদ্দেশ্যগুলি স্থির করেন: বিদেশী আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করতে হবে; জনগণকে তাঁদের অধিকার দিতে হবে; দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধন করতে হবে; কৃষককে সাহায্য দান করতে হবে; বর্তমানে চীনে

পুঁজিবাদের বিরোধিতা না ক'রে সাম্রাজ্যবাদিতার বিরোধিতা করতে হবে। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল যে চিয়াং ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টে যোগদান ক'রে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

চিয়াং কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সহজে সম্মত হন না। নিম্নলিখিত পরিবর্তিত অবস্থার চাপে শেষ পর্যন্ত জাপান-আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন : (১) উত্তর চীনের উপর জাপানী প্রভাব বিস্তারে চীনের জনগণ স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি জানায় ; (২) চীনের জাতীয় সেনাবাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত হয় ; (৩) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পর কমিউনিস্ট দলের প্রভাব হ্রাস পায় ; (৪) ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের সিয়ান (Sian) এর ঘটনা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য চিয়াং এর উপর যে চাপ সৃষ্টি করে তাহা শেষ অবধি ফলপ্রসূ হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে চিয়াং যখন শেনসি (Shensi) প্রদেশের রাজধানী সিয়ানে কমিউনিস্টদের দমন করতে যান তখন তাঁকে নাটকীয়ভাবে হরণ ও গ্রেপ্তার করা হয়। চিয়াং এর এই গ্রেপ্তারে যাঁরা অগ্রণী হন তারা চিয়াং এরই অনুচর— চ্যাং সুয়ে লিয়াং (Chang Hsueh—Liang) এবং সেনাপতি ইয়াং হু চেং (Yang Hu-Cheng)। হরণকারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চিয়াং এর উপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে তিনি রাজনীতিতে সামরিক একনায়কতন্ত্রের স্থলে গণতন্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ করেন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটিক ইউনাইটেড ফ্রন্টের প্রস্তাবগুলিতে সম্মতি দান করেন এবং অবিলম্বে জাপানের বিরোধিতা করেন। চিয়াংকে হত্যা করাই ছিল হরণকারীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কিন্তু তাঁরা শেষ পর্যন্ত চিয়াংকে মুক্তি দান করতে সম্মত হন, যেহেতু চিয়াং তখন জাপান--বিরোধী ফ্রন্টের অপরিহার্য নেতা হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় তাঁর হত্যা কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করত। চিয়াংকে হরণ করা হয় ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁকে মুক্ত করা হয় উক্ত বৎসরের ২৫ ডিসেম্বরে। মুক্তিলাভের পর চিয়াং এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর চিয়াং এবং কমিউনিস্ট দলের মধ্যে মতৈক্য দেখা দেয়। কমিউনিস্টদের সঙ্গে চিয়াং এর এই মিলন জাপানে এক অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেশপ্রেমিক চীনারা যে উত্তর চীনের উপর জাপানের স্থায়ী প্রভাব বিস্তার মেনে নেবে না, এ বিষয়ে জাপানের কোন সন্দেহ থাকে না। চীনা কমুনিস্টদের সঙ্গে চিয়াং এর বর্তমান মিলনে জাপানের আশংকা দৃঢ় হয় যে এইবার চীনা কমুউনিস্টদল এবং কে. এম. টি একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, জাপানকে উত্তর চীন থেকে অপসারিত করবার উদ্দেশ্যে। এই সব চিন্তা ক'রে জাপান চীনের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোচনা করবার সংকল্প গ্রহণ করে। জাপানের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ

করেন জাপানী কূটনীতিক শিগেরু কাওয়াগো (Shigeru Kawagoe) এবং চীনের পক্ষ থেকে, চীনের বৈদেশিক মন্ত্রী চ্যাং চুন (Chang Chun)। আলোচনা চলে কয়েকমাস ব্যাপী। আলোচনায় জাপানের প্রস্তাবগুলি ছিল : (১) জাপান-বিরোধী আন্দোলনের অবসান ঘটাবার দায়িত্ব তথা সে আন্দোলনের পুনঃ প্রকোপ বন্ধ করার দায়িত্ব নানকিং সরকারকে নিতে হবে ; (২) উত্তর চীনে জাপানের বিশেষ অবস্থানকে স্বীকৃতি দিতে হবে ; (৩) চীনে এবং বহির্মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে জাপানী ও চীনা সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রেখে চীনকে কমিউনিজ্ম উচ্ছেদকল্পে জাপানের সহযোগিতা করতে হবে ; (৪) চীন সরকারের সমস্ত বিভাগগুলিতে জাপানী উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে ; (৫) চীন-জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে।

উক্ত জাপানী প্রস্তাবগুলির উত্তরে চীনা প্রতিনিধি নিম্নলিখিত প্রতিরূপ প্রস্তাবগুলি (Counter proposals) উপস্থাপিত করেন : (১) চীনের তীরবর্তী অঞ্চলে জাপানী, কোরীয়, ও ফরমোজাবাসী চোরাই চালান-কারীদিগকে দমন করবার জন্য জাপানকে চীনের সহযোগিতা করতে হবে ; (২) ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধবিরতির শর্তানুসারে সাংহাই এর চতুঃপার্শ্বস্থ অঞ্চলসমূহে সৈন্য মোতায়েন নিষিদ্ধ ঘোষণা ক'রে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা বাতিল করতে হবে ; (৩) ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের টাঙ্কু ট্রূস রদ করতে হবে ; (৪) হোপেই প্রদেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন না রাখার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে ; (৫) হোপেই এবং চাহার প্রদেশ দুটি থেকে জাপানী সৈন্য অপসারিত করতে হবে ; (৫) হোপেই 'অটোনমাস' অঞ্চল বাতিল করতে হবে।

এইভাবে একপক্ষের প্রস্তাব এবং অপর পক্ষের প্রতিরূপ প্রস্তাবের মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়া চলতে থাকে। কিন্তু শেষ অবধি উভয় পক্ষের মধ্যে মতৈক্য ঘটে নি। উপরন্তু এই সময় রুশ-জাপান সম্পর্কে অবনতি দেখা দেয়। এই অবনতি দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে যে জটিলতা সৃষ্টি করে তার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় চীন-জাপান সম্পর্কের উপরও। রাশিয়া চীনের মিত্ররাষ্ট্র এবং দূরপ্রাচ্যে জাপানের গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বী, এই জ্ঞানে জাপান দূরপ্রাচ্যে রাশিয়া অপেক্ষা অধিকতর শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়াস পায়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২,৪০,০০০ অথচ জাপানের সৈন্যসংখ্যা (মাঞ্চুরিয়ায় মোতায়েন) ছিল মাত্র ১,৬০,০০। এতদ্ব্যতীত জাপান অপেক্ষা রাশিয়ার অধিকতর সংখ্যক বিমান ছিল। অস্ত্রশস্ত্রে এবং যন্ত্র-ভিত্তিক শক্তিতেও রাশিয়ার স্থান জাপান অপেক্ষা উচ্চতর ছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সপ্তম কমিনটার্ণ কংগ্রেসে সোভিয়েত

সরকার ঘোষণা করেন যে জাপান ও জার্মানী ফাসিস্ট দেশ দুটি রাশিয়ার শত্রুস্থানীয়। তাই জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য রাশিয়া ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বহির্মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক আত্মরক্ষামূলক একটি চুক্তি সম্পাদিত করে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের সিয়ান ঘটনার পর কে. এম. টি ও চীনা কম্যুনিষ্টদের মধ্যে যে সাময়িক মিলন ঘটে তাহা জাপানের প্রতিকূল হওয়ায় রাশিয়ার পক্ষে অনুকুল হয়। শঙ্কিত জাপান দূরপ্রাচ্যে সামরিক শক্তিতে রাশিয়ার সমকক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধোপকরণ—উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত জাপান একবৎসর পূর্বেই জার্মনীর সঙ্গে একটি কমিনটার্ণ-বিরোধী চুক্তি সম্পাদিত করে। এ চুক্তিটি ছিল রুশ-বিরোধী। চুক্তিটি চীন-বিরোধী ও ছিল, এই অর্থে যে ইহাতে স্থির হয় যে রাশিয়াকে চীনের সাহায্যে অগ্রসর হ.ত বাধা দেওয়া হবে। চীন শংকিত হয়ে ওঠে।

(৮) লুকো-চিয়াও ঘটনা :

দূরপ্রাচ্যের এহেন রাজনৈতিক পরিবেশে ৭ই জুলাই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পেকিং এর প্রান্ত অঞ্চলে অবস্থিত লুকো-চিয়াও (Luko—Chiao) গ্রামে চীনা ও জাপানী সৈন্যদের মধ্যে একটি সংঘর্ষ বাধে। গ্রামটি ছিল পেকিং-হানকাউ (Peking—Hankow) রেলপথে মার্কো পোলো (Marco Polo) ব্রীজের সন্নিকটে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি স্বীয় অধিকারভুক্ত করতে পারলে জাপানের পক্ষে রাজধানী পেকিং শহরকে চীনের অবশিষ্টাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজসাধ্য হবে। অধিকন্তু রেলপথটির উপরও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। এই উদ্দেশ্যে জাপান লুকো চিয়াও গ্রামে কিছু সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রেখে সামরিক কুচ-কাওয়াজের ব্যবস্থা করে। লুকো চিয়াও গ্রামে জাপানের সৈন্য মোতায়েন রাখার কোন আইন সঙ্গত অধিকার না থাকায় চীন সরকার প্রতিবাদ জানায়। ফলে উভয় দেশের সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, কিছু গুলি বিনিময়ও হয়। ২৬শে জুলাই লাং ফাং (Lang Fang) অঞ্চলে পুনরায় চীনা-জাপানী সৈন্যদের মধ্যে অপর একটি সংঘর্ষ হয়। তখন জাপানী সরকার চীন সরকারের কাছে একটি চূড়ান্ত পত্র প্রেরণ করেন, এই মর্মে যে পেকিং-টিয়েণ্টসিন অঞ্চল থেকে সমস্ত চীনা সৈন্য অপসারিত করতে হবে। চীনা সেনাপতি সুং চেন ইউয়ান (Sung Chen-Yuan) চরমপত্রটি মান্য করতে অস্বীকৃত হন। তখন উক্ত অঞ্চল থেকে চীনা সৈন্য অপসারিত করবার উদ্দেশ্যে জাপান স্বীয় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। ইহা ছিল দ্বিতীয় চীন—জাপান যুদ্ধারম্ভের সংকেত স্বরূপ। কোন পক্ষই কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি। সুতরাং দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ একটি অঘোষিত

যুদ্ধ। জাপান প্রথমতঃ এই যুদ্ধকে 'চাইনা ইনসিডেন্ট' (China Incident) এবং পরে 'চাইনা অ্যাফেয়ার' (China Affair) নামে আখ্যাত করে। বৎসর দুই বাদে অর্থাৎ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। তখন দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়। চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হয় প্রকৃতপক্ষে সাংহাই অঞ্চলে। তখন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ, আগষ্ট মাস।

উত্তরে চীনের উপর জাপানের প্রভাব-বিস্তার এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তথা চীনের জাতীয় সরকারের সম্মিলিত বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত চীন-জাপান যুদ্ধ অনিবার্য ক'রে তোলে।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের গতিপথে তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় লক্ষ্যণীয়ঃ প্রথম পর্যায়, ১৩ই আগষ্ট ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সাংহাই অঞ্চলে সংঘর্ষের আরম্ভ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নানকিং এর পতন পর্যন্ত; দ্বিতীয় পর্যায়, নানকিং এর পতন থেকে অক্টোবর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ক্যানটন ও হানকাউ দখল পর্যন্ত; তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় যখন চীনের জাতীয় সরকার হানকাউ থেকে চুংকিং (Chungking) এ পশ্চাদপসরণ করে। যুদ্ধের এই তৃতীয় পর্যায়ে চীন মোটামুটি দুটি অংশে বিভক্ত হয়। পেকিং থেকে হানকাউ এর মধ্য দিয়ে ক্যানটন পর্যন্ত যদি একটি লাইন টানা যায় তাহলে সেই লাইনের পশ্চিমাংশ পরিচিত হয় স্বাধীন চীন হিসাবে এবং পূর্বাংশ (সমুদ্র পর্যন্ত) চিহ্নিত হয় জাপান কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চল রূপে। স্বাধীন চীন আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়—এক ভাগ কে. এম. টি জাতীয় সরকারের অধীনে, যার রাজধানী স্থাপিত হয় চুংকিং এ এবং দ্বিতীয়ভাগ কমিউনিষ্টদের দখলে, যাঁদের কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় ইয়েনান (Yenan) এ। জাপান-অধিকৃত চীনে দুটি শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়—পেকিং এবং নানকিং। পেকিং এ শাসনভার চীনা অফিসারদের উপর অর্পিত হয় কিন্তু শাসনকার্য পরিচালিত হয় জাপান সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী। নানকিং এর শাসনভার অর্পিত হয় জাপানীপন্থী ওয়াং চিং উই এর (Wang Ching—Wei) উপর। কার্যতঃ নানকিং সরকার হয় জাপানের অধীন।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর প্রতিক্রিয়াঃ

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ দীর্ঘকাল বিবদমান রাষ্ট্রদুটির মধ্যে সীমিত থাকে নাই। এই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যার ফলে পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলিও স্ব স্ব স্বার্থে চীন-জাপান যুদ্ধে বিজড়িত হয়ে পড়ে। এই সকল দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতালি, জার্মানি, বৃটেন ও সর্বোপরি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। রাষ্ট্রসংঘও নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে জাপান ছিল ইতালি ও জার্মানীর শিবিরভুক্ত। এই তিনটি দেশই ছিল রাশিয়া-বিরোধী 'এ্যাণ্টি কমিনটার্ন প্যাক্টের' সদস্য। তিনটি দেশই রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ ক'রে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম-মনোভাবের পরিচয় দেয়। যদিও ইতালি ও জার্মানীর সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল তথাপি জাপানের চাপে সাড়া দিয়ে ইতালি ও জার্মানী বর্তমান যুদ্ধে চীনকে সহায়তা করা থেকে বিরত হয়। চিয়াংকে সেনাবাহিনী গঠনে সাহায্যার্থে চীনে পূর্বেই প্রেরিত জার্মান মিলিটারি মিশন জাপানের চাপে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নানকিং পতনের পর প্রত্যাহৃত হয়। এর পরও অবশ্য জার্মানী চীন সরকারকে সামরিক উপকরণ বিক্রয় করতে থাকে। কূটনীতি বড় জটিল। বৃটেন জাপানের সমর্থক না হওয়া সত্ত্বেও চীনের পক্ষ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় নি। যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকেই জাপানের বিরুদ্ধে এবং চীনের সমর্থনে যুদ্ধে যোগদানের সংকল্প গ্রহণ করে। চীনের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক অখণ্ডতা বজায় রাখবার সংকল্প গ্রহণ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিশেষ বিরাগভাজন হয়। ১৬ই নভেম্বর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। যদিও এই স্বীকৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক উন্নতিসাধন, তথাপি এই স্বীকৃতির যে একটা রাজনৈতিক দিক ছিল তা বুঝতে জাপানের বিলম্ব হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে চীনের আক্রমণকারী দেশ হিসাবে ঘোষণা করে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ন্যায় এবারেও অর্থাৎ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চীন সরকার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জাপানের বিরুদ্ধে সুবিচারের আশায় রাষ্ট্রসংঘের দরবারে অভিযোগ উপস্থাপিত করে। ৫ই অক্টোবর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের ফার ইস্টার্ন অ্যাডভাইজারি কমিটি (Far Eastern Advisory Committee) রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার (Assembly) নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করে। সেই রিপোর্টে ইহা বিবৃত হয় যে জাপান নবশক্তি সন্ধি (১৯২১) এবং প্যারিস চুক্তি (১৯২৮) লঙ্ঘন ক'রে যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়েছে। রিপোর্টটিতে এই সঙ্গে সুপারিশ করা হয় যে নবশক্তি সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি যেন চীন-জাপান সমস্যাগুলির সমাধান সাধিত ক'রে যুদ্ধের অবসান ঘটায়। ৬ই অক্টোবর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভা অ্যাডভাইজারি কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রও উক্ত সুপারিশে সম্মতি দান করে। এই সুপারিশ অনুযায়ী ওয়াশিংটন সম্মেলনে স্বাক্ষরিত নবশক্তি সন্ধির স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি ৩রা নভেম্বর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস এ একটি সম্মেলনে মিলিত হন। জাপান সম্মেলনে যোগদান করে নি। সোভিয়েত দেশ ও জার্মানী নবশক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্র না হওয়া সত্ত্বেও ব্রাসেলস্ সম্মেলনে

যোগদান করতে আমন্ত্রিত হয়। সোভিয়েত দেশের প্রতিনিধি যোগ দেন এবং জাপানের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। জার্মানী কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করে নি। জাপানের অনুপস্থিতি হেতু জাপানের বক্তব্য পেশ করে ইতালির প্রতিনিধি কিন্তু মধ্যস্থের মাধ্যমে উপস্থাপিত জাপানের বক্তব্য সম্মেলনে গ্রহণযোগ্য হয় নি। অতঃপর ২৪শে নভেম্বর সম্মেলনে গৃহীত নীতি সমূহের এবং আলোচিত বিষয়গুলির একটি বিবরণ প্রকাশের পর সম্মেলনটি স্থগিত রাখা হয়।

ব্রাসেলস সম্মেলনের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে জাপান, নানকিং, ক্যানটন, হানকাউ প্রভৃতি অঞ্চল একের পর এক জয় করতে থাকে। বিজিত অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক বিভব শোষণ করবার উদ্দেশ্যে ৩রা নভেম্বর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন জাপানী প্রধানমন্ত্রী কোনোয়ে একটি নূতন নীতি ঘোষণা করেন, যা পূর্ব এশিয়ার নব বিধান (New Order in Fast Asia) নামে পরিচিত। এই 'নিউ অর্ডার' এর মূল উদ্দেশ্যগুলি ছিল—(১) চীনের অর্থনীতির উপর বহুলাংশে জাপানের একচেটিয়া অধিকার স্থাপন এবং (২) চীনের জাতীয়তাবাদী সরকার যেন বিদেশ থেকে কোন সামরিক সাহায্য না পান তার ব্যবস্থা গ্রহণ। এতদ্ব্যতীত 'নিউ অর্ডার'-এর অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি ছিল— চিয়াং এর পরিবর্তে এমন এক নেতাকে চীনা প্রশাসনের প্রধান করা যিনি টোকিওর নির্দেশ অনুসারে তথা টোকিওর সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে দেশ শাসনে ইচ্ছুক; চীনে তথা সমগ্র পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে তৎপরিবর্তে জাপানী সাম্রাজ্যবাদিতা প্রবর্তন; চীন-জাপান সহযোগিতার মাধ্যমে কমিউনিজ-আক্রান্ত অঞ্চলসমূহ থেকে কমিউনিজম উচ্ছেদকরণ এবং তজ্জন্য চীনের উত্তরে বাইকল হ্রদের (Lake Baikal) পূর্বাঞ্চল থেকে রাশিয়ার প্রভাবের বিনাশ-সাধন; জাপান, মাঞ্চুকুয়ো, এবং চীনকে মিলিতভাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই অঞ্চলে যাতে অ-জাপানী ব্যবসা এবং মূলধন বিনিয়োগ বন্ধ হয় তারও ব্যবস্থা গ্রহণ।

এ হেন 'নিউ অর্ডার' বা নব বিধান থেকে উপকৃত হয় একমাত্র জাপান। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি, বিশেষতঃ বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নব বিধানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং জাপানের উপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি ক'রে জাপানকে তার নব বিধানের পরিকল্পনা পরিহারে বাধ্য করতে বৃথাই চেষ্টা করে। পাশ্চাত্ত্য চাপের বিরুদ্ধে জাপান পাল্টা চাপ দেয়, নূতন নূতন অঞ্চল স্বীয় দখলভুক্ত ক'রে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুনে জাপান টিয়েন্টসিনে অবস্থিত বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা অবরোধ করে এবং ফরাসী তথা বৃটিশ নাগরিকদের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ বৃটিশ নাগরিকদের বিরুদ্ধে, এমন

ব্যবস্থা গ্রহণ করে যার ফলে তাঁরা এক অপমানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। বৃটেনের বাণিজ্যেও হস্তক্ষেপ করা হয়।

জাপানের এহেন নব বিধান (নিউ অর্ডার) এবং এশিয়া মহাদেশ থেকে বৈদেশিক শক্তি উচ্ছেদ ক'রে এশিয়ার মুক্তিদাতারূপে জাপানের ভূমিকা গ্রহণের প্রচেষ্টা স্বাভাবিক কারণেই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে উদ্বিগ্ন ক'রে তোলে। উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ উদাসীন বা নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা পরিহারপূর্বক চীনের স্বপক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। ফলে দ্বিতীয় চীন-জাপান সংঘর্ষ একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধের রূপ ধারণ করে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে জাপান হানকাও দখল করে। হানকাউ এর পতনের পর দ্বিতীয় চীন-জাপান সংঘর্ষ ধীরে ধীরে পর্যবসিত হয় একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধে। বিবদমান চীন-জাপান ব্যতীত ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কেহ কেহ চীনের পক্ষ অবলম্বন করে, কেহ কেহ বা জাপানের সহযোগিতা করে। ফলে চীন-জাপান যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট শক্তিবর্গ দুটি যুদ্ধ-শিবিরে বিভক্ত হয়—রোম-বার্লিন-টোকিও শিবির এবং চীন-বৃটেন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত রাশিয়া শিবির। ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন এবং জার্মানীর হিটলারের মধ্যে স্বাক্ষরিত মিউনিক চুক্তি জাপানের নিকট বৃটিশ শক্তির দুর্বলতার পরিচায়ক হিসাবে গণ্য হয়। জাপানের তখন এই প্রত্যয় জন্মে যে রাজ্যজয়ের পথে বৃটিশ সরকারের নিকট হতে কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা নাই। তখন জাপান ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর ক্যানটন এবং ২৫শে অক্টোবর হানকাউ দখল করে। এরপর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে জাপান হাইনান (Hainan, হংকঙের দক্ষিণে অবস্থিত) এবং স্প্রাটলি (Spratley, সাইগনের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত) দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরে ঘোষিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর জাপান, জার্মানী ও ইতালি একত্রে তাদের রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী অ্যান্টি কমিনটার্ণ চুক্তিকে একটি সামরিক শর্ত-ভিত্তিক মিত্রতায় (Military Alliance) পরিণত করে। এই মিত্রতা রোম-বার্লিন-টোকিও এক্সিস (Axis) নামে প্রসিদ্ধ। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাপান যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্তমহাসাগরস্থিত পার্ল হারবার বন্দরে বোমা নিক্ষেপ করে। পরের দিন বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস্ ইস্ট ইন্ডিজ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানী ও ইতালি জাপানের মিত্র হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ১১ই ডিসেম্বর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে। ফলে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরিণতি লাভ করে। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ (১৯৩৭-৪৫) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) প্রায় সমকালীন।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ চলাকালীন যখন যুক্তরাষ্ট্র ঘটনাচক্রে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন এই জাপান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘর্ষ মূলতঃ প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলে সীমিত থাকে। সেই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদানের পর দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধকে প্রশান্তমহাসাগরীয় সংঘর্ষ (Pacific conflict) হিসাবে আখ্যাত করা হয়। প্রশ্ন জাগে, দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ চলাকালে জাপান-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ ছিল, কিভাবে দেশ দুটির মধ্যে ধীরে ধীরে বৈরী মনোভাব গড়ে ওঠে এবং পরিণামে যুদ্ধের প্রকৃতি কিরূপ দাঁড়ায় ?

জাপান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক (১৯৩৭-৪৫) :

রাজনৈতিক ব্যাপারে জাপানের সংস্রব ছিল এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সঙ্গে নয়। তবে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলে জাপান প্রতিবাদ করত এবং ফলে জাপানকে হস্তক্ষেপকারী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষেও লিপ্ত হতে হত। যুক্তরাষ্ট্রের দূরপ্রাচ্যে স্বার্থ ছিল বাণিজ্য-ব্যবসা সংক্রান্ত। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের ফলে মাঞ্চুরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনায় যুক্তরাষ্ট্র শঙ্কিত হয় এবং মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে একমত হয়ে প্রতিবাদ জানায়। স্টিমশন নীতি (Stimson Doctrine) অনুসরণে যুক্তরাষ্ট্র মাঞ্চুকুয়োকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানে অস্বীকৃত হয়। এতে জাপান উষ্মা প্রকাশ করে। উভয় দেশের সম্পর্কে তিক্ততা শুরু হয়।

এই তিক্ততা বৃদ্ধি পায় যখন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে জাপান চীন আক্রমণ করে। চীনের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক অখণ্ডতার সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। জাপানের উপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিরূপ রায় যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে। ব্রাসেলস্ সম্মেলনে (৩-২৪ নভেম্বর, ১৯৩৭) যোগদান ক'রে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের আক্রমণ নীতির তীব্র সমালোচনা করে। ব্রাসেলস্ সম্মেলনের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে জাপান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত করে যে এশিয়ার রাজনীতিতে কোন তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না। যুক্তরাষ্ট্র শঙ্কিত হয়।

জাপান-অধিকৃত অঞ্চলসমূহে, বিশেষতঃ উত্তর চীনে জাপানী সরকার ইচ্ছামত ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিময় পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করেন এবং আমদানি-রপ্তানি করা দ্রব্যাদির উপর ধার্য পণ্যশুল্কের পরিবর্তন সাধন করেন। জাপানের এ হেন আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ৬ই অক্টোবর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে একটি পত্র (Note) প্রেরণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় জাপানের উক্ত কার্যাদি মুক্তদ্বার নীতির পরিপন্থী। জাপান নোটের উত্তর প্রেরণ করে

১৮ই নভেম্বর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। এই উত্তরে যুক্তরাষ্ট্রের সকল অভিযোগ খণ্ডন ক'রে জাপান জানায় যে উত্তর চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে না। ৩রা নভেম্বর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের 'নিউ অর্ডার' উল্লেখ ক'রে জাপান উক্ত নোটে অধিকন্তু জানায় যে এশিয়া মহাদেশে জাপানের কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যুক্তরাষ্ট্র শঙ্কিত হয়।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ে সচেষ্ট হয়। তজ্জন্য বৃটেন, জার্মানী এবং ইতালি এই তিন দেশের যে কোন একটির সঙ্গে জাপান মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী হয়। স্থলবাহিনী তথা নৌবাহিনীর নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ, এমন কি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হিরানুমা (Hiranuma, জানুয়ারী—অগাস্ট, ১৯৩৯) জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু জার্মানী এই আগ্রহ আগ্রাহ্য ক'রে রাশিয়ার সঙ্গে একটা অনাক্রমণাত্মক চুক্তি (Non-Aggression Pact) সম্পাদিত করে অগাস্ট ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। অপদস্থ হিরানুমা প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন জাপানের বৈদেশিক নীতিতে একটা অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একাধিক জাপানী নেতা ফ্রান্স বা বৃটেনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন, এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ও সম্পর্কের উন্নতি সাধনের প্রস্তাব করেন। ফ্রান্স ও বৃটেন জাপানের দিকে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করবার মানসিকতা দেখালেও যুক্তরাষ্ট্র কোন প্রকার অনুকূল সাড়া দেয় না। তৎকালীন মার্কিণ সেক্রেটারী অব স্টেট কর্ডেল হাল (Cordell Hull) চীনের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জাপানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে পুনরায় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বসন্তের (spring) শেষাশে ইউরোপের রণাঙ্গনে জার্মানী একের পর এক অঞ্চল জয় ক'রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এমন কি জার্মানীর হাতে বৃটেনের পরাজয়ও আসন্ন হয়ে ওঠে। তখন জাপানী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কোনোয়ে (Konoe), যিনি দ্বিতীয়বার মন্ত্রীসভা গঠন করেন জুলাই, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। তাঁর এই দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা ছিল যুদ্ধ-প্রবণ। জেনারেল তোজো এবং মাৎসুয়োকা যোসুকে (Matsuoka yosuke)—এই দুই সমসাময়িক যুদ্ধ-প্রিয় নেতা কোনায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভায় স্থান পান। জেনারেল তোজো ছিলেন যুদ্ধ-মন্ত্রী (War-minister) এবং মাৎসুয়োকা, বিদেশমন্ত্রী। কর্ডেল হালের বিবেচনায় মাৎসুয়োকা ছিলেন এক বক্রমনোভাবাপন্ন জাপানী নেতা, যেন একটি মাছ-ধরা বঁড়শীর ছুপাড়ি। এই পরিস্থিতিতে কোনোয়ে সরকার দুর্ধর্ষ জার্মানীর সঙ্গে ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে একটি চুক্তি সম্পাদিত করে, যে চুক্তিটি রোম-বার্লিন-টোকিও এক্সিস নামে পরিচিত। এই

চুক্তিটা ছিল মূলতঃ যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী। এই চুক্তিটির স্বাক্ষরের ফলে দূরপ্রাচ্যের পুরাতন যুদ্ধ (অর্থাৎ দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ) এবং ইউরোপের নূতন যুদ্ধ (অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) যেন পরস্পরের নিকটবর্তী হয় এবং ইউরোপের সংকট দূরপ্রাচ্যের সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্র পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জাপান-বিরোধী হয়ে ওঠে।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের এক্সিস থেকে জাপানের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা ছিল ঃ (১) জার্মানী রাশিয়ার সঙ্গে পূর্বেই একটি অনাক্রমণাত্মক চুক্তি সম্পাদিত করে। জার্মানী এখন জাপানের সঙ্গে একই শৃঙ্খলভুক্ত। কাজেই জার্মানীর সাহায্যে জাপানের পক্ষে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি-সাধন করা সম্ভবপর বিবেচিত হয়। (২) জার্মানী কর্তৃক পরাজিত এশীয় উপনিবেশগুলি যাতে জাপানের 'নিউ অর্ডার' এর অধীনে আসে তজ্জন্য জাপান জার্মানীর নিকট সুপারিশ করতে পারবে। (৩) জার্মানির সাহায্যে জাপান চীনের সঙ্গে যুদ্ধের আশু অবসান ঘটাতে পারবে। (৪) সর্বোপরি, দূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। অপরদিকে, এক্সিস স্বাক্ষরের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের ভাবমূর্তি অনেকটা বিনষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্র পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জাপান-বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে থাকে—অনেকটা যেন Antonio সম্পর্কে Shylock এর বিরূপ মনোভাব—একবার আয়ত্তে আনার সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নেব।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপান সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছিল যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ফলতঃ ১৯৩১ থেকে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে পার্ল হারবারের উপর বোমা বর্ষণের পূর্ব পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র দূরপ্রাচ্যের ব্যাপারে তিনটি নীতি অনুসরণ করে—মুক্তদ্বার নীতি, চীনের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার নীতি, এবং আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকার নীতি। জাপান যখন চীনের বিভিন্ন শহরের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবাণী সত্ত্বেও যখন জাপান চীনের দক্ষিণে অগ্রসর হয়, তখন মার্কিণ সরকার বাধ্য হন জাপানের উপর অনুগ্র অর্থনৈতিক চাপ আরোপ করতে, যথা যুক্তরাষ্ট্র জুলাই ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে গেসোলীন সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং সেপ্টেম্বরে ইস্পাত তথা পরিত্যক্ত লোহালক্কড়ের (Scrap iron) সরবরাহের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

সেপ্টেম্বর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রোম-বার্লিন-টোকিও এক্সিস স্বাক্ষরিত হওয়ার পর জাপান সরকার বিদেশমন্ত্রী মাৎসুয়োকা-কে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা

---

(১) "If I can catch him once upon the heap, I wll feed fat the ancient grudge I bear him"—Merchant of Venice.

নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ইউরোপ সফরে প্রেরণ করেন। রোম ও বার্লিন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মাৎসুয়োকা মস্কোতে যাত্রাভঙ্গ করেন এবং সোভিয়েত দেশ ও জাপানের মধ্যে একটি নিরপেক্ষ চুক্তি (Neutrality Pact, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪১) স্বাক্ষরিত করেন। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে উভয় দেশ পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা মান্য করবে এবং কোন তৃতীয় শক্তি উহাদের একটিকে আক্রমণ করলে, অপরটি নিরপেক্ষ থাকবে। সুতরাং আমেরিকা জাপানকে আক্রমণ করলে রাশিয়া, চুক্তিটির শর্তানুযায়ী, আমেরিকার সঙ্গে যোগদান করতে পারবে না। এইভাবে ইতালি, জার্মানি ও রাশিয়ার সহযোগিতা লাভ ক'রে জাপান দূরপ্রাচ্যের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে কোণ ঠেলার প্রয়াস পায়। শঙ্কিত যুক্তরাষ্ট্র রাজনীতির দাবাখেলায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে।

রুজভেল্ট তৃতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবার পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার মার্চ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে লেণ্ড-লিজ বিল (Lend-Lease Bill) বিধিবদ্ধ করেন। তখন রুজভেল্ট সরকার চীনকে আর্থিক সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একই সময়ে জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য সীমিত করার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিক থেকেই যুক্তরাষ্ট্র জাপানে বহু গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের রপ্তানি প্রায় বন্ধ করে, যথা লৌহ, ইস্পাত, বহু প্রয়োজনীয় ধাতু, যন্ত্রপাতি, উচ্চমানের গেসোলীন ইত্যাদি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র জাপানে পেট্রল রপ্তানি বন্ধ করেনি পাছে পেট্রলের উপর নিষেধাজ্ঞাকে অজুহাত ক'রে জাপান নেদারল্যাণ্ডস্ ইস্ট ইণ্ডিজের তৈল উৎপাদন কেন্দ্র অধিগ্রহণ করে।

এরূপ পরিস্থিতিতে উভয় দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু কেহই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। পরন্তু উভয় দেশই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যাসমূহের সমাধানের সূত্র অনুসন্ধানে আগ্রহ প্রকাশ করে। এপ্রিল ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যখন জাপানী অ্যাডমিরাল নোমুরা (Admiral Nomura) যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হয়ে ওয়াশিংটনে কার্যভার গ্রহণ করেন তখন এই আলোচনার পথ প্রশস্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মার্কিণ সেক্রেটারি অব স্টেট, কর্ডেল হাল। নোমুরা-হাল আলোচনা শুরু হয় ১৬ই এপ্রিল ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রুশ—জাপান নিউট্রালিটি প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হবার তিন দিন পরে। আলোচনা চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র নিম্নলিখিত চারটি নীতির ভিত্তিতে ঐক্য স্থাপনের প্রস্তাব করে: (১) প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌম ক্ষমতা মান্য করা; (২) অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা; (৩) সমতার নীতি, বিশেষতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে সমতার নীতি, সমর্থন করা; (৪) শান্তিপূর্ণ পন্থা ভিন্ন অন্য কোন

পর্দ্ধতি অবলম্বনে প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থা (Status Quo) ভঙ্গ না করা।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগুলির উত্তরে জাপান নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করে: (১) রোম-বার্লিন-টোকিও ত্রিশক্তি এক্সিসে যোগদানের ফলে জাপান যে সামরিক বাধ্যবাধকতার বন্ধ হয় তা জাপান মেনে চলবে। এতে যুক্তরাষ্ট্রকে সম্মত হতে হবে। (২) ইউরোপীয় কোন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বিবদমান কোন একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপর বিবদমান ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে সমর্থন করবে না। (৩) জাপান সরকার এবং নানকিং এর Wang Ching-Wei সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চীন সম্বন্ধীয় চুক্তির শর্তাদি যুক্তরাষ্ট্র মান্য করবে। ৩০শে মার্চ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জাপান উত্তর চীনে চিয়াং সরকারের বিকল্প সরকার হিসাবে Wang Ching-Wei এর নেতৃত্বে নানকিং এ একটি স্বাধীন সরকার গঠন করে। এই স্বাধীন সরকারের সঙ্গে জাপানের একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে, উত্তর চীনে কমিউনিজম দ্বারা প্রভাবান্বিত অঞ্চলগুলি বাদে অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি থেকে দুই বৎসরের মধ্যে জাপানী সৈন্য অপসারিত হবে, (২) উত্তর চীনে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে জাপানী আধিপত্য বজায় রাখতে হবে, (৩) চীনের অবশিষ্ট অংশে জাপানের প্রভূত প্রভাব বজায় থাকবে। নোমুরা কর্ডেল হালের নিকট প্রস্তাব করেন যে এ হেন চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে মান্য করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির উপর কর্ডেল হাল ও নোমুরার মধ্যে আলোচনা চলে এপ্রিল ১৯৪১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৪১ পর্যন্ত, যখন জাপান যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার বন্দরের উপর বোমা বর্ষণ করে। উক্ত আলোচনা চলাকালীন জুন মাসে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করে। উভয় দেশের সঙ্গেই তখন জাপান চুক্তিবন্ধ। রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি (Neutrality pact) ছিল যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকা, অপর পক্ষে জার্মানীর সঙ্গে চুক্ত (রোম-বার্লিন-টোকিও এক্সিস) ছিল যুদ্ধকালে জার্মানীকে সশস্ত্র সাহায্য দেওয়া। জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের নিকট হতে সামরিক সাহায্য দাবি করলে জাপান উভয় সংকটে পড়ে। জাপানী সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। অবশেষে স্থির হয় যে রুশ-জার্মান যুদ্ধে জাপানী সেনাবাহিনী জার্মানীর সঙ্গে যোগ দেবে না, পরন্তু রাশিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষ চুক্তির প্রাপ্ত সম্মান প্রদর্শন করবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্থির হয় যে জাপানী সেনাবাহিনী দক্ষিণ ইন্দোচীনের দিকে অগ্রসর হবে এবং রাশিয়ার পরাজয় আসন্ন হলে ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগদান করবে। জুলাই ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জাপানী সৈন্য দক্ষিণ ইন্দোচীনে প্রবেশ করে এবং ভিসি (Vichy) সরকারের কাছ থেকে কিছু নূতন সামরিক ঘাঁটি দাবি করে। জাপানী সৈন্য ইন্দোচীনে প্রবেশ করায়

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ প্রতিবাদমুখর হয় এবং জাপানে সকল প্রকার রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে জাপানে বিশেষতঃ তৈল আমদানি পূর্বাপেক্ষা দশ শতাংশ হ্রাস পায়। জাপানকে তৈল সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জাপানী নেতৃবৃন্দের অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই সঙ্গত মনে করেন, যদি অক্টোবর নাগাদ তৈল সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোন আপোষ মীমাংসা না হয়। যুদ্ধের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তৎকালীন নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ বলেন—'জাপান যেন একটি গুরুতর অসুস্থ রোগীবিশেষ। তার উপর অস্ত্রোপচার অতীব বিপজ্জনক হলেও তার জীবন রক্ষা করবে।' তথাপি তৈল সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। তৈল সমস্যার কূটনৈতিক সমাধানের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে জুলাই ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় কোনোয়ে সরকারের পতন হয়। উক্ত মাসেই কোনোয়ে তৃতীয়বার সরকার গঠন করেন। তিনি তাঁর তৃতীয় মন্ত্রীসভা থেকে জার্মানি-সমর্থক বিদেশমন্ত্রী মাৎসুয়োকা-কে অপসারিত করেন। এর পর কোনোয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন কিন্তু কর্ডেল হালের বিরোধিতায় সে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় নি। ১৮ই অক্টোবর, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কোনোয়ে পদত্যাগ করলে জেনারেল তোজো প্রধানমন্ত্রী হন। তোজো ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষপাতী। ৫ই নভেম্বর, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তোজো মন্ত্রীসভায় স্থির হয়ঃ জাপান-যুক্তরাষ্ট্র সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য জাপান যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আর এক দফা নূতন প্রস্তাব উপস্থাপিত করবে। এই নূতন প্রস্তাব ২৫শে নভেম্বর নাগাদ গৃহীত হওয়া চায়। নচেৎ যুদ্ধ ঘোষিত হবে, পার্লহারবার বন্দর, ম্যানিলা ও সিঙ্গাপুর যুগপৎ আক্রান্ত হবে। কুরুসু সবুরো (Kurusu Saburo) নামে এক জাপানী দূত নূতন প্রস্তাব নিয়ে ওয়াশিংটনে উপস্থিত হন ১৭ই নভেম্বর। ২০শে নভেম্বর নূতন প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয় এবং একই সময়ে একটি জাপানী নৌবাহিনী পার্লহারবার বন্দরের দিকে অগ্রসর হয়। নূতন প্রস্তাব ছিলঃ জাপান ইন্দোচীন থেকে সৈন্য অপসারিত করবে এবং তৎপরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র জাপানে তৈল রপ্তানির উপর পূর্ব আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে এবং চীনের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করবে না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জাপানের এই নূতন প্রস্তাব বিবেচনায় আগ্রহ প্রকাশ করলেও কর্ডেল হাল বাদ সাধেন। তাঁর আশংকা ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র অকস্মাৎ তার নীতি পরিবর্তন করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৃটেন, হল্যান্ড ও চীনের সম্পর্কে চিড় ধরবে। সুতরাং জাপানের উক্ত নূতন প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে কর্ডেল হাল জাপান-যুক্তরাষ্ট্র সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ২৬শে

নভেম্বর নমুরাকে দশ-দফা শর্ত সম্বলিত একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন। এই দশ-দফা শর্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: বৃটেন, নেদারল্যাণ্ডস, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানকে একটি বহুভুজ অনাক্রমণাত্মক চুক্তি সম্পাদিত করতে হবে; ফরাসী ইন্দোচীনের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা স্বীকার করতে হবে; ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বদেশের সমান অধিকারের নীতি সমর্থন করতে হবে; জাপান কেবলমাত্র চীনের জাতীয়তাবাদী (কে. এম. টি) সরকারের সঙ্গে সংস্রব রাখবে; ইন্দোচীন এবং চীন (মাঞ্চুরিয়া সহ) থেকে সৈন্য অপসারিত করতে হবে; জাপান চীনে সকল প্রকার অতিরাষ্ট্রিক অধিকার পরিহার করবে; রোম-বার্লিন-টোকিও ত্রিশক্তি চুক্তির আওতা থেকে জাপান প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলকে বাদ দেবে। জাপান এই সকল শর্তের বাধ্যবাধকতা মান্য করলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার জাপানে তৈল রপ্তানির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে এবং ডলার ও ইয়েনের মধ্যে মূল্যের হারে স্থিরতা প্রবর্তনে সাহায্য করবে।

উপরোক্ত শর্তাদি সম্বলিত স্মারকপত্রটি প্রাপ্তির পর জাপান সরকার যুদ্ধ ঘোষণার অনড় সংকল্প গ্রহণ করেন। জাপান সম্রাট ১লা ডিসেম্বর (১৯৪১) তোজো মন্ত্রীসভার যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। জাপান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যুক্তরাষ্ট্রেও রাজনৈতিক মহল সুনিশ্চিত যে যুদ্ধারম্ভের কাল (Zero hour) আসন্ন। তথাপি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট শান্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য না হোক, অন্ততঃ যুদ্ধ-ঘোষণা কিছু বিলম্বিত করবার জন্য শেষ চেষ্টা করেন। তিনি সেই উদ্দেশ্যে জাপান সম্রাট হিরোহিতোর নিকট একটি আবেদন প্রেরণ করেন। এই আবেদন প্রেরণের তারিখ ৬ই ডিসেম্বর। এই আবেদন সম্রাটের হস্তগত হয় অতিরিক্ত বিলম্বে। ৭ই ডিসেম্বর তোজো সরকার যুক্তরাষ্ট্রের ২৬শে নভেম্বরের দশ-দফা সম্বলিত স্মারকপত্রের উত্তর প্রেরণ করেন নোমুরা ও কুরুসু মারফত। তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে উত্তরটি যেন এক ঘটিকায় (যুক্তরাষ্ট্রের সময়) পৌঁছে দেওয়া হয়। উত্তরটিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের সকল অভিযোগের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত হয় এবং মার্কিণ সরকারকে অবহিত করা হয় যে অভিযোগ সমূহের দূরীকরণ-সূচক সফল আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। উত্তরটি কর্ডেল হালের হাতে দেওয়া হয় ২০ মিনিট গতে দুই ঘটিকায়। হাল পূর্বেই অবগত হন যে জাপান পার্লহারবার বন্দর আক্রমণ করেছে। সুতরাং হাল উত্তরটি গ্রহণ ক'রে মন্তব্য করেন—এটি মিথ্যার ঝুড়ি। তারপর পত্রবাহকদের বিদায় দেন।

৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবারের উপর জাপানী বোমা বর্ষণ জাপান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘর্ষ অথবা প্রশান্তমহাসাগরীয় (Pacific) যুদ্ধ সূচনা করে। পার্লহারবার আক্রমণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাতটি যুদ্ধ-জাহাজ, অসংখ্য ছোট ছোট

অর্ণবপোত এবং বন্দরটির নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন বিমানের অর্ধেক অংশ বিধ্বংস হয়। জাপানের আক্রমণকারী বিমানগুলি আমেরিকার রেডারে ধরা পড়লেও আমেরিকার বিমানবাহিনী তার প্রতিরোধ করে নি। ইহা আমেরিকার যুদ্ধোচিত মানসিকতার অভাবের পরিচায়ক।

প্যাসিফিক যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ প্রথম ছয় মাসে জাপানের অগ্রগতি ছিল চমকপ্রদ। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া জাপানের অধিকারে আসে। কিন্তু তারপর অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে জাপানের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ম্যাকার্থারের রণকৌশলে মূলে জাপান তার সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং জাপানের শিল্পাঞ্চলগুলি বোমাবর্ষণে বিধ্বংস হয়। বেসামরিক অঞ্চলগুলিও ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি। ফলে ১৯৪৫ এর শুরুতেই জাপানের পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৫ এর জুলাই এ বৃটেন, আমেরিকা, চীন ও রাশিয়া পটসডাম (Potsdam) সম্মেলনে মিলিত হয় এবং জাপান সরকারকে অবহিত করে যে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ এবং শান্তিস্থাপন কিংবা সম্পূর্ণ ধ্বংস—এই দুটির একটিকে বেছে নিতে হবে। জাপান কিন্তু এই চরম নির্দেশ (যার পশ্চাতে আণবিক বোমার প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল) অগ্রাহ্য ক'রে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে মনস্থির করে। তখন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অ্যাডমিরাল সুজুকি কানতারো (Admiral Suzuki Kantaro, এপ্রিল—অগাষ্ট ১৯৪৫)। জেনারেল তোজো জুলাই ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপর প্রধানমন্ত্রী হন জেনারেল কোয়িসো কুনিয়াকি (Koiso Kuniaki, জুলাই ১৯৪৪—মার্চ ১৯৪৫)। তাঁর পর প্রধানমন্ত্রী হন পূর্বোক্ত সুজুকি কানতারো। জাপানের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্র ৬ই অগাষ্ট হিরোসিমার উপর আণবিক বোমা বর্ষণ ক'রে শহরটি নিশ্চিহ্ন করে। ৮ই অগাষ্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৯ই আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়বার আণবিক বোমা বর্ষণ ক'রে নাগাসাকি শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এর পরও জাপানী সেনাবাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, যদিও মন্ত্রীসভা আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক হয়। অচলাবস্থা দূরীকরণে সম্রাট একটি ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স আহ্বান ক'রে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করেন। শর্তটি ছিল আত্মসমর্পণের পরও সম্রাটকে জাপানের সার্বভৌম শাসক হিসাবে যথারীতি গণ্য করতে হবে। মিত্রশক্তির নিকট এ হেন শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয় না। তখন ১৬ই অগাষ্ট সম্রাট দ্বিতীয় ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স আহ্বান করেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী সুজুকি, বিদেশমন্ত্রী টোগো (Togo) এবং নৌবাহিনীর প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত মন্ত্রী যোনাই (Yonai) বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। অপর পক্ষে স্থলবাহিনী

ও নৌবাহিনীর প্রধানদ্বয় তথা স্থলবাহিনীর প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত মন্ত্রী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। অচলাবস্থা দূরীকরণে পুনরায় সম্রাট হস্তক্ষেপ করেন। সম্রাট রায় দেন, যা অসহনীয় তাও সহ্য করতে হবে (The unendurable must be endured)। সুতরাং শেষ অবধি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৭ই অগাস্ট প্রিন্স হিগাশিকুনির (Prince Higashikuni) নেতৃত্বে একটি নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ইতিমধ্যে জেনারেল ডগলাস ম্যাকার্থার সসৈন্যে টোকিওতে উপস্থিত হন। তারপর ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে টোকিও উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের ইউ. এস. এস. মিসৌরী নামক যুদ্ধ জাহাজে আত্মসমর্পণের দলিল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হয়। জাপান সাময়িকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে আসে। জাপান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শাসনাধীনে থাকে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ, ২৮শে এপ্রিল অবধি। এই তারিখে সানফ্রান্সিসকোতে জাপান ও জাপান-বিরোধী ৪৮টি দেশ (যুক্তরাষ্ট্র সমেত) শান্তি-সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করে। এরপর জাপান যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পাশ থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় স্বাধীনতার স্বাদ পায়।

যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের কারণ :

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর্যবসিত হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগদান করে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক পার্লহারবার আক্রমণের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ প্রশান্ত-মহাসাগরীয় (Pacific) যুদ্ধে পরিণত হয়। এই যুদ্ধে জাপানের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

জাপানের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করলে সর্বাগ্রে দেখা যায় জাপান যুক্তরাষ্ট্রের শক্তির সম্যক মূল্যায়ণ করতে পারে নাই অথবা বলা যেতে পারে, অবমূল্যায়ণ করে এবং সেই সঙ্গে সুস্থ বিচারবুদ্ধির অভাবের পরিচয় দেয়। জাপানের ধারণা ছিল যুদ্ধ স্বল্পস্থায়ী হবে, যুক্তরাষ্ট্র অচিরাৎ রণক্লান্ত হয়ে শান্তিস্থাপনের প্রস্তাব করবে, জার্মানী যুদ্ধে জয়ী হবে, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে ডুবোজাহাজ নিয়োগ করবে না, যুক্তরাষ্ট্র গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না এবং যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করবার জন্য জাপানের সামরিক উপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না, পরন্তু বর্তমান উৎপাদনই যথেষ্ট হবে। ফলে ১৯৪০-৪১-৪২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে জাপানের উৎপাদন স্থিতিশীল থেকে যায়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ ছিল জলযুদ্ধ। তথাপি জাপান নৌবহরের মান উন্নত করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। জাপান ৫৯,১৬,০০০ টনের জাহাজ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধ চলাকালীন যাত্র ৪১,০০,০০০ টনের জাহাজ নির্মিত হয় যা শত্রুপক্ষের নিকট থেকে

বলপূর্বক অধিকার করা হয়। মোট ৯,০০, ১৬,০০০ টন জাহাজের মধ্যে যুদ্ধকালে ৮৬,১৭,০০০ টন জাহাজ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয় এবং ৯,৩৭,০০০ টন জাহাজ নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। অবশিষ্ট ৪,৬২,০০০ টনের জাহাজের উপর নির্ভরশীল হয়ে জাপান যুক্তরাষ্ট্রের মত নৌবহরে সমৃদ্ধ শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিবার বৃথাই চেষ্টা করে। জাপানের মোট যত টনের জাহাজ নিমজ্জিত হয় তার ৫৪'৭ শতাংশ নিমজ্জিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের ডুবোজাহাজের তৎপরতায়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের ডুবো জাহাজের আক্রমণ প্রতিহত করবার কোন ক্ষমতা জাপানের ছিল না। মূলতঃ জাপান এরূপ আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ডুবোজাহাজ ধ্বংসোপযোগী জাপানী জাহাজের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এমন কি যুদ্ধের সূচনায় জাপানী জাহাজগুলি যথোপযুক্তভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতও ছিল না। গোলাবারুদের আয়োজন ছিল অল্পসংখ্যক জাহাজের উপযোগী। নূতন যুদ্ধনীতি শিক্ষায় এরূপ শৈথিল্য ও ঔদাসীনতা জাপানের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি ম্যাকার্থারের উচ্চমানের রণকৌশল জাপানের পরাজয় সুনিশ্চিত ক'রে তোলে। যুদ্ধে ডুবোজাহাজ নিয়োগ ব্যতীত ও যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছিল মূল জাপান ভূখণ্ডকে তার সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা। ফলতঃ জাপান ক্রমশঃ ব্রহ্মদেশ, মালয়, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ ও চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপগুলি থেকেও জাপান বিচ্ছিন্ন হয়। এক একটি দ্বীপ জয় ক'রে বিজিত দ্বীপগুলিকে প্রথম পর্যায়ে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে পরিণত ক'রে ক্রমশঃ জাপানের ভূখণ্ডের নিকটবর্তী হবার উদ্দেশ্যে দ্বীপগুলিকে "স্প্রিংবোর্ড" হিসাবে ব্যবহার করবার যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি জাপানের পরাজয় ত্বরান্বিত করে। এ হেন নীতি ছিল ম্যাকার্থারের 'Island-hopping' নীতি। এই নীতির অনুসরণে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে গিলবার্ট (Gilbert) এবং মার্শাল (Marshal) দ্বীপ জয় করে। এর ফলে ম্যাকার্থারের পক্ষে মেরিয়ান দ্বীপপুঞ্জে (Marians) পৌঁছান সুগম হয়। মার্চ, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও অধিকৃত হয়। ক্রমশঃ ম্যাকার্থার ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে ওকিনাওয়া দ্বীপ (Okinawa) অধিকার করেন। ফলে মিত্রশক্তি যেন জাপান ভূখণ্ডের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয় এবং নিকট থেকে জাপানের উপর বোমানিক্ষেপের অপূর্ব সুযোগ পায়। শুরু হয় বোমাবর্ষণ। পঞ্চমতঃ, এই বোমাবর্ষণ কৌশল ছিল যুক্তরাষ্ট্রের একটি সার্থক রণনীতি। বোমাবর্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাপানের শিল্পকেন্দ্রগুলিকে ও জনবহুল শহরাঞ্চলগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ টোকিওর উপর একটিমাত্র প্রজ্বলনাত্মক বোমাবর্ষণের ফলে এক লক্ষ জাপানী প্রাণ হারায়।

এইভাবে বোমাবর্ষণের ফলে মোট ৬,৬৮,০০০ বেসামরিক নাগরিকের প্রাণনাশ হয় এবং ২·৩ মিলিয়ন গৃহ ধ্বংসীভূত হয়। ষষ্ঠতঃ, আণবিক বোমাবর্ষণ জাপানকে শেষ অবধি যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। আণবিক বোমা বর্ষিত হয় হিরোশিমার উপর ৬ই অগাস্ট ১৯৪৫ এ এবং নাগাসাকির উপর ৯ই অগাস্ট। উভয় শহরেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, কত লক্ষ যে বিকলাঙ্গ হয় তার হিসাব মেলে না। সপ্তমতঃ, এ হেন পরিস্থিতিতে জাপানে খাদ্যাভাব দেখা দেয়, স্থানাভাব ঘটে, ঘরে ঘরে কঠিন ব্যাধি অনুপ্রবেশ করে এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে জাপান (American Occupation of Japan), ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫—২৮শে এপ্রিল ১৯৫২ :

পরাজিত এবং হৃতসর্বস্ব জাপান যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন হয়। একদিকে ভেঙ্গে-পড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো, অন্যদিকে জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয়। একদিকে নিয়ম-শৃঙ্খলার অবলুপ্তি এবং অরাজকতার প্রাদুর্ভাব, অন্যদিকে অপরাধপ্রবণতা ও দুষ্ক্রিয়তা। যুদ্ধান্তে জাপানের ক্ষয়ক্ষতির তালিকাও ভয়াবহ : কয়েক লক্ষ জাপানী নাগরিকের প্রাণনাশ হয়, ২·৩ মিলিয়ন বসতবাটি সমেত ৪০ শতাংশ শহরাঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। একমাত্র টোকিও শহরেই প্রায় ৭ লক্ষ গৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধ চলাকালীন বোমার আক্রমণের ভয়ে হাজার হাজার জাপানী টোকিও পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে টোকিওর যুদ্ধকালীন জনসংখ্যা ৬·৫ মিলিয়ন বা তদূর্ধ্ব থেকে ৩ মিলিয়নে হ্রাস পায়। যুদ্ধ শেষে জাপানের সাম্রাজ্য বলতে কিছু বিদ্যমান থাকে না। কিউরিলস ও কারাফুতো (দক্ষিণ সাখালিন) রাশিয়ার হস্তগত হয়। কোরিয়া স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পায়। ফরমোজা পুনরায় চীনের হস্তগত হয়। প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের মানডেট (Mandate) গুলি (যেগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে জাপানের তত্ত্বাবধানে আসে) এক্ষণে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনে ট্রাস্ট অঞ্চল (Trust territory) হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন হয়। এইভাবে জাপান আয়তনে ক্ষীণতর হয়ে মূল চারটি বৃহৎ দ্বীপে সীমিত হয়। জাপানের আর সাম্রাজ্য বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি অবশ্য জাপানের অন্তর্ভুক্ত থাকে। জাপানে সামরিক শাসন প্রচলিত হয়।

আমেরিকার শাসনাধীনে (Occupation) থাকা কালে জাপানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়। যে কয়েক বৎসর জাপান যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে থাকে সেই কালে জাপানের মোটের মাথায়

প্রভুত কল্যাণসাধিত হয়। 'অকুপেশন' কালে জাপান যুক্তরাষ্ট্রের নিকট নির্মম এবং রূঢ় আচরণ আশংকা করে কিন্তু পায় সহৃদয় ব্যবহার। জাপানের আশংকা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত প্রশাসন হবে প্রতিহিংসামূলক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রশাসন হয় গঠনমূলক।[২] অল্পবিস্তর নির্মম বা প্রতিশোধমূলক আচরণ যে জাপান পায় নি, একথা বলা চলে না, তবে সব দিক থেকে বিচার করলে, জাপানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আচরণ সহৃদয় ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্র-প্রবর্তিত শাসন গঠনমূলকই ছিল।

প্রশাসনিক কাঠামো:

তত্ত্বগতভাবে জাপানের উপর প্রশাসনিক অধিকার ছিল আন্তর্জাতিক। শাসনভার ন্যস্ত ছিল ওয়াশিংটনে অবস্থিত তেরটি দেশ সম্বলিত একটি দূরপ্রাচ্য কমিশনের উপর (13—Nation Far Eastern Commission in Washington)। টোকিও-তে অবস্থিত চতুঃশক্তি সম্মিলিত কাউন্সিল (Four-Power Allied Council) ছিল প্রশাসনিক উপদেষ্টা। জেনারেল ডগলাস ম্যাকার্থার নিযুক্ত হন মিত্রশক্তিবর্গের প্রধান অধিনায়ক (Supreme Commander for the Allied Powers, S. C. A. P)। তত্ত্বগতভাবে প্রশাসনিক অধিকারের প্রকৃতি আন্তর্জাতিক হলেও কার্যতঃ প্রশাসন ছিল সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। প্রশাসনের কাঠামো (Administrative Structure) ছিল জাপানী ধাঁচে গঠিত কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল বিদেশী সামরিক সংস্থার উপর। সৈন্যাধ্যক্ষ ম্যাকার্থারের প্রধান কার্যালয় ছিল টোকিও। ম্যাকার্থার ও জাপানী সরকারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি গঠিত হয় জাপানী পররাষ্ট্র বিভাগের সভ্যদের নিয়ে।

প্রশাসনিক কর্মপন্থা—উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা নির্ধারণ:

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম কর্মপন্থা নির্ধারিত করে। পরে, ১৯শে জুন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দূরপ্রাচ্য কমিশন (Far Eastern Commission) উক্ত কর্মপন্থা সমর্থন করে। এই কর্মপন্থার চূড়ান্তভাবে-গৃহীত উদ্দেশ্যগুলি ছিল: ভবিষ্যতে জাপান শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে না, ইহা সুনিশ্চিত করা এবং জাপানের জনগণ দ্বারা সমর্থিত একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠনে উৎসাহ দেওয়া। এই উদ্দেশ্য দুটির সিদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলি

(২) 'Expecting a cruel and harsh Occupation, the Japanese found it benevolent. Fearing a vindictive rule, they found it constructive.' Fairbank, তদেব। পৃ: ৮১১

অনুমোদিত হয়ঃ (১) জাপানের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী ত্রয়কে ভেঙ্গে দেওয়া এবং বাহিনী তিনটির সঙ্গে জড়িত কর্মীদের স্বদেশে পুনঃ প্রেরণ করা; (২) সমগ্র জাপানের নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) এবং অসামরিকীকরণ-(Demilitarization); (৩) যুদ্ধাপরাধী ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান; (৪) গণতান্ত্রিক শাসনে উৎসাহদান; (৫) জাপানের সামরিক শক্তির অর্থনৈতিক ভিত্তির ধ্বংস সাধন; (৬) জাপানী জাতির অর্থনৈতিক জীবনের পুনরুজ্জীবন সাধন, যাতে জনগণের শান্তি-কালীন প্রয়োজনাদি মেটান সম্ভব হয়; (৭) গণতান্ত্রিক সংস্কার গ্রহণে উৎসাহিত করবার জন্য শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধন।

উল্লিখিত পন্থাগুলি কার্যকরী করবার জন্য ম্যাকার্থার-পরিচালিত সামরিক প্রশাসন সক্রিয় হয়। যথা (১) জাপানের বাহিনীত্রয়কে ভেঙ্গে দেওয়া হয় বহির্জাপানে অবস্থিত সকল সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকদিগকে স্বদেশে পুনঃপ্রেরণ করা হয়। (২) জাপানের নিরস্ত্রীকরণ এবং অসামরিকীকরণের জন্য আধা-সামরিক সংস্থাগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়; প্রশাসনিক কাঠামো থেকে স্থলবাহিনী বিভাগ ও নৌবাহিনী বিভাগ বাদ দেওয়া হয়; নৌঘাটিগুলি বিধ্বংস করা হয়; স্থলবাহিনী তথা নৌবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়; যুদ্ধোপযোগী উৎপাদন-ভিত্তিক শিল্পগুলিকে বিনষ্ট করা হয়; আণবিক গবেষণা নিষিদ্ধ হয়; ইস্পাত, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত শিল্পপণ্য এবং যন্ত্রপাতি—ইত্যাদির উৎপাদন সীমিত করা হয়; যুদ্ধ বর্জন ক'রে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা স্থিরীকৃত হয়; সামরিক শক্তির পুনরুত্থান যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা নূতন সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়। (৩) ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী, আক্রমণাত্মক যুদ্ধনীতির সমর্থকগণসহ সকল যুদ্ধাপরাধী ব্যক্তিগণের জন্য কঠোর বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। টোকিওতে একটি আন্তর্জাতিক ন্যায়পীঠ (Tribunal) স্থাপিত হয়। এই ন্যায়পীঠের সম্মুখে ২৫ জন যুদ্ধাপরাধী জাপানী নেতা বিচারের জন্য আনীত হন। বিচারে, তাঁদের মধ্যে তোজো, কিডো, মাৎসুয়োকা, হিরানুমা সমেত সাত জনের ফাঁসি হয়, ১৯৪৮ এর ডিসেম্বরে। অন্যান্য অপরাধী নেতাদের মধ্যে অধিকাংশই দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে কারারুদ্ধ হন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের দণ্ড লঘু করা হয়। যুদ্ধনীতির রূপদানের সঙ্গে জড়িত এমন প্রায় দুলক্ষ জাপানীকে স্বদেশ থেকে বিতাড়ন করা হয়। যুদ্ধাপরাধী হিসাবে সম্রাট হিরোহিতোকে বিচারাধীন করা হয় নি। বিচারাধীন হওয়া থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। (৪) ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মেজী সংবিধান বাতিল হয়। তৎপরিবর্তে একটি নূতন সংবিধান রচিত হয় ও কার্যকরী করা হয়। ইহা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের সংবিধান নামে

পরিচিত। মেজী সংবিধান বাহ্যতঃ গণতান্ত্রিকরূপে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না ক'রে প্রতিষ্ঠিত করে 'অলিগার্কি'।' কিন্তু ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের সংবিধানটি হয় প্রকৃতই গণতান্ত্রিক। এই সংবিধানে সকল দেশের সঙ্গে জাপানের শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার উপর তথা স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জাপানী সরকারের ইটকারিতায় ভবিষ্যতে আর কখনও যাতে দেশে যুদ্ধের বিভীষিকা দেখা না দেয়, সে ব্যবস্থাও সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়। সর্বোপরি সংবিধানে ঘোষিত হয় যে জনগণই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিষ্ঠান। এ হেন সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল: (১) মেজী সংবিধানে জাপানী সম্রাট সাধারণ মানব হিসাবে গণ্য হতেন না। দেশবাসী তাঁর দৈব উৎপত্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত সংবিধানে জাপানী সম্রাটের দৈব বা অপার্থিব উৎপত্তির কোন উল্লেখ নাই। পরন্তু তিনি 'Human Emperor' হিসাবে পরিচিত হন। তাঁর ভাবমূর্তি হয় পার্থিব মানবোচিত। সম্রাট সকল প্রকার প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবে কেবলমাত্র জাতির একতার প্রতীক হিসাবে সিংহাসনের অধিকারী থাকবেন। ফলে পূর্বে জাপানী রাষ্ট্রের সঙ্গে সিন্টো ধর্মের যে ওতপ্রোত সংযোগ ছিল তাহা বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হয় এবং জাপান একটি অনাধ্যাত্মিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়। ডায়েটের ভিত্তি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক হয়। পূর্বে ডায়েটের উচ্চ কক্ষ (হাউস অব পিয়ার্স) ছিল মনোনীত। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী এই কক্ষটি হয় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কক্ষ। হাউস অব পিয়ার্স এখন নির্বাচিত হাউস অব কাউন্সিলারস্ নামে পরিচিত হয়। নিম্নকক্ষ পূর্ববৎ নির্বাচিত কক্ষ রূপেই বিদ্যমান থাকে। দেশের প্রশাসনিক বিভাগ নিম্নকক্ষের নিকট দায়িত্বশীল হয়। পূর্বে মন্ত্রীসভা বা প্রশাসনিক বিভাগ ডায়েটের নিকট দায়ী ছিল না কিন্তু ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের সংবিধানে সংসদীয় সরকারের ধাঁচে মন্ত্রীসভা ডায়েটের নিয়ন্ত্রাধীন হয়। ডায়েটের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মন্ত্রীসভা গঠনের যোগ্য হন অথবা প্রয়োজনবোধে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যবস্থাও অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রের বাজেটের উপরও ডায়েটের পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন কি ইম্পিরিয়াল হাউসহোল্ড ডায়েটের নিয়ন্ত্রাধীন হয়। প্রিভি কাউন্সিল বাতিল হয়। বিচার বিভাগ একটি স্বাধীন বিভাগরূপে ঘোষিত হয় এবং ডায়েট কর্তৃক প্রণীত আইনের সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিকতা (Judicial Review) যাচাই করবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর অর্পিত হয়। মানবিক অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করা হয়; যথা জীবনধারণের অধিকার, স্বাধীনতা ও সমতার অধিকার, সুস্থ ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারণের অধিকার, শিক্ষাগত স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি।

গণতান্ত্রিক সংবিধান চালু হবার পরিপ্রেক্ষিতে জাপানে রাজনৈতিক

দল গুলি পুনর্জীবিত হয়। সেয়ুকাই এবং মিনসিটো দলের মত নূতন নূতন দল গড়ে ওঠে। কাতায়ামার (Katayama) নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দল।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধরত জাপানের সামরিক শক্তির প্রধান উৎস ছিল জাইবাৎসু গোষ্ঠী। তাই যুদ্ধশেষে জেনারেল ম্যাকার্থার জাইবাৎসু গোষ্ঠীকে সমূলে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৮৩টি জাইবাৎসু কোম্পানী ভেঙ্গে দেন, জাইবাৎসু পরিবারসমূহকে তাদের ধনসম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন, এরূপ পরিবারবর্গের ধনসম্পত্তি বহুলাংশে বাজেয়াপ্ত করেন এবং অত্যধিক আয়কর প্রভৃতির মাধ্যমে এরূপ বহু পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিনষ্ট করেন। ভবিষ্যতে জাইবাৎসু গোষ্ঠী যাতে পুনরায় মাথা তুলতে না পারে তজ্জন্য একচেটিয়া (Monopoly)-বিরোধী আইন বিধিবদ্ধ করেন, নূতন আয়কর আরোপ করেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর কর বসান। কিন্তু ম্যাকার্থারের প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় নি, কারণ পরবর্তীকালে অনেক জাইবাৎসু পরিবার তাদের পূর্বের কোম্পানীগুলির ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত ক'রে পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস পান। কিন্তু জাইবাৎসু গোষ্ঠীর পক্ষে ঠিকমত পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নি। পূর্বে এই গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারবর্গের মধ্যে যে একতা এবং একনিষ্ঠতা ছিল তা পুনর্জীবিত হয় নি।

(৬) অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য ম্যাকার্থারের সামরিক সরকার ভূমি-সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে জাপানে প্রায় ৪৬ শতাংশ আবাদী জমি প্রজারা চাষ করত। সামাজিক তথা অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সব প্রজারা ছিল জমিদার শ্রেণীর অধীন। উৎপাদনের ৭৫ শতাংশ প্রজাদের খাজনা বাবদ জমিদার শ্রেণীকে দিতে হত। তাই ম্যাকার্থার ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তখন তিন শ্রেণীর জমির মালিকের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলেঃ (১) এক শ্রেণীর জমির মালিক গ্রামে বাস না ক'রে শহরাঞ্চলে বাস করতেন, (২) দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত জমির মালিক গ্রামেই থাকতেন কিন্তু আবাদী জমি প্রত্যক্ষভাবে নিজ দখলে না রেখে প্রজাদের মধ্যে আবাদের জন্য বণ্টন ক'রে দিতেন এবং তৎপরিবর্তে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন ; (৩) তৃতীয় শ্রেণীর জমির মালিকও স্বগ্রামে বাস করতেন কিন্তু নিজ আবাদী জমি প্রত্যক্ষভাবে নিজ দখলে রেখে স্বীয় দায়িত্বে আবাদের ব্যবস্থা করতেন। ম্যাকার্থার প্রবর্তিত ভূমি সংস্কারের ফলে গ্রাম থেকে অনুপস্থিত জমির মালিকগণ তাঁদের জমির উপর অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির মালিকদের জন্য গৃহীত

ব্যবস্থানুযায়ী, হন্সু, শিকোকু ও কুশু দ্বীপ তিনটিতে প্রত্যেক জমির মালিক এক চো (২.৪৫ একর) হিসাবে আবাদী জমি পান এবং হোক্কাইডো তে পান ৪ চো হিসাবে। তৃতীয় শ্রেণীর জমির মালিকদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থানুযায়ী, উক্ত প্রথম তিনটি দ্বীপে প্রত্যেক জমির মালিক জমি পান ৩ চো হিসাবে এবং হোক্কাইডো দ্বীপে পান ১২ চো হিসাবে। এইভাবে জমির মালিকদের বহু পরিমাণ উদ্ধৃত্ত জমি মূল্যের বিনিময়ে সরকারের অধিকারে আসে। অর্থাৎ উদ্ধৃত্ত জমি সরকার জমির মালিকদিগের নিকট থেকে ক্রয় করেন, যুদ্ধ-পূর্বকালে প্রচলিত জমির মূল্যের বিনিময়ে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে এইভাবে ৫ মিলিয়ন একর উদ্বৃত্ত জমি জমিদারদের নিকট থেকে ক্রয় করা হয় এবং ক্রীত জমি কৃষকদিগকে বিক্রয় করা হয়। ক্রয়মূল্যের মত, বিক্রয়মূল্য ছিল যুদ্ধ-পূর্বকালে প্রচলিত বিক্রয়মূল্য। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৯০ শতাংশ আবাদী জমি কৃষকদের অধিকারে আসে। বিধিবদ্ধভাবে জমির খাজনা ৫০ শতাংশ হ্রাস করা হয়, সেই সঙ্গে খাজনার সর্বোচ্চ সীমাও নির্ধারিত হয়। কিন্তু ক্রমঃবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় কৃষকদের মধ্যে মাথাপিছু জমির পরিমাণ যথেষ্ট হয় নাই। ফলে উপরোক্ত ভূমি-সংস্কার কৃষীজীবনে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য আনতে পারে নাই। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে কৃষকদের আবাদী জমির চাহিদা পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে পূরণ হয়। এইভাবে দেশে যে নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে তা কালক্রমে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। পূর্বে যে রাজনৈতিক প্রভাব জমিদার শ্রেণী ভোগ করতেন তা এখন কৃষককুলের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

(২) শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব। প্রাক্-যুদ্ধকালে জাপানী ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তিগত শিক্ষার সুযোগ পেত। তখন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জাপানী নাগরিকদিগের মধ্যে রাজভক্তি অনড় রাখা। ছাত্রছাত্রীরা যাতে সম্রাটের উপর গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতে শিক্ষা পায় শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে তার ব্যবস্থা করা হত। যুদ্ধোত্তর কালে জাপানী সন্তানেরা উদার-নীতি ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ পায়। নাগরিকদিগকে কেবলমাত্র কোন বৃত্তি বা পেশার উপযোগী করা অথবা তাদের মধ্যে রাজভক্তি উদ্রেক করা আর শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকে না। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয় নাগরিকদের চরিত্র গঠন করা, তাদের মানসিক উন্নতি সাধিত করা ও স্বদেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করা। বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপ্তি-কাল ছয় বৎসর থেকে নয় বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষান্তে উচ্চমানের শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয় তিন বৎসরের পাঠ্যক্রম-সম্বলিত বাধ্যতামূলক জুনিয়ার হাই স্কুল, তিন বৎসরের পাঠ্যক্রম বিশিষ্ট

সিনিয়র হাই স্কুল এবং চার বৎসরের পাঠ্যক্রম বিশিষ্ট মহাবিদ্যালয় (কলেজ)। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন সাধিত হয়। নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সেই সব পুস্তকের মাধ্যমে জনগণ গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে পরিচিত হয়। পূর্বে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাশে তাদের পাঠ না বুঝেই মুখস্থ করত। পরিবর্তিত পরিবেশে ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের পঠনীয় বিষয়বস্তু শুধুমাত্র মুখস্থ না ক'রে, বিশেষভাবে বুঝে বিষয়বস্তুর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে শিক্ষা করে, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মোট কথা, শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় শুধুমাত্র জীবিকা উপার্জনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করা নয়। পরন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় জাপানী জনগণকে দায়িত্বশীল সুরুচিসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ শিক্ষা দেওয়া বা গ্রহণে বাধ্য করা শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকে না, শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় স্বাধীন চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকালে জাপানে ২৬০ টি বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ৩০৫ টি জুনিয়র কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজে-পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা দুই দশকের মধ্যে (১৯৪০—১৯৬২) ২,৬৮,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮,৩৪,০০০। তখন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় ব্যক্তির অগ্রগতির জন্য, রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য নয়।

জাপানে যুক্তরাষ্ট্র-শাসনের (অকুপেশন) পরিসমাপ্তি ও তদবধি জাপানের ক্রমোন্নতি :

সামরিক শাসনকালে জাপানে যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুরু হয় তা পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকে। উত্তরোত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধের পূর্বে সাধারণ জাপানীর সংসারে আধুনিক জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক তিনটি উপকরণের অভাব ছিল, যথা মোটর গাড়ী, রঙিন টি. ভি. এবং শীততাপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র। যুদ্ধোত্তর কালে সে অভাব বহুলাংশে পূর্ণ হয়। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ১৭ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব মোটর গাড়ী ছিল, আর বর্তমানে (১৯৮৩) এরূপ পরিবারের সংখ্যা ৬২ শতাংশ। বর্তমানে গড়ে প্রতি এক হাজার জাপানী নাগরিক ১৯৫ টি মোটর গাড়ীর মালিক। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে রঙিন টি. ভি. ব্যবহার করার আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারের সংখ্যা ছিল ২৬ শতাংশ, আর বর্তমানে (১৯৮৩) ঐ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৮.৯ শতাংশ। শীততাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহার করে এমন পরিবারের সংখ্যা ৫.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশে। বর্তমানে প্রতি ১০০ জন জাপানী নাগরিকের মধ্যে ৪৪ জন নিজস্ব টেলিফোন ব্যবহার করেন। বর্তমানে বেকারের হার ২.৫ শতাংশ এবং মুদ্রাস্ফীতির হার ২.১ শতাংশ। আধুনিককালে একটি জাপানী

পরিবার বাসস্থান অপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যাদির জন্য অধিকতর ব্যয় করেন। জাপানে প্রতি পরিবার খাদ্যবাবদ ব্যয় করে মোট আয়ের ২৭'৫ শতাংশ এবং বাসস্থানের জন্য ৫ শতাংশ অথচ যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য ও বাসস্থান বাবদ একটি পরিবার ব্যয় করে আয়ের যথাক্রমে ১৬'২ এবং ১৫ শতাংশ।[৩]

সামাজিক স্বচ্ছলতা অর্থনৈতিক উন্নতির নির্দেশক। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের শেষে জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। হৃত-সাম্রাজ্য জাপান মূলতঃ চারটি প্রধান দ্বীপে সীমাবদ্ধ হয়। জাপানের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সাময়িকভাবে যদিও, জাপানের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়। ক্রমশঃ অবশ্য অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে, যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অনুদানে এবং জাপানী জাতির উন্নতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপে।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধকালে জাপানের অর্থনীতি :

(১) যুদ্ধকালীন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য :

প্রাক্-যুদ্ধ যুগের জাপানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে লঘুভার শিল্পকে (টেক্সটাইল ইত্যাদি) প্রাধান্য দেওয়া হত। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার পর লঘুভার শিল্প অপেক্ষা ভারী শিল্পের (যথা যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ, বিমান নির্মাণ প্রভৃতি) প্রয়োজন অধিকতর অনুভূত হওয়ায় ভারী শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের উপর প্রাধান্য আরোপ করা হয়। সামরিক প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন শিল্পজাত দ্রব্যের বহুল পরিমাণে উৎপাদন শুরু হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সামগ্রিক শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের মাত্র ৩৮ শতাংশ ছিল ভারীশিল্প কিন্তু ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ভারী শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২-৭৩ শতাংশ। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভারী শিল্পের অন্তর্ভুক্ত মোটর যানের (মোটর গাড়ী, বাস ইত্যাদি) বাৎসরিক উৎপাদন ছিল মাত্র ৫০০টি কিন্তু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বাৎসরিক উৎপাদন দাঁড়ায় ৪৮,০০০টি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত সকলপ্রকার বিমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০ কিন্তু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বিমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,০০০। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপন্ন হয় জাপানে তখন বিস্ফোরক দ্রব্যের উৎপাদন হয় তদপেক্ষা অনেক বেশী। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপানে নির্মিত হয় ৯২,০৯৩ টন ওজনের বাণিজ্য জাহাজ কিন্তু ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য জাহাজের ওজন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪,০৫,১৯৫ টন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত রণতরীর মোট ওজন ছিল ১৫,০৫০ টন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন রণতরীর মোট ওজন দাঁড়ায় ২,৩১,৯৯০ টন।

(৩) Time. Special Issue. Aug 1, 1983 : Japan : A nation in the making.

(২ সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি ও সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ঃ

যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনীতি সামরিক নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়। সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকারেরও স্বাভাবিক কারণে ব্যয়ের অংক বৃদ্ধি পায়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর জন্য মোট বাজেট নির্ধারিত ছিল ৪৩৪ মিলিয়ন ইয়েন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এই বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭,২৬৬ মিলিয়ন ইয়েনে।

(৩ জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি ঃ

সামরিক খাতে বাজেট বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে জাপান সরকারের ঋণের পরিমাণও স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব থেকে এই ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভবপর না হওয়ায় সরকারকে ঘাটতি বাযের সম্মুখীন হতে হয়। এরূপ আর্থিক পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষে ঋণ গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। ৩১শে মার্চ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জাতীয় অপরিশোধিত ঋণের অংক দাঁড়িয়েছিল ৩১,০৭৮ মিলিয়ন ইয়েন। দশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৩১শে মার্চ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাতীয় অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ ছিল ৬,৮১৯ মিলিয়ন ইয়েন।

(৪) ব্যাঙ্ক সম্প্রসারণ নীতি ঃ

এ হেন ঘাটতি রাজস্ব ও জাতীয় ঋণবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জাপান সরকার ব্যাংক সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি ছিল সকল শ্রেণীর জনগণকে ব্যাংকে অধিক পরিমাণ আমানত গচ্ছিত রাখতে উৎসাহিত করা। গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে একদিকে যেমন সরকারের পক্ষে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ না করেই যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা সহজসাধ্য হবে, অন্যদিকে তেমনি দেশে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা বহুলাংশে দূরীভূত হবে। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩০ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪১ পর্যন্ত সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাংকের সংখ্যা ৭৮২ থেকে ১৮৬তে হ্রাস পেলেও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলিতে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ৮.৭ বিলিয়ন ইয়েন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৯.৮ বিলিয়ন ইয়েনে। ঐ কালের মধ্যে সেভিংস ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৯০ থেকে ৬৯ হয় কিন্তু সেভিংস ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ১.৫ বিলিয়ন ইয়েন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫.৫ বিলিয়ন ইয়েনে। ব্যাংকে সিকিউরিটি (Security)-র পরিমাণও ৯৪৯ মিলিয়ন ইয়েন থেকে ৫ বিলিয়ন ইয়েনে বৃদ্ধি পায়।

(৫) জাতীয় অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ঃ

দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা দমনের উদ্দেশ্যে তথা দেশের সম্পদ যুদ্ধকালীন

উপকরণাদি উৎপাদনের কার্যে নিয়োগের জন্য জাপানী সরকার এই সময় জাতীয় অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। যুদ্ধোপকরণ যোগান দেওয়া এবং জনগণের অভাব পূরণ করা—এই দুইটি উদ্দেশ্যে সরকার শিল্প-জাত দ্রব্যাদির উৎপাদন নিজ নিয়ন্ত্রাধীন করে। তৈল, লৌহ, ইস্পাত, বৈদ্যুতিক শক্তি, যন্ত্রপাতি, বিমান, জাহাজ, খনিজ দ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র, সার, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার নানাবিধ আইন প্রণয়ণ করেন এবং এই সকল প্রকার উৎপাদন স্বীয় নিয়ন্ত্রাধীন করেন।

(৬) বৈদেশিক বাণিজ্য :

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জাপানী সরকার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জাপানকে বহিরাঞ্চল থেকে কাঁচা মাল আমদানি করতে হত। রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অধিকতর হওয়ায় জাপানে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থমূল্য মূল জাপানে ছিল ৬০৮ মিলিয়ন ইয়েন এবং জাপান সাম্রাজ্যে ৬৩৫ মিলিয়ন ইয়েন। জাপানী সরকার আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে পার্থক্যজনিত প্রতিকুল অবস্থার মোকাবিলা করবার উদ্দেশ্যে তিনটি পন্থা অবলম্বন করেন, যথা (১) বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিময় মুদ্রার সঞ্চিত তহবিলের বর্ধিতহারে সদ্ব্যবহার, (২) অপ্রয়োজনীয় আমদানি হ্রাসকরণ এবং (৩) স্বর্ণভাণ্ডারে যাতে অধিকতর পরিমাণে স্বর্ণ সঞ্চিত হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ। এই তিনটি পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বাণিজ্যে প্রতিকুল অবস্থা রোধ সম্ভব হয় না। আমদানি যথাপূর্ব রপ্তানিকে অতিক্রম করে চলে, কাঁচামালের চাহিদার আধিক্য হেতু এবং ভবিষ্যতের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করে রাখার প্রবণতা হেতু। এরূপ পরিস্থিতির প্রতিবিধানের জন্য সরকার দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন—বিনিময় মুদ্রার সঞ্চিত তহবিলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সাধন (Complete Exchange Control) এবং বিশেষ কিছু দ্রব্যের আমদানি নিষিদ্ধকরণ। অধিকন্তু বিনিময় মুদ্রা নিয়ে ফটকা, মূলধন রপ্তানি, বিদেশে মুদ্রা প্রেরণ, বিনামূল্যে রপ্তানি—এ সমস্তও নিয়মাধীন করা হয়। আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের প্রণালীও (Link System) প্রবর্তিত হয়। স্থির হয় যে সরকার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি অনুমোদিত করবেন এই শর্তে যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ রপ্তানি উক্ত আমদানিকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণিত করবে। এইভাবে কাঁচা-মালের আমদানির সঙ্গে রপ্তানির প্রয়োজনীয়তার একটি কড়া সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র যেমন কর ধার্য ক'রে যুদ্ধব্যয় সঙ্কুলানের পক্ষপাতী ছিল, জাপান সেরূপ ছিল না। জাপান সরকার সরকারী বণ্ড বা প্রতিজ্ঞাপত্র ক্রয়ের জন্যও জনগণের উপর চাপ সৃষ্টির

পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলতঃ জাপানে বণ্ড ক্রয়ের কোন ঐতিহ্য ছিল না। জাপানী সরকার কর ধার্যের একটি কাঠামো স্থির করেন, যুদ্ধব্যয় সংকুলানের উদ্দেশ্যে নয়, বেসামরিক ব্যয়সংকুলানের উদ্দেশ্যে। বণ্ড ক্রয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে জাপানী সরকার জাপানের ঐতিহ্য অনুসারে ব্যাংকে আমানত বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

উপরোক্ত সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জাপানী সরকার যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে স্থিরতা প্রবর্তনে সক্ষম হন নি। আয় অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্য ঘটে। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ব্যয়ের অনুপাতে আয় ছিল ৭৪ শতাংশ। ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে ব্যয়ের অনুপাতে আয় হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২৪ শতাংশে। ফলে জাপান সরকারকে ঘাটতি ব্যয়ের উপর উত্তরোত্তর অধিকতর নির্ভরশীল হতে হয়। যুদ্ধ চলাকালীন জাপান সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের বিলিয়ন ইয়েন হিসাবে একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :

আর্থিক বৎসর	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়	ঘাটতি
১৯৪১—৪২	৫.৮	১৯.২	১৩.৪
১৯৪২—৪৩	৯.৮	২৪.৭	১৪.৯
১৯৪৩—৪৪	১৩.৪	৩২.১	১৮.৭
১৯৪৪—৪৫	১৮.৫	৫৭.৬	৫৯.১
১৯৪৫—৪৬	২৭.২	১০৩.৮	৭৬.৬

এ হেন ঘাটতির ফলে যুদ্ধকালে জাপানী সরকারের ঋণভার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে ইহা প্রমাণিত হয় :

আর্থিক বৎসর	মোট ঋণ (মিলিয়ন ইয়েন হিসাবে)
১৯৪০	২৩,৬২৫
১৯৪১	৩১,০৭৮
১৯৪২	৪১,৭৮৪
১৯৪৩	৫৭,০০৫
১৯৪৪	৮৫,১১৩

অতিরিক্ত জাতীয় ঋণ এবং ঘাটতি ব্যয় জাপানের পরাজয় অনিবার্য করে তোলে। যুদ্ধের শেষ বৎসরে জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। উৎপাদন তখন বন্ধ-প্রায়। জীবন-ধারণের মান তখন অতীব নিম্নস্তরে। জনগণ বুভুক্ষিত, নিরাশ্রয় এবং মারাত্মক ক্ষয়রোগের কবলে। চতুর্দিকে ধ্বংসের স্তূপ। জাপানের আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত আর কিছু করণীয় ছিল না।[৪]

(৪) উপরোক্ত আলোচনার জন্য Jerome B. Cohen রচিত Japan's Economy in war and reconstruction দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুত্থান (১৯৪৫-৭০)

যখন জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করে তখন জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামো ভগ্ন-প্রায়। হৃতসাম্রাজ্য জাপানের রাজস্বের অঙ্ক তখন শূন্য-প্রায়। মূলধন তথা কাঁচামালের অভাবে শিল্প বিপন্ন। দূরপ্রাচ্যে জাপানের বাণিজ্যিক প্রভাব তখন অতীতের স্মৃতি বিশেষ। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় তখন চরম বিশৃঙ্খলা। শহরাঞ্চলে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎকট অভাব। সর্বোপরি জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয়।

এ হেন দীন অবস্থা থেকে জাপানের উদ্ধার সম্ভবপর হয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে। যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এবং মার্কিণ সরকারের সাহায্য শুরু হয় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে, যখন শহরাঞ্চলের জনগণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ৪০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে আরও ২ বিলিয়ন ডলার অনুদান করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির জন্য বৈদেশিক ব্যবসা মন্দগতিতে অগ্রসর হয়। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করবার উদ্দেশ্যে ম্যাকার্থারের সামরিক সরকার জাপানীদের জীবনধারণ প্রণালীতে কঠোরতা পালনের নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে দ্রব্যাদির মূল্যহ্রাস রপ্তানি ব্যবসায়ের পক্ষে অনুকূল হয়। যুদ্ধোত্তর যুগে কোরিয়ার যুদ্ধ চলাকালে (১৯৫০-৫৩) জাপানে সর্বপ্রথম অধিক পরিমাণে শিল্পোৎপাদন শুরু হয়। তখন জাপান ৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহের নির্দেশ পায়। ফলে জাপানে শিল্পোৎপাদন যেন পুনর্জীবন লাভ করে। এরপর শিল্পোৎপাদনে কখনও উন্নতি ঘটে, কখনও বা প্রতিনিবৃত্তি। অবশেষে ১৯৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে জাপান এশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুনরায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতি নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে বুঝতে পারা যায়ঃ[৫]

অর্থনৈতিক উন্নতি

উন্নতির বাৎসরিক গড়পরতা হার

	১৯৫৫—৬০	১৯৬০
জাপান	১০.২%	১৩.২%
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২.৩%	২.৭%
ইংলণ্ড	২.৪%	৪.৩%
ফ্রান্স	৫.৩%	৫.৩%
পশ্চিম জার্মানী	৬.১%	৮.৭%

(৫) ফেয়ার ব্যাঙ্ক, তদেব। পৃ: ৮২২ দ্রষ্টব্য

১৯৫১—৬১ দশকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য প্রসার ঘটে এই দশ বৎসরে জাপানের আমদানি-রপ্তানির বহর নিম্নরূপ ছিল ঃ[৬]

রপ্তানি ও আমদানি

মিলিয়ন ডলার হিসাবে

	রপ্তানি	আমদানি
১৯৫১	১,৩৫৪	১,৯৯৫
১৯৫৩	১,২৭৪	২,৪০৯
১৯৫৫	২,০১০	২,৪৭১
১৯৫৭	২,৮৫৮	৪,২৮৩
১৯৫৯	৩,৪৫৬	৩,৫৯৯
১৯৬১	৪,২৩৫	৫,৮১০

উপরের তালিকা থেকে বুঝা যায় যে ১৯৫১—৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাপানের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি ছিল অধিকতর। আমদানির আধিক্যের কারণ, জাপানকে তখন শিল্পোন্নয়নের জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করা কাঁচামালের উপর যথেষ্ট নির্ভর করতে হত। তখন মোট আমদানির ৬০ শতাংশ ছিল কাঁচা মাল। আমদানি-করা কাঁচা মালের সাহায্যে জাপানে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়, যে সম্ভাবনা যুদ্ধকালে অন্তর্হিত হয়।

১৯৭০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জাপান শিল্পে অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ তৃতীয় শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। জি-সি অ্যালেন প্রদত্ত তথ্যানুসারে ১৯৪৫ (অগাস্ট)—১৯৭০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে জাপানের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কতকগুলি সুস্পষ্ট পর্যায় চিহ্নিত করা যায় ঃ[৭]

(১) অগাষ্ট ১৯৪৫—ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ ঃ এইকালে জাপানে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও মুদ্রাস্ফীতি বিদ্যমান থাকে। তখন জাতীয় সঞ্চয় ছিল নগণ্য এবং সঙ্গতি বিরল। যুদ্ধকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পে পুনরুত্থানের গতি ছিল মন্থর। কৃষিতে তখন উৎপাদনের স্তর ছিল প্রাক্-যুদ্ধ কালের উৎপাদন-স্তরের বহু নিম্নে। বাণিজ্যে রপ্তানি ছিল না বললেই চলে। (২) মার্চ ১৯৪৯—জুন ১৯৫০ ঃ এইকাল জাপানের অর্থনীতিতে নিশ্চলতার কাল। (৩) জুন ১৯৫০ (কোরীয় যুদ্ধারম্ভ)—নভেম্বর ১৯৫৩ ঃ এইকালে কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে

(৬) তদেব, পৃ ৮২৩

(৭) G. C Allen, Japan s economic recovery এবং A short-history of modern Japan দ্রষ্টব্য

জাপানের অর্থনীতিতে সহসা উন্নত অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থনীতিতে পূর্বের নিশ্চলতাও দূরীভূত হয়। কোরিয়ার যুদ্ধ চলাকালে দ্রব্যমূল্য অবশ্য ৫০ শতাংশের অধিক বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। কিন্তু যেহেতু জাপান থেকে যুদ্ধকালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক বাহিনীর জন্য প্রচুর পরিমাণে সাজ-সরঞ্জাম আমদানি করা হতে থাকে, সেইজন্য জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যে মন্দাভাব দূরীভূত হয় এবং অর্থনীতিতে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। (৪) নভেম্বর ১৯৫৩—ডিসেম্বর ১৯৫৪ঃ এইকালে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়। (৫) জানুয়ারী ১৯৫৫—মার্চ ১৯৫৭ঃ এইকালে জাপানী অর্থনীতির সর্বস্তরে (রপ্তানি ব্যবসায় সমেত) দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এ্যালেনের মতে, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুত্থান সম্পূর্ণ হয়, একথা বলা যেতে পারে। (৬) ১৯৬০ এর দশকে জাপানের অর্থনীতিতে অধিকতর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬১—৭১ দশকে জাপানী সরকার আয় দ্বিগুণ করবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর ফলে শিল্পপতিগণ যথেষ্ট উৎসাহ পান এবং শিল্পোপকরণ উৎপাদনে যথেষ্ট মূলধন বিনিয়োগ শুরু করেন। উক্ত দশকে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে শ্রমিক নিয়োগ (মনুষ্য-শ্রম) অপেক্ষা যন্ত্রের ব্যবহার অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

শিল্পোৎপাদনে গঠন-সংক্রান্ত পরিবর্তন সাধন ঃ

যুদ্ধোত্তর যুগে যখন জাপানের অর্থনীতিতে পুনরুত্থান শুরু হয় তখন এই পুনরুত্থানের অঙ্গ হিসাবে শিল্পোৎপাদনে গঠন-সংক্রান্ত পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমতঃ, আদিম বা প্রাথমিক শিল্প (যথা কৃষি) আর গুরুত্ব পায় না, তৎপরিবর্তে গুরুত্ব আরোপিত হয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদিত শিল্পের উপর। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ চলাকালীন সূতিবস্ত্র সংক্রান্ত লঘু শিল্প (যথা কার্পাসবস্ত্র বা রেশম বস্ত্র জাতীয় শিল্প) অগ্রাধিকার পায় না, অগ্রাধিকার পায় ভারী শিল্প। ফলে তুলা বা কাঁচা রেশমের ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে সূতিবস্ত্র শিল্পের উপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে তুলা ও কাঁচা রেশমের ব্যবসাও গুরুত্ব লাভ করে। কৃত্রিম রেশম ও পশম সংক্রান্ত শিল্পেও অগ্রগতি দেখা দেয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পর জাপানে কৃত্রিম সূক্ষ্ম সূত্রের উৎপাদন শুরু হয়। ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে এই উৎপাদন সম্প্রসারিত হয়। সূতিবস্ত্র শিল্পে প্রকৃতি-দত্ত তুলা, রেশম বা পশম থেকে প্রস্তুত সূত্র অপেক্ষা কৃত্রিম সূত্র অধিকতর আদৃত হয়।

যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের শিল্পোন্নতি অধিকতর নির্ভরশীল হয় ধাতব, রাসায়নিক ও যন্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত শিল্প সমূহের সম্প্রসারণের উপর। এই

তিনপ্রকার শিল্পে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটে। ইলেকট্রণ শিল্প দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। ফলে টি. ভি. এবং কম্পিউটার যন্ত্রের উৎপাদনও প্রসার লাভ করে। মোটর গাড়ী নির্মাণে লক্ষণীয় উন্নতি ঘটে। ইস্পাত শিল্পে জাপান স্থান পায় যুক্তরাষ্ট্রের পরই। কয়লা উৎপাদন সন্তোষজনক না হওয়ায় জাপানকে কয়লা আমদানি করতে হয়। অন্যান্য শিল্পাগ্রয়ী দেশের মত জাপানকে শক্তির জন্য তৈল-নির্ভর হতে হয়। নিজস্ব তৈলের সংস্থান না থাকায় জাপানকে তৈল আমদানি করতে হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য :

যুদ্ধকালে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি ছিল অধিকতর বেশী। যুদ্ধশেষে রপ্তানিতে পুনরুত্থান ঘটে, যদিও ধীর গতিতে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দেও উৎপাদন ও রপ্তানির মধ্যে কোন সঙ্গতি ছিল না। এই অসঙ্গতির কতকগুলি কারণও ছিল। ১৯৩০ এর দশকে পূর্ব এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এই দুই দেশের বাজারে জাপান তার উৎপাদিত দ্রব্যাদি রপ্তানি করত এবং ঐ দুই দেশ থেকে জাপান তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করত। জাপান যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করত কাঁচা রেশম, পাত্রমধ্যে রক্ষিত মৎস্য, চা, মৃন্ময় পাত্র এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করত কাঁচা তুলা, খনিজ তৈল, গম, অকেজো লোহালক্কড় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পদ্রব্য। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জাপান রপ্তানি করত সুতিবস্ত্র-সংক্রান্ত শিল্পদ্রব্য এবং বিবিধ দ্রব্যাদি। উত্তর চীন ও মাঞ্চুরিয়াতে জাপান রপ্তানি করত যন্ত্রপাতি, মূলধনী পণ্য, যথা রেলগাড়ী, জাহাজ ইত্যাদি। এশিয়া থেকে জাপান আমদানি করত কাঁচামাল, তুলা, রবার, উদ্ভিজ্জ তৈল, খনিজ তেল, অপরিশোধিত এবং পরিশোধিত ধাতু এবং খাদ্যদ্রব্য। চাউল আমদানি হত কোরিয়া ও ফরমোজা থেকে, চিনি আমদানি হত ফরমোজা থেকে এবং সয়াবিন আসত মাঞ্চুরিয়া থেকে।

যুদ্ধশেষে জাপানের এশীয় সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে জাপানের আর কোরিয়া, ফরমোজা, মাঞ্চুরিয়া, উত্তর চীন প্রভৃতি এশীয় দেশে পূর্বের মত জাপানী শিল্প দ্রব্যাদি রপ্তানির সুযোগ থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রে নাইলনের ব্যবহার জনপ্রিয় হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের কাঁচা রেশমের রপ্তানি ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। যুদ্ধ চলাকালীন এবং যুদ্ধ শেষে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সুতিবস্ত্রাদির উৎপাদন সম্প্রসারণের ফলে ঐ সব অঞ্চলে জাপানী সুতিবস্ত্রাদির রপ্তানি যথেষ্ট হ্রাস পায়। সুতরাং রপ্তানি ব্যবসায়ের পুনরুজ্জীবনের জন্য জাপানের এখন প্রয়োজন হয় নূতন বাজারের।

১৯৬০ এর পর অথবা ১৯৬০ এর দশকে জাপানের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। উক্ত দশকে জাপানের রপ্তানির পরিমাণ বিশ্বের রপ্তানি ব্যবসায়ের পরিমাণের তুলনায় মোটের মাথায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ নাগাদ জাপানী রপ্তানির পরিমাণ ১৯৬০ এর দশকের অপেক্ষা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়।

জাইবাৎসু গোষ্ঠীর অবদান

যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের জন্য জাইবাৎসু গোষ্ঠীর অবদান তুচ্ছ ছিল না। যদিও জেনারেল ম্যাকার্থারের বিরোধিতার ফলে জাইবাৎসু পরিবার গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক প্রভাব বিনষ্ট-প্রায় হয় এবং জাইবাৎসু গোষ্ঠী কর্তৃক নিযুক্ত বান্টো বা ম্যানেজারদের হস্ত থেকে দেশের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অপসৃত হয়, তথাপি যুক্তরাষ্ট্র-প্রবর্তিত সামরিক শাসনের অবসানে জাইবাৎসুর পুনরভ্যুত্থান ঘটে এবং পুনরায় জাইবাৎসু পরিবারবর্গ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনে সোৎসাহে অগ্রসর হন। ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে দেশের শিল্পোৎপাদন ও অর্থনীতি পুনরায় মিৎসুই, মিৎসুবিশি ও সুমিটোমো পরিবারবর্গের নিয়ন্ত্রাধীন হয়। যদিও ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাইবাৎসু পরিবারবর্গ লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রভাবশালী হয়, তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে প্রাক্-যুদ্ধ যুগে তারা যতদূর প্রভাবশালী ছিল, পরে তদনুরূপ প্রভাবশালী থাকে না। তথাপি যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুত্থানে জাইবাৎসুর অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ঃ

যে সব ব্যাংক প্রতিষ্ঠান জাপানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে সেগুলি, যথা প্রাইভেট ব্যাংক, স্পেশাল ব্যাংক, ঔপনিবেশিক ব্যাংক, ইউকোহামা স্পিসি ব্যাংক, যুদ্ধশেষে ম্যাকার্থারের সামরিক শাসনকালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তৎপরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় নূতন ধরণের ব্যাংক, যথা আমদানি-রপ্তানি ব্যাংক (Export-Import Bank), জাপান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক, ব্যাঙ্ক অব টোকিও (একটি বিশেষ বৈদেশিক বিনিময়ের ব্যাংক)। ধীরে ধীরে আরও অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা সিটি ব্যাংক, লোকাল ব্যাংক ইত্যাদি। এইভাবে ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি জাপানে বাণিজ্যিক তৎপরতার ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাক্ষর বহন করে।

জমিদারদের নিকট থেকে ক্রীত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত (অবশ্য মূল্যের বিনিময়ে) হয় ম্যাকার্থারের শাসনকালেই।[৮] ফলে কৃষকদের কিছুটা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ঘটে।

---

(৮) এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে জাপান' শীর্ষক আলোচনা পঠিতব্য।

এইভাবে যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৫০ এর দশকের পর থেকেই জাপানের স্থূল জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫১-৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গড়ে ৮'৬ শতাংশ, ১৯৫৫-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৯'১ শতাংশ, ১৯৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৯'৭ শতাংশ এবং ১৯৬৫-৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৩'১ শতাংশের অধিক। ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে জাপান পরিগণিত হয় জাহাজ, রেডিও ও টেলিভিশন উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে; মোটরযান ও রবার-জাত দ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী দেশ হিসাবে এবং সিমেণ্ট ও লৌহ উৎপাদনে তৃতীয় স্থানের অধিকারীরূপে। ১৯৮১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ মোটরযান উৎপাদনে জাপান পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।[৯] যখন জাপানে প্রস্তুত মোটরগাড়ী এবং ট্রানজিস্টার সমগ্র বিশ্বে রপ্তানি হতে থাকে তখন জাপানের অর্থনীতিতে এক বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে, একথা ভেবে বিশ্বের বিস্ময় জাগে।

যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের অর্থনীতিতে এই বিস্ময়কর অগ্রগতির কারণ কি? প্রথমতঃ যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবদান অনস্বীকার্য। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আর্থিক অনুদান এবং জেনারেল ম্যাকর্থারের ভূমি-সংস্কার জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুত্থান সম্ভাব্য করে তোলে। দ্বিতীয়তঃ, কোরিয়ার যুদ্ধ (১৯৫০-৫৩) জাপানের শিল্পোৎপাদনে, বিশেষতঃ সামরিক সাজসরঞ্জাম উৎপাদনে, যথেষ্ট প্রেরণা দান করে। ফলে শিল্পোৎপাদন সম্প্রসারিত হয়। তৃতীয়তঃ, উৎপাদনশীল ও উচ্চমানের শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব জাপানের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের জনসংখ্যা ছিল ৭,২১,৪৭,০০০। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০,৭৫,৮৯,০০০। জাপান পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশগুলির মধ্যে সপ্তম স্থানের অধিকারী হিসাবে পরিচিত হয়। কিন্তু জাপান সরকার ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জন্মহার স্থির বা ধার্য ক'রে দেন অথচ মৃত্যুহার হ্রাস পায় না। পরিণামে জাপানী জনসংখ্যার অন্ততঃ ৬০ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৫৫ বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।[১০] ১৫-৫৫ বৎসর বয়স্ক কর্মঠ জাপানী নাগরিকগণ শ্রমিক হিসাবে জাপানের শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্বতঃই সহায়ক হয়। এরূপ শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন শিল্পে যাবজ্জীবন নিযুক্ত হয় এবং নিয়োগের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বেতন পায়। কর্মে যাবজ্জীবন নিয়োগ হেতু তথা নিয়োগের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মজুরী নির্ধারণের ব্যবস্থা হেতু শ্রমিকদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য জাগে। শিল্প-

(৯) Encyclopoedia of Japan, তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য

(১০) তদেব। পৃ. ২০০

প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকদের পক্ষে শ্রমিকদিগকে তাদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে শিল্পোৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনমত বদল করা সম্ভব হয়। ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে শিল্পোৎপাদন সম্প্রসারিত হয়। চতুর্থতঃ, জাপানে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সামরিক ও বেসামরিক খাতে ব্যয় স্বল্প ছিল। বিভিন্ন খাতে জাপান সরকারের ব্যয় হত মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৬ শতাংশেরও কম অথচ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ব্যয় ৩০ শতাংশ। এতদ্ব্যতীত জাপানীরা ঐতিহ্যক্রমে মিতব্যায়ী। ফলে জাপানীরা তাদের বাৎসরিক আয়ের ২০ শতাংশ সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। এই সঞ্চিত অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যে ও উৎপাদনে মূলধন হিসাবে বিনিয়োজিত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ৩৬'৫ শতাংশ থেকে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ১৩৯ শতাংশ পর্যন্ত।[১১] পঞ্চমতঃ, জাপানী সরকার এবং জাপানী শিল্পপতিদের মধ্যে শিল্পোৎপাদন বিষয়ে একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জাপানের রক্ষণশীল সরকার দেশে শিল্পোন্নয়নে অতীব আগ্রহী থাকে। শিল্পোন্নয়নের পথে বাধা দূর করবার উদ্দেশ্যে জাপানী-সরকার যৌথ সংস্থার তথা ব্যক্তিগত আয়করের হার হ্রাস করেন, এবং ব্যাংক থেকে, বিশেষতঃ জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক অব জাপান থেকে, ঋণদানের ব্যবস্থা করেন। ফলে সরকারের সহানুভূতি-পুষ্ট শিল্পোৎপাদন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ষষ্ঠতঃ, সস্তাদরে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ, পাশ্চাত্ত্য প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ এবং বৈদেশিক বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিক্রয়ের সুবিধা—এই সব ১৯৫০ এর দশকে এবং ১৯৬০ এর দশকে জাপানে শিল্পোন্নয়নের পথ সুগম করে। মোট কথা, যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের অর্থনীতিতে এই চমকপ্রদ অগ্রগতিকে অলৌকিক হিসাবে চিহ্নিত না ক'রে বরং চিহ্নিত করা উচিত একটি সুদক্ষ জাতির আত্মবিশ্বাসের এবং আত্মোন্নতিতে অনড় সংকল্পের ফলশ্রুতি হিসাবে।

(১১) তদেব

অষ্টম অধ্যায়

রাজনৈতিক দলের উত্থান ও ভূমিকা—জাইবাৎসুর উত্থান তথা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা

রাজনৈতিক দল :

জাপানে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ রাজনৈতিক দল গঠনের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতকে, শোগুন শাসনের অবসানের পর। তখন দেশের শাসনভার তত্ত্বগতভাবে জাপানী সম্রাটের উপর ন্যস্ত থাকলেও কার্যতঃ ন্যস্ত হয় সাতসুমা, চোষু প্রভৃতি পশ্চিম জাপানের সামন্ত শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের উপর। ফলে রেস্টোরেশন সরকার সাত-চো-তো-হি সরকার নামে আখ্যাত হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সাত-চো-তো-হি সরকারের ভাঙ্গন ধরে যখন কোরিয়াকে কেন্দ্র ক'রে উক্ত চারটি সরিক দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তোজা ও হিজেন কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষপাতী থাকে কিন্তু সাতসুমা ও চোষু তখন কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণায় ঘোরতর আপত্তি জানায়। প্রতিবাদে তোজা ও হিজেন প্রশাসনিক দায়িত্ব ত্যাগ ক'রে সরকারের বিরোধী পক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করে। তোজা ও হিজেনের প্রশাসনিক দায়িত্ব ত্যাগ করার ফলে জাপানী সরকার সাত-চো সরকার নামে পরিচিত হয়। বিরোধী পক্ষের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তোজার অধিবাসী ইতাগাকি তাইসুকে এবং হিজেনের অধিবাসী কাউন্ট ওকুমা। ১৮৭৩—১৮৯০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তোজা ও হিজেন নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব অনুচরদের নিয়ে 'দল' গঠন ক'রে সাত-চো সরকারকে বিপর্যস্ত করবার প্রয়াস পান, অপর দিকে সাত-চো সরকার আমলাতন্ত্রের হস্ত শক্ত করতে সচেষ্টা হন। সাত-চো সরকারের বিরুদ্ধে অনেক জমিদার ও ক্ষুদ্র সামুরাই শ্রেণী ও তোজা-হিজেনের নেতৃবৃন্দ ইতাগাকি ও ওকুমার সঙ্গে মিলিত হন। এই বিরোধীপক্ষ কর্তৃক গঠিত 'দলের' পশ্চাতে জাতীয় স্বার্থে গৃহীত কোন সাধারণ-গ্রহণীয় নীতি সক্রিয় ছিল না, সক্রিয় ছিল ব্যক্তিগত বিরোধ এবং ব্যক্তিগত প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা স্থাপনের প্রয়াস। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মেজী সংবিধান অনুযায়ী যখন সর্বপ্রথম ডায়েট বা সংসদ আহূত হয় তখন জাতীয় স্বার্থে গৃহীত নীতি দলগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং দলগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়।

বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক দলগঠনের পূর্বে রাজনৈতিক সমিতির

কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক সমিতিগুলি (Political Society) রাজনৈতিক দল গঠনের পথ প্রশস্ত করে। এ হেন সমিতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আইকোকু কোটো (Aikoku koto বা Public Party of Patriots), রিস্‌শিশা (Risshisha বা Society to Establish One's Moral Will), এবং আইকোকুশ (Aikokusha বা Society of Patriots)। আইকোকু কোটোর সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশ থেকে প্রত্যাগত বহু ছাত্রের সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সমিতিটি প্রশাসনে যথেচ্ছাচারিতার নিন্দা করত এবং জনগণ-নির্বাচিত একটি পরিষদ স্থাপনের দাবি করত। রিস্‌শিশার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সামুরাই শ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা। রিস্‌শিশার বৃহত্তর আদর্শ ছিল একটি জনপ্রিয় বিধানসভা গঠন করা। এই উদ্দেশ্যে রিস্‌শিশার প্রতিষ্ঠাতা ইতাগাকি একটি রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনটি যাতে দেশব্যাপী হয় তজ্জন্য তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ওসাকাতে অপর একটি সমিতি গঠন করেন—নাম পূর্বোক্ত আইকোকুশ। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ২১টিরও অধিক রাজনৈতিক সমিতি গড়ে ওঠে। পরে আরও অনেক সমিতি গঠিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই সব সমিতি যৌথভাবে ওসাকা শহরে একটি সম্মেলন আহ্বান করে। সহস্রাধিক সভ্য এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে একটি প্রতিনিধি-মূলক সংসদ (ডায়েট) প্রতিষ্ঠার দাবি জানান এবং একটি রাজনৈতিক আন্দোলনও শুরু করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মেজী সম্রাট মুৎসুহিতো ঘোষণা করেন যে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় বিধান সভা (National Assembly) প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তজ্জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ও নির্দেশ দান করেন।

এই ঘোষণার পাঁচ মাসের মধ্যে তিনটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়, যথা ইতাগাকির জিয়ুতো (Jiyuto) বা উদারপন্থী দল, কাউণ্ট ওকুমার রিক্‌কেন কাইসিন্‌তো (Rikken Kaisinto) বা নিয়মতান্ত্রিক প্রগতিশীল দল এবং ফুকুচি-সংগঠিত রিক্‌কেন তেই-সেই-তো (Rikken Teiseito) বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রদল। এই তিনটি রাজনৈতিক দলের আদর্শগত পার্থক্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।[১]

এই সমস্ত রাজনৈতিক দল সরকারের বিরুদ্ধ মনোভাবের সম্মুখীন হয়। সর্বশক্তি নিয়োজিত ক'রে সরকার রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতা করেন এবং তাদের উচ্ছেদ সাধনে সচেষ্ট হন। প্রেস তথা সাধারণ পুস্তকাদি প্রকাশনার স্বাধীনতা সীমিত ক'রে মেজী সরকার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে একটি—'প্রেস ল' বিধিবন্ধ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই 'প্রেস ল' পরিবর্তিত হয় এবং পরিবর্তন-কালে আইনের বিধানগুলি অধিকতর কঠোর করা হয়। ফলে সংবাদপত্রের

১ তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

দমন ও নিলম্বন (Suspension) তথা সম্পাদক, মালিক ও পরিচালকের গ্রেপ্তার এবং কারাবাস প্রায় দৈনন্দিন ঘটনার পর্যায়ভুক্ত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অভাবে রাজনৈতিক দলের অগ্রগতির সম্ভাবনা সাময়িকভাবে ক্ষীণ হয়ে পড়ে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে স্থির হয় যে রাজনৈতিক দলের দলিলপত্র পুলিশের খাতায় তালিকাভুক্ত করতে হবে, পুলিশের অনুমতি বিনা কোন দলগত সভা আহ্বান করা যাবে না, কোন দলের শাখা স্থাপন নিষিদ্ধ হবে এবং দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনও নিষিদ্ধ হবে। এই জাতীয় দল-বিরোধী সরকারী আইন প্রণয়ণের ফলে রাজনৈতিক দলগুলির ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জিয়ুতো দলটি ভেঙ্গে যায় এবং অবশিষ্ট দলগুলি কোনরূপে সীমিত পরিধির মধ্যে কার্যকলাপ পরিচালিত করে। রাজনৈতিক দলের দমনের জন্য যে সমস্ত আইন প্রণীত হয় তন্মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের 'পিস প্রিজার-ভেসন ল' (Peace Preservatoin Law) বা শান্তি সংরক্ষণের জন্য আইন। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে সকল প্রকার গুপ্ত সভা-সমিতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হবে, যে কোন মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষিত হবে যদি সে মুদ্রাযন্ত্র দেশের শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হওয়ার অনুকূলে কোন পুস্তক বা পুস্তিকা মুদ্রিত করে, টোকিও এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যে কোন অধিবাসী স্বীয় জেলা থেকে তিন বৎসরের জন্য নির্বাসিত হবেন যদি তাঁর উপর এই সন্দেহ জাগে যে তিনি জনগণের শান্তি বিপন্ন করার অভিপ্রায় পোষণ করেন। আদালতের মাধ্যমে এই আইন-প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হত না। এই আইন যে দিন কার্যকরী হয় সেই দিনই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্ট ইয়ামাগাতা আরিটোমো (Yamagata Aritomo) টোকিও থেকে অনেক দলনেতা সহ ৬০০ ব্যক্তিকে নির্বাসিত করেন।

'পিস প্রিজারভেসন' আইন বিধিবদ্ধ হবার তিন বৎরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ডায়েট প্রতিষ্ঠিত হয়। ডায়েট প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজনৈতিক দলগুলি দেশের রাজনীতির উপর উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ১৯৩০ দশকের গোড়ার দিক থেকে এই প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে দলগুলি সাময়িকভাবে বাতিল হয়ে যায়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের আত্মসমর্পণের পর রাজনৈতিক দলগুলির পুনরুত্থান ঘটে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে যখন জাপান মার্কিণ সামরিক শাসন থেকে অব্যাহতি পায় তখন জাপানে প্রতিনিধিমূলক সংসদীয় গণতন্ত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ হেন গণতান্ত্রিক ক্লাইমেটে রাজনৈতিক দলগুলি দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলের জাপানের রাজনীতিতে এই সক্রিয়তা এবং গুরুত্ব তখন থেকে সমভাবে অব্যাহত আছে।

রাজনৈতিক দলের কার্য্যকলাপ, ১৮৯০-১৯০১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ডায়েটের হস্তে ছিল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, আর প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পিত ছিল মন্ত্রীসভার উপর কিন্তু মেজী সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রীসভার উপর ডায়েটের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না। ফলে ডায়েট ও মন্ত্রীসভার মধ্যে অর্থাৎ আইন ও প্রশাসনিক বিভাগদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষ জাপানের তৎকালীন রাজনীতিতে একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিক কারণেই রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে মনোমালিন্য জাপানী রাজনীতিতে জটিলতার সৃষ্টি করে।

১৮৯০-১৯০১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহুদলের উত্থান হয়। এদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য, যে দুটি পুরাতন নামেই পরিচিত থাকে অর্থাৎ জিউতো (Jiyuto) এবং কাইশিনতো (Kaishinto)। গোড়ার দিকে সরকারী কর্মচারীরা রাজনৈতিক দল থেকে দূরে থাকতেন। কাউন্ট ইটো সর্বপ্রথম বিধান দেন যে মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের কোন সম্পর্ক থাকবে না অর্থাৎ কোন দল-ভিত্তিক মন্ত্রীসভা গঠিত হবে না। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে কাউন্ট ইটো এই নীতি প্রচার করেন। জাপানে সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১লা জুলাই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। বিরোধী পক্ষ নির্বাচনে সাফল্য অর্জন ক'রে মিন্টো (Minto বা Peoples Party) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন; অপর পক্ষে সরকারের সমর্থকেরা রিটো (Rito বা Official Party) নামে একটি দল গঠন করেন। ডায়েটে বিরোধী পক্ষ যে ভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরোধিতা করেন তাতে কাউন্ট ইটো বাধ্য হন ডায়েটের অধিবেশন দুবার স্থগিত রাখতে। ইটো অবশেষে জানুয়ারী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ডায়েটের অধিবেশন ভেঙ্গে দেন। ঐ বৎসর ১লা মার্চ নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নব-গঠিত ডায়েট যথাপূর্ব ও যথারীতি সরকারের বিরোধিতার পথ অনুসরণ করে। তখন চীন-জাপান যুদ্ধ আসন্ন-প্রায় এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ শোগুনযুগে জাপানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত অসম সন্ধিগুলি অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্তে অনড়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইটো পুনরায় ডায়েটের অধিবেশন ভেঙ্গে দেন জুন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। ইটো কর্তৃক দ্বিতীয়বার ডায়েটের অধিবেশন ভেঙ্গে দেবার পর ডায়েট ও মন্ত্রীসভার মধ্যে একটি অস্বাভাবিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। নূতন ডায়েট নির্বাচিত হয় ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। এই নব-নির্বাচিত ডায়েট সরকারের যুদ্ধ-সংক্রান্ত সকল বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে এবং বিনা আলোচনায় অনুমোদন করে। উদারপন্থীদলের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে ইটো তাঁর যুদ্ধনীতি সাফল্যমণ্ডিত করেন। ইটো এবং উদারপন্থীদের মধ্যে এ হেন সহযোগিতা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ওকুমার নেতৃত্বে শিমপোটো

(Shimpoto) বা Progressive Party) নামে একটি সরকার-বিরোধ দল গঠিত হয়। ওকুমা তাঁর পূর্ব-গঠিত কাইসণ্টো দলটি ভেঙ্গে দেন। তখন এর সভ্যেরা শিমপোটো দলে যোগদান করেন। শিমপোটো ডায়েটের নিকট মন্ত্রীসভার দায়িত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইটো ৩১শে অগাণ্ট, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করেন কিন্তু ১২ই জানুয়ারী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতাসীন হন। ঐ বৎসরের ২২শে জুন জিউতো এবং শিমপোটো দল দুটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তখন ঐ দুই দলের সভ্যেরা মিলিতভাবে কেনসেইতো (Kenseito বা Constitutional Party) নামে একটি নূতন দল গঠন করেন। এই কালে ইটো প্রস্তাব করেন যে সরকারের সঙ্গে প্রভাবশালী দলের সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় কিন্তু ইয়ামাগাতো ইটোর প্রস্তাবে সম্মত হন না। তাঁর মতে সরকারের কোন রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভরশীলতা সংবিধান-বিরোধী। অতএব রাজনৈতিক দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাই সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। ৩০শে জুন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইটো পুনরায় পদত্যাগ করেন। ঐ দিনই ওকুমা একটি নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তাঁর নব-গঠিত মন্ত্রীসভাটি ছিল আপাতদৃষ্টিতে দল-ভিত্তিক মন্ত্রীসভা, যেহেতু তৎকালীন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের সমর্থনের উপর এই মন্ত্রীসভা নির্ভরশীল ছিল। ওকুমা সরকারের দায়িত্বকাল চার মাসের অধিক ছিল না। তথাপি এই স্বল্পায়ু সরকার জাপানের রাজনীতিতে এক নূতন ধারা সূচিত করে। পূর্বে জাপানের রাজনীতিতে সংস্কার ছিল যে মন্ত্রীসভার সভ্য কোন দলভুক্ত হবেন না। ওকুমার স্বল্পস্থায়ী সরকার সে সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে। ইহাই ওকুমা সরকারের গুরুত্ব।

৮ই নভেম্বর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইয়ামাগাতো পরিবর্তিত রাজনৈতিক দল নিয়ে নূতন সরকার গঠন করেন। তিনি তাঁর মন্ত্রীসভায় কোন দলীয় সভ্যকে স্থান দেন নাই। তথাপি তিনি কেনসেইতো দলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের কোন সংযোগ না থাকার নীতির প্রকাশ্য-ভাবে নিন্দা করেন। ইয়ামাগাতো ক্ষমতাসীন থাকেন ১৯শে অক্টোবর ১৯০০ খৃষ্টাব্দ অবধি।

ইয়ামাগাতার পদত্যাগের পর ইটো পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এবার তিনি ক্ষমতাসীন থাকেন ১৯শে অক্টোবর ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০ই মে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এবার ইটো তাঁর নব-গঠিত দল রিক্কেন সেইয়ুকাই-এর (Rikken Seiyukai বা Friends of Constitutional Government) নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর সরকার রাজনৈতিক-দল-ভিত্তিক রূপে চিহ্নিত হয়। দশ বৎসর পূর্বে তিনি দল-ভিত্তিক সরকার গঠনের বিরোধী ছিলেন। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রতিনিধি হিসাবে

মনোনীত মন্ত্রীদ্বয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যতীত অপর সকল মন্ত্রীই বিভিন্ন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। সংসদের নিম্নকক্ষে সেইয়ূকাই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ইটোর এই চতুর্থ এবং সর্বশেষ মন্ত্রীসভার কার্যক্রম মোটামুটি সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হয়।

১০ই মে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইটোর পদত্যাগের পর কাতসুরা (Katsura) এবং সেইয়নজি (Saionji) নামে দুই নেতা ১৯০১—১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মেজী সম্রাট মুৎসুহিতোর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যোশিহিতো জাপানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯১২ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত যে কাল তা জাপানের ইতিহাসে তাইশো (Taisho) যুগ নামে প্রসিদ্ধ। যোশিহিতো ছিলেন ভগ্নস্বাস্থ্য এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত। কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় একতার প্রতীক হিসাবে বিরাজিত থাকেন। তাঁর পূর্বসূরী মুৎসুহিতো রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকেন নি। মেজী যুগের অবসানে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেমন সম্রাটের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে, তেমনি রাজনীতিতেও রাজনৈতিক দলগুলির ক্রিয়াকলাপে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। মেজীযুগের অবসানের পূর্বেই, অর্থাৎ ইটোকর্তৃক চতুর্থবার মন্ত্রীসভা গঠনের কাল থেকে (১৯০০-১) রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রশাসনিক সংস্থার সংযোগ শুরু হয়। তাইশো যুগের আবির্ভাবের পর এই সংযোগ অর্থাৎ সংসদীয় সরকারের রীতি অনুযায়ী দল-ভিত্তিক মন্ত্রীসভা গঠন জাপানের রাজনীতিতে স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। সংসদীয় সংবিধান অনুসারে মন্ত্রীসভা গঠিত হতে থাকে। ডায়েটের নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক'রে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ফলে প্রধানমন্ত্রীর দলটি হয় সরকারের স্বপক্ষীয় দল, আর যে দলটি প্রশাসন হতে বিচ্ছিন্ন থাকে সে দলটি পরিচিত হয় বিরোধী দল হিসাবে।

রাজনৈতিক দল (১৯০১—১৮)

১৯০১—১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইটোর রিক্কেন সেইয়ূকাই দল ব্যতীত গঠিত হয় কোকুমিন্টো দল (Kokuminto বা Nationalist Party), ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। সিমপোটো দলের স্থলে এই দলটি প্রবর্তিত হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয় রিক্কেন ডোশিকাই দল (Rikken Doshikai বা Constitutional Fellow Thinkers Society)। মার্চ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়

কেনসেইকাই দল (Kenseikai বা Constitutional Party)। উক্ত বৎসরের সাধারণ নির্বাচনে সরকারের পরাজয় ঘটে। তখন সরকার সর্বপ্রথম জনগণের নিকট আবেদন জানায়।

রাজনৈতিক দল : (১৯১৮-৩১)

১৯১৮-৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাপানী প্রশাসনে নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সেইয়ুকাই এর সভাপতি হর কেই (Hara Kei) প্রধানমন্ত্রী হন। হর কেই-এর মন্ত্রীসভা ছিল সর্বপ্রথম মন্ত্রীসভা যেখানে প্রধানমন্ত্রী তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্ত্রিগণ একই দলভুক্ত ছিলেন। হর-কেই-ই সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষ (Commoner) হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি অভিহিত ছিলেন গ্রেট কমানার (Great Commoner) পদবীতে। সুতরাং তাঁর নির্বাচন সংসদীয় প্রশাসনের অগ্রগতির পথে ছিল একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। হর-কেই-এর প্রধানমন্ত্রীত্ব স্থায়ী থাকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ বৎসরে তিনি নিহত হন। তাঁর শাসনকালে জাপানের রাজনীতিতে চোষু প্রভৃতি গোষ্ঠীর প্রভাবের স্থলে ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রভাব প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। ২০শে এপ্রিল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ওসাকাতে গঠিত হয় জিতসুগিয়ো ডোশিকাই (Jitshugyo Doshikai বা Business men's Association)। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয় মিনসেইতো দল (Minseito Party)। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে গঠিত হয় মেইসেইকাই দল (Meiseikai Party বা Liberal Party)। এই দলের আদর্শ ছিল বিকেন্দ্রীকরণ, নিম্নশ্রেণীভুক্ত জনগণের অবস্থার উন্নতিসাধন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে হামাগুচি (Hamaguchi) মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তাঁর মন্ত্রীসভা ছিল সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক দল-ভিত্তিক। তাঁর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মিনসেইতো দলের নেতা ইনুকাই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। ইনুকাই এর হত্যার সঙ্গে দল-ভিত্তিক সরকার গঠনে সাময়িক বিরতি ঘটে যদিও মিনসেইতো ও সেইয়ুকাই—এই দুটি দল সক্রিয় থাকে। ১৯৩২-৩৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে জাপানে সামরিক শাসন প্রচলিত হয়। তখন শোয়া-কাই (Showa-Kai) নামে একটি সামরিক দল রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সমস্ত রাজনৈতিক দল বাতিল হয়ে যায়। সকল দল আই. আর. এ. এ. (I. R. A. A. Imperial Rule Assistance Association) এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রাক্‌-যুদ্ধকালের রাজনৈতিক দলগুলির পুনরুত্থান ঘটে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত নূতন সংবিধান দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক গণতান্ত্রিক 'ক্লাইমেট' প্রবর্তিত

করে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে জাপান সামরিক শাসন-মুক্ত হয়। তারপর থেকে জাপানের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। দল-ভিত্তিক মন্ত্রীসভা গঠন প্রশাসনের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে গণ্য হয়।

জাইবাৎসু—উত্থান এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা :

শোগুন শাসনের অবসানের পর মেজীযুগের অভ্যুদয়ে জাপানের অর্থনীতিতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে। কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি পরিণত হয় শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতিতে। এই পরিবর্তন ছিল ব্যয়-সাপেক্ষ অথচ মেজী সরকারের স্বাভাবিক রাজস্ব থেকে সে ব্যয় সঙ্কুলান করা সম্ভবপর ছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকারকে কতকগুলি সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী বা বণিক পরিবার গোষ্ঠীর শরণাপন্ন হতে হয়। এই সমস্ত পরিবার ব্যবসায়ের ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে তাদের সংঘটন স্থাপন করে। একাধিক ব্যবসায়ী পরিবারের মিলনে এবং তাদের মধ্য থেকে একটি বিশিষ্ট পরিবারের নেতৃত্বে এরূপ এক একটি সংগঠন গঠিত হয়। এ হেন এক একটি সংগঠন বা গোষ্ঠী পরিচিত হয় অর্থনৈতিক 'ক্লীক' (Clique) বা অথনৈতিক 'অলিগার্কি' (Oligarchy) নামে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গঠিত মুষ্টিমেয় কয়েকটি সম্পন্ন পরিবারের সংঘটন আখ্যা পায় অর্থনৈতিক ক্লীক বা অর্থনৈতিক অলিগার্কি। জাপানী ভাষায় এরূপ সংঘটনের নাম জাইবাৎসু (Zaibatsu)। Zai শব্দের অর্থ সম্পদ এবং Batsu শব্দের অর্থ দল বা ক্লীক বা বিষয়-সম্পত্তি (Estate)। গোড়াতে জাইবাৎসু ছিল একটি রাজনৈতিক অর্থবোধক শব্দ যদ্দ্বারা বোঝাত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত বিত্তশালী ক্ষুদ্রদল বিশেষ। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাইবাৎসু শব্দ প্রযোজ্য হয় অন্য অর্থে অর্থাৎ তখন জাইবাৎসু শব্দের অর্থ হয় ব্যবসায়-ভিত্তিক যৌথ সংঘটন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য লেখকদের মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও অর্থাৎ মেজীযুগ থেকেই জাইবাৎসুর অভ্যুত্থান ঘটে অর্থনৈতিক সংঘটন হিসাবে। জাপানী লেখকেরা অবশ্য এই মত পোষণ করেন না। তাঁরা মনে করেন যে মেজীযুগ থেকে নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাইবাৎসু বলতে বুঝায় একটি অর্থনৈতিক সংঘটন। একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে মেজী সরকার মেজীযুগের শুরু থেকেই কয়েকটি বিত্তশালী বণিক পরিবার-গোষ্ঠীর নিকট হতে অর্থনৈতিক সাহায্য পায় এবং এই সমস্ত পরিবার গোষ্ঠীই জাইবাৎসু আখ্যা পায়। সাধারণভাবে গৃহীত অর্থে জাইবাৎসু বলতে বুঝায় যৌথ ব্যবসায় বা কারবারের ভিত্তিতে গঠিত কতকগুলি ধনী বণিক বা ব্যবসায়ী পরিবারের সংঘটন। বলা যেতে পারে যে জাইবাৎসু ছিল যেন জাপানের রথসচাইল্ড কিংবা নাট্টুকোটটাই চৌট্টিয়ার্স কিংবা শেঠ সম্প্রদায়।

জাইবাৎসু উত্থানের গোড়ার কথা :

মেজী সরকার প্রারংগতিতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য শিল্পের উপর অতীব গুরুত্ব আরোপ করে। রেলপথ নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, তারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা-গ্রহণ, খনি-খনন, লোহ-ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পের প্রবর্তন, চিনি উৎপাদন ইত্যাদি ছিল নূতন শিল্পনীতির পরিচায়ক। এই সব শিল্পের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন সরকারের রাজস্ব বিভাগের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। শিল্পোন্নতির বাবদ বর্ধিত ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য সরকারকে দেশের বণিক সম্প্রদায়ের নিকট আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। সরকার প্রথমে শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে না পারে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে পরোক্ষভাবে শিল্পরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন অর্থাৎ মেজী সরকার ব্যাঙ্ক, রেলপথ, ইস্পাত এবং আরও কয়েকটি শিল্প স্বীয় নিয়ন্ত্রাধীনে রেখে অবশিষ্ট শিল্পগুলি সস্তা দরে কতকগুলি সমৃদ্ধ বণিক পরিবার-গোষ্ঠীর কাছে বিক্রয় করেন। এই ধনবান বণিক পরিবার-গোষ্ঠীই জাইবাৎসু আখ্যা পায়। মূলধনের অপ্রাচুর্য মেজী সরকারকে এই বিক্রয়-নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের দশকে তৎকালীন জাপানী অর্থনীতিবিদ মাৎসুকাতা (Matsukata)-র উপদেশে মেজী সরকার জাইবাৎসু পরিবার-গোষ্ঠীর কাছে একাধিক শিল্প সস্তাদরে বিক্রয় করেন। প্রতিদানে সরকার পান আর্থিক সাহায্য। এ হেন লেন-দেন এ উভয়পক্ষই লাভবান হয়—সরকারের আর্থিক আনুকূল্য ঘটে এবং জাইবাৎসু পরিবার-গোষ্ঠীর সস্তাদরে বিভিন্ন শিল্পক্রয়ের সুযোগ মেলে। এতদ্ব্যতীত দেশের রাজনীতিকদের সঙ্গে তথা সরকারের সঙ্গে জাইবাৎসু গোষ্ঠীর নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সম্পর্কের নৈকট্যের সুযোগ নিয়ে জাইবাৎসু গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সরকার তথা রাজনীতিকদের কাছ থেকে বহুবিধ সুযোগ সুবিধা আদায় করে। মেজীযুগের অন্যতম অগ্রণী রাজনীতিক চোষুক্লানভুক্ত মারকুইস ইনোয়ে (Marquis Inouye)-এর সঙ্গে মিৎসুই-গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ইনোয়ে-কে সাহায্যদানের বিনিময়ে মিৎসুই গোষ্ঠী পূর্বতন টোকুগাওয়া শোগুনের তথা অনেক ক্ল্যানের বিষয়-সম্পত্তি সস্তাদরে স্বীয় অধিকারভুক্ত করে। ফলে জাইবাৎসু দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রাধান্য অর্জন করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, মেজী সরকারের কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতি প্রবর্তন, মেজীযুগের গোড়ার দিকে সরকারের প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, জাপানী অর্থনীতিবিদ মাৎসুকাতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একাধিক সরকারী শিল্প জাইবাৎসু গোষ্ঠীকে সস্তা দরে বিক্রয়, জাইবাৎসু গোষ্ঠীর কাছে সরকারের আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তি এবং তৎপরিবর্তে জাইবাৎসু গোষ্ঠীকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দান—এই সব কারণে

জাইবাৎসুর উদ্ভব হয় এবং ক্রমোন্নতির পথ হয় প্রশস্ত।

প্রথম সারির জাইবাৎসু পরিবার-গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি, যথা মিৎসুই (Mitsui) মিৎসুবিশি (Mitsubishi), সুমিতোমো (Sumitomo) এবং যাসুদা (Yasuda)। এই বৃহৎ চারটি গোষ্ঠী শুধু যে আয়তনেই বৃহৎ ছিল তা নয়, মূলধন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও এঁরা ছিলেন অ-সামান্য। নিজস্ব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত ক'রে এই চারটি গোষ্ঠী জাপানের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভুত্ব প্রভাব বিস্তার করে। উক্ত চারটি বৃহৎ জাইবাৎসু গোষ্ঠী ব্যতীত কতকগুলি ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী জাইবাৎসু-গোষ্ঠী জাপানের অর্থনৈতিক জীবনে সক্রিয় থাকে, যথা ওকুরা (Okura), আসানো (Asano), কুহারা (Kuhara), শিবুশাওয়া (Shibushawa), ফুরুকাওয়া (Furukawa) কাওয়াসাকি (Kawasaki), নাকাজিমা (Nakajima), নিশান (Nissan), নোমুরা ইত্যাদি।

মিৎসুই গোষ্ঠী : প্রথম সারির জাইবাৎসু পরিবার-গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ছিল মিৎসুই গোষ্ঠী। মিৎসুই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয় ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন মিৎসুই টাকাতোশি কিয়োটো ও এডোতে বস্ত্রাদি জাতীয় পণ্যদ্রব্যের বিপণি স্থাপন করেন। টাকাতোশি ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে এডোতে, ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কিয়োটোতে এবং ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে ওসাকাতে কুসীদবৃত্তি এবং বাটা সহ মুদ্রা বিনিময়ের বিপণি (Money-lending and exchange shops) স্থাপন করেন। একাধিক শহরে বিবিধ ব্যবসা ও বিপণি তদারকের উদ্দেশ্যে মিৎসুই ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে কিয়োটোতে একটি সমন্বয়মূলক সংস্থা গঠন করে, যা ওমোটোকাটা (Omotokata) নামে পরিচিত। এই সংস্থার সভা বসত প্রতি মাসে। ইহা ছিল পরবর্তীকালের হোল্ডিং কোম্পানীর অগ্রদূত। টোকুগাওয়া শোগুনের সঙ্গে মিৎসুই গোষ্ঠীর নিকট-সম্পর্ক বজায় থাকে, টোকুগাওয়া বা এডোযুগের শেষ অবধি। শোগুন শাসনের পতন অনিবার্য বুঝতে পেরে মিৎসুই শোগুন-বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। ফলে মেজী পুনর্বাসনের পরও মিৎসুই গোষ্ঠী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। শোগুন-বিরোধী আন্দোলন সফল করবার জন্য মিৎসুই আর্থিক সাহায্য দান করে। ব্যাঙ্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, এবং খনি-শিল্প—এই তিনটি ছিল মিৎসুই গোষ্ঠীর প্রধান অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা। ব্যাঙ্কব্যবসায়ে মিৎসুই গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ৩১টি শাখাবিশিষ্ট মিৎসুই ব্যাঙ্ক লিমিটেড। তখন ইহার মোট মূলধন ছিল ২ মিলিয়ন ইয়েন। এই ব্যাঙ্কের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মিৎসুই গোষ্ঠীভুক্ত বাণিজ্যিক এবং শিল্প-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান করা। বাণিজ্যের দিক থেকে উল্লেখ-

যোগ্য কৃতিত্ব হল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে গঠিত মিৎসুই ট্রেডিং কোম্পানী (Mitsui Bussan kaisha)। মীকে কোল মাইনস (Miike Coal Mines) এর কয়লা বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার ছিল উক্ত মিৎসুই ট্রেডিং কোম্পানীর। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিৎসুই কয়লা-খনিগুলি ক্রয় করে নেয়। ফলে বৃটিশ বণিকদের সঙ্গে মিৎসুই এর সংযোগ স্থাপিত হয়। বৃটিশ বণিকদের ধারণায়, পূর্ব এশিয়ার মীকে কয়লা-খনির কয়লা ছিল তাদের বাষ্পীয় পোতের পক্ষে উৎকৃষ্ট জ্বালানি। স্বল্প কালের মধ্যে মিৎসুই ট্রেডিং কোম্পানী কার্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন শহরে, যথা সাংহাই, হংকং, সিঙ্গাপুর, এবং লণ্ডন, এমনকি ভারতীয় শহরেও। মীকে কয়লা খনিকে কেন্দ্র ক'রে গঠিত হয় মিৎসুই মাইনিং লিমিটেড কোম্পানী, যা কালক্রমে জাপানের কয়লা উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত মিৎসুই গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রাধীনে আরও কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসা গড়ে ওঠে, যথা সুতিবস্ত্র শিল্প, আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়, চিনির ব্যবসায়, ধাতব দ্রব্যের ব্যবসায়, যন্ত্রপাতি-নির্মাণ শিল্প। জাপানে সর্বত্র, এমনকি বহির্জাপানেও, মিৎসুই গোষ্ঠী বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপিত করে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মিৎসুই গোষ্ঠীর সম্পত্তির অর্থমূল্য ছিল ১,৬৩৫ মিলিয়ন ইয়েন (বা ৪৭০ মিলিয়ন ডলার)। মিৎসুই গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য : মিৎসুই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, মিৎসুই কনস্ট্রাকসন কোম্পানী লিমিটেড, মিৎসুই এঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড শিপবিল্ডিং কোম্পানী লিমিটেড, মিৎসুই মাইনিং এণ্ড স্মেলটিং কোম্পানী লিমিটেড, মিৎসুই মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড, মিৎসুই পেট্রোকেমিক্যাল ইনডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, মিৎসুই সুগার কোম্পানী লিমিটেড, মিৎসুই ওয়েরহাউস কোম্পানী লিমিটেড ইত্যাদি।

মিৎসুবিশি গোষ্ঠী : আয়তন ও সম্পদের দিক থেকে মিৎসুই এর পরই উল্লেখযোগ্য মিৎসুবিশি গোষ্ঠী। টোজা-র সামুরাই বংশীয় Iwasaki Yataro (১৮৩৫—৮৫) মিৎসুবিশি গোষ্ঠীর স্থাপয়িতা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ফরমোজা আক্রমণকালে মিৎসুবিশি মেজী সরকারকে জাহাজ সরবরাহ করে। তখন থেকেই এই গোষ্ঠীর ভাগ্যে সুদিন আসে। মিৎসুবিশির মাত্র ১১টি জাহাজ এই অভিযানের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় মেজী সরকার ১৩টি বাড়তি জাহাজ ক্রয় ক'রে সেগুলি মিৎসুবিশির তত্ত্বাবধানে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে সরকার জাহাজগুলি মিৎসুবিশিকে সম্পূর্ণরূপে দান করেন। এই জাহাজগুলি প্রাপ্তির ফলে মিৎসুবিশি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মিৎসুবিশি স্টিমশিপ কোম্পানী (Mitsubishi kisen kaisha) নামে একটি কোম্পানী গঠিত করে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত কোম্পানী আরও কিছু জাহাজ মেজী সরকারের নিকট হতে দান হিসাবে পায়। সুতরাং শুরু থেকেই মিৎসুবিশি জাহাজ

সংক্রান্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। ফলে মাল আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে মিৎসুবিশি ক্রমশঃ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। মিৎসুবিশি নৌচালন-সংক্রান্ত বীমাকরণের ব্যবসায় ও (Maritime insurance business) শুরু করে এবং নাগাশাকিতে একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করে। মিৎসুবিশি খনির ব্যবসায়ে ও উন্নতি লাভ করে। মিৎসুবিশির সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য : মিৎসুবিশি ব্যাংক লিমিটেড ; মিৎসুবিশি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মিৎসুবিশি করপোরেশন ; মিৎসুবিশি গ্যাস কেমিক্যাল কোম্পানী, মিৎসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মিৎসুবিশি মেটাল করপোরেশন, মিৎসুবিশি মাইনিং এণ্ড সিমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড, মিৎসুবিশি অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, মিৎসুবিশি পেপার মিলস লিমিটেড ইত্যাদি।

সুমিতোমো গোষ্ঠী : সুমিতোমো গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুমিটোমো মাসাটোমো (১৫৮৫—১৬৫২)। শুরুতে এই গোষ্ঠী তাম্র খনি থেকে তাম্রধাতু নিষ্কাষণের ব্যবসা করত। পরবর্তীকালে ব্যবসায়ের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুমিতোমোর তৎপরতা প্রসারিত হয়, যথা ইস্পাত উৎপাদন, চাউলের ব্যবসা, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সুমিতোমো হোল্ডিং কোম্পানীর অধীনে ৪০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল, যাদের মোট লগ্নীকৃত মূলধন ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ছিল ৫৭৪ মিলিয়ন ইয়েন। ১৯ ৬ খৃষ্টাব্দে এরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়ে দাঁড়ায় ১৩৫ যাদের মোট লগ্নীকৃত মূলধন ছিল ১.৯২ বিলিয়ন ইয়েন। ১৯৪৮ এর ফেব্রুয়ারীতে জেনারেল ম্যাকার্থার সুমিটোমো হোল্ডিং কোম্পানী ভেঙ্গে দেন। সুমিতোমো পরিচালিত কোম্পানীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হল : সুমিটোমো বাকেলাইট কোম্পানী লিমিটেড, সুমিটোমো ব্যাংক লিমিটেড, সুমিটোমো সিমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড, সুমিটোমো কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, সুমিটোমো কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড, সুমিটোমো ইলেকট্রিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, সুমিটোমো ফরেষ্ট্রি কোম্পানী লিমিটেড, সুমিটোমো হেভি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, সুমিটোমো মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, সুমিটোমো ওয়ের হাউস কোম্পানী লিমিটেড, ইত্যাদি।

যাসুদা গোষ্ঠী : এই জাইবাৎসু গোষ্ঠী গঠিত হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যখন যাসুদা জেনজিরো (Yasuda Zenjiro) যাসুদা ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করেন। যাসুদা গোষ্ঠী শুরু থেকেই ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে। পরবর্তীকালে হাল্কা এবং ভারী শিল্প তথা গুদাম ঘরে মাল জমা-রাখা সংক্রান্ত ব্যবসায় ও যাসুদা গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জেনজিরোর মৃত্যুর পর যুকি তোয়োতারো (Yuki Toyotaro) যাসুদা

হোল্ডিং কোম্পানীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়। তখন যাসুদা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ছিল ৫৪২,০০০,০০০ ইয়েন এবং মোট মূলধন ছিল ১৫০,০০০,০০০ ইয়েন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যাসুদা গোষ্ঠীর নেতৃত্ব অর্পিত হয় মোরি কোজো-র (Mori kozo, ১৮৭৩—১৯৪৪) উপর। মোরি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন রিয়ার আডমিরাল টাকেই ডেইসুকে (Rear Admiral Takei Daisuke, ১৮৮৭—১৯৭২)। যাসুদা গোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোম্পানীগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—যাসুদা ফায়ার এণ্ড মেরিণ ইনসিউরান্স কোম্পানী লিমিটেড, যাসুদা ট্রাস্ট এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোম্পানী লিমিটেড, ফুজি-ব্যাঙ্ক লিমিটেড ইত্যাদি।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাইবাৎসু গোষ্ঠীর মধ্যে ফুরুকাওয়া-র ব্যবসা ছিল তাম্রখনি থেকে তাম্র-ধাতু নিষ্কাষণ করা। ফুরুকাওয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিরও ... শিবুশাওয়া ব্যাঙ্কের ব্যবসা করত এবং এঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদিও ক্রয়-বিক্রয় করত। কাওয়াশাকি জাহাজ নির্মাণ করত এবং রেলগাড়ির যন্ত্রপাতি ও ইস্পাত উৎপাদন করত। আসানো-র ব্যবসা ছিল সিমেণ্ট ও ইস্পাতের। ওকুরা ও কুহারা-র খনি-খননের ব্যবসা ছিল। এনজিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত ব্যবসায়েও গোষ্ঠী দুটি লিপ্ত ছিল।

জাইবাৎসু-র আভ্যন্তরীণ গঠন ঃ

জাইবাৎসু সংস্থাগুলি, বিশেষতঃ বৃহৎ আয়তনের সংস্থাগুলি, ছিল সমব্যবসায়ী একাধিক পরিবারের সমষ্টি, যেন ব্যবসায়ী ভিত্তিতে গঠিত এক একটি একান্নবর্তী পরিবার। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে একাদশটি পরিবার নিয়ে মিৎসুই গোষ্ঠী গঠিত ছিল। সরিক পরিবারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বর্ধিষ্ণু পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সভ্য এরূপ পরিবার-গোষ্ঠীর নেতৃত্বদান করতেন। বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার মৃত্যুর পর নেতৃত্ব অর্পিত হত একই পরিবার-ভুক্ত পরবর্তী বয়োজ্যেষ্ঠ সভ্যের উপর। জাইবাৎসু প্রথায় প্রাইমোজেনিচার বিধি (জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারের বিধি) অনুসৃত হওয়ায় বিষয়-সম্পত্তি বিভক্ত বা খণ্ডিত হত না। এরূপ জাইবাৎসু সংস্থা আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত ছিল। এক একটি সংস্থার পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকত একটি কাউন্সিলের উপর। এই কাউন্সিল পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হত বেতন-ভোগী নির্বাহিকের (Executive) উপর। যিনি অভিহিত হতেন বাণ্টো (Banto) নামে। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে বেতনভোগী এক্সিকিউটিভকে মনোনীত করা হত এবং তাঁকে ব্যবসায়োপযোগী শিক্ষাদান করা হত। ব্যবসায়ে নিপুণতা এবং জাইবাৎসু পরিবার গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্যের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করা হত। একটি

জাইবাৎসু গোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যবসায় পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য হোল্ডিং কোম্পানী (জাপানী ভাষায় হনসা, Honsa) নামে একটি কোম্পানী গঠিত হত।

জাইবাৎসু-পরিবার গোষ্ঠীর ক্রমোন্নতির কারণ :

এই ক্রমোন্নতির পশ্চাতে একাধিক কারণ বিদ্যমান ছিল, যথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইন-সংক্রান্ত।

সামাজিক কারণ : জাইবাৎসু ছিল পরিবার-ভিত্তিক। জাইবাৎসু ব্যবসায় ছিল একাধিক পরিবারের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলশ্রুতি। একটি পরিবারের সভ্যদের মধ্যে সাধারণতঃ বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের আনুগত্য থাকে এবং পরিবারের প্রধানের নেতৃত্বে অপর সকল সভ্যগণ মিলিতভাবে পারিবারিক কর্তব্য পালন করেন, যার ফলে পরিবারের সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়। জাইবাৎসু পরিবারের সভ্যেরাও সেইরূপ তাদের নেতার প্রতি অনুগত থাকত এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগিতা করত। ফলে জাইবাৎসুর ক্রমোন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। অধিকন্তু জাইবাৎসু পরিবার গোষ্ঠীর মধ্যে 'প্রাইমোজেনিচার' প্রথা বলবৎ থাকায় বিষয়সম্পত্তি বিভক্ত ও খণ্ডিত হয়ে বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকত না।

অর্থনৈতিক কারণ : মেজী সরকার দেশের শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতির প্রসারের জন্য জাইবাৎসু পরিবার গোষ্ঠীর নিকট থেকে যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সাহায্য পান। জাইবাৎসু পরিবারবর্গও বিনিময়ে সরকারের নিকট হতে নানাবিধ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এতে জাইবাৎসুর বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যখন শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর প্রথম দশকে যখন অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তখন জাইবাৎসু গোষ্ঠী দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। এইকালে জাপানের প্রায় অর্ধেক ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং ফলে শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। তখন জাইবাৎসু পরিবার গোষ্ঠীই আর্থিক সাহায্য দান ক'রে শিল্পোৎপাদন অব্যাহত রাখে। বিনিময়ে জাইবাৎসু সরকারের নিকট হতে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা আদায় করে। সরকার ও জাইবাৎসুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার শুরুতে জাইবাৎসুর মধ্যে সরকারের প্রতি একটি আনুগত্যের মনোভাব বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কালক্রমে জাইবাৎসুর এ হেন আনুগত্যের ভাব তিরোহিত হয়। তৎপরিবর্তে জাইবাৎসুর এই ধারণা হয় যে সরকারেরই উচিত জাইবাৎসু পরিবার বর্গের প্রতি আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যদি জাইবাৎসু ব্যবসায়িগণ বিদেশী মুদ্রার তথা অপরাপর সুযোগ-সুবিধার

জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকতেন, তাহলে সরকারও জাইবাৎসু পরিবার গোষ্ঠীর সাহায্যপ্রার্থী হতেন বন্ড (লিখিত প্রতিশ্রুতি) বিক্রয়ের জন্য। জাইবাৎসুর উপর সরকারের এ হেন নির্ভরশীলতা তথা সমসাময়িক রাজনৈতিক দলগুলির উপর জাইবাৎসুর প্রভাব-বিস্তার, এই দুই মুখ্য কারণে জাইবাৎসু পরিবারবর্গের হস্তে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এসে পড়ে। এক কথায় জাইবাৎসু দেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে উপদেশ দেয়। দেশে অনেকের মনে তখন এই কথা উদিত হয় যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সরকারকে চালিত করছে।[২] ফলে জাইবাৎসু সম্প্রদায় অনেকের কাছে নিন্দনীয় হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

রাজনৈতিক ও আইন-সংক্রান্ত কারণ :

মেজী যুগের অভ্যুদয়ে জাপানে এমন রাজনৈতিক ও আইন-সংক্রান্ত পরিবেশ সৃষ্ট হয় যা জাইবাৎসুভুক্ত পরিবার-গোষ্ঠীর হস্তে ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হবার পক্ষে সহায়ক হয়। তখন কোম্পানী ও ব্যাংক-সক্রান্ত আইন ছিল অত্যন্ত শিথিল। বিষয় সম্পত্তির উপর কর-নির্ধারণ পদ্ধতি তখন, বিশেষতঃ ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, ছিল অতীব উদার। কর আদায়কারীদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারলে প্রত্যক্ষ তথা পরোক্ষ আয়ের উপর কর কৌশলে নিয়মিতভাবে এড়ান সম্ভব হত। জাইবাৎসু পরিবাববর্গের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় তাদের পক্ষে কর ফাঁকি দেওয়া সহজসাধ্য ছিল। এইভাবে সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ে বিনিযোগ করা হোত। এতে জাইবাৎসুর লাভ ব্যতীত ক্ষতি ছিল না। সর্বোপরি জাইবাৎসু ছিল স্বয়ং সরকারের প্রশ্রিত। সুতরাং জাইবাৎসুর অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

জাইবাৎসুর অর্থনৈতিক ভূমিকা :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালে তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাইবাৎসুগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রাক্-প্রথমবিশ্বযুদ্ধযুগে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালে জাপান এশিয়া ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য বিস্তার করে এবং প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সময় জাপান সরকার জাইবাৎসুর নিকট হতে আর্থিক সাহায্য পান। দেশে ভারী শিল্প-

(২) 'Big business, by its ties within the bureaucracy and by its financial influence on the political parties, came to have a growing voice in the formation of policy as well. To many Japanese it appeared that the tail was beginning to wag the dog.' Fairbank, তদেব। পৃ ৪০৫—৬

স্থাপনে এবং মাঞ্চুরিয়ার শিল্পোন্নয়নে জাইবাৎসু জাপান সরকারকে আর্থিক সহযোগিতা দান করে। অধিক পরিমাণে উৎপাদন-সুলভ নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য জাইবাৎসু জাপান সরকারকে আর্থিক সাহায্য দেয়। জাইবাৎসু যে কেবলমাত্র সরকারকে আর্থিক সাহায্য দেয়, তা নয়। দেশস্থ বিপন্ন যে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে সংকটমুক্ত করবার জন্য জাইবাৎসুগোষ্ঠীভুক্ত পরিবারবর্গ আর্থিক সাহায্যদানে কোন কার্পণ্য করত না। প্রয়োজনবোধে বিপন্ন প্রতিষ্ঠানের সংকটের অবসানকল্পে প্রতিষ্ঠানটির বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করে বিনিময়ে আর্থিক সাহায্য দিত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সুজুকি (Suzuki) ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হলে সেই সংকটের অবসানকল্পে মিৎসুইগোষ্ঠী সুজুকি সম্পত্তির বহুলাংশ ক্রয় ক'রে স্বীয় অধিকারভুক্ত করে। ব্যাংক, ইনসিওর‍্যান্স কোম্পানী, ট্রাষ্ট (Trust) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত ক'রে জাইবাৎসু দেশের অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জাইবাৎসুর দেশের সম্পদ ও রাজনীতির উপর প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তৎকালে জাপানে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী সংকটের কবলে প'ড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জাইবাৎসু একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পায়। তৎকালীন ডায়েটের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে রাজনৈতিক দলেরও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। জাইবাৎসুর সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নিকট-সংযোগ থাকায় সমসাময়িক রাজনীতির উপরও জাইবাৎসুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মেজী যুগের গোড়ার দিকে জাইবাৎসু ছিল সরকারের অনুগ্রহ-পুষ্ট কিন্তু ১৯২০র দশকের শেষের দিকে অর্থাৎ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জাইবাৎসু-গোষ্ঠী স্বীয় ইচ্ছানুরূপ সরকারকে পরিচালনা করবার ক্ষমতা অর্জন করে। প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণে জাইবাৎসু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তেমনি জাইবাৎসুর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখন এমন কোন শিল্প ছিল না যাতে জাইবাৎসুগোষ্ঠী মূলধন বিনিয়োগ করে নি। নানা-প্রকার শিল্পের উৎপাদনে লিপ্ত থেকে জাইবাৎসু জাপানের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করে। খনিজ-সম্পদ উত্তোলন, ধাতু, যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎশক্তি, জাহাজ-নির্মাণ, আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়, সুতিবস্ত্র প্রস্তুত, কাগজ, সিমেণ্ট, কাচ, কেমিক্যাল দ্রব্যাদি, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, বীমা ব্যবসায় ইত্যাদি বিবিধ অর্থনৈতিক প্রকল্পের সঙ্গে সংযোগ জাইবাৎসুগোষ্ঠীর জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান নির্ধারিত করে। তখন প্রতিটি অর্থনৈতিক উদ্যমে জাইবাৎসুগোষ্ঠী মূলধন বিনিয়োগ করে।

ফলে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জাইবাৎসুগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রাধীন ছিল দেশের তাম্র উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ, কয়লা উৎপাদনের অর্ধাংশ,

অর্ধেকেরও অধিক বাণিজ্য-জাহাজ, বৈদেশিক বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশ, প্রায় সমগ্র কাগজ উৎপাদন-শিল্প, ময়দা-পেষণ শিল্পের শতকরা ৭০ ভাগেরও অধিক, অপরিশোধিত তথা পরিশোধিত চিনি উৎপাদন শিল্পের প্রায় ৪০ শতাংশ, জাহাজ-বাহী মালের বৃহত্তর অংশ, আমদানী করা তেলের বৃহদংশ, এবং দেশের পণ্যাগারের ধারণ ক্ষমতার (Warehouse capacity) অর্ধাংশ।[৩] ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে জাপানের অর্থনীতিতে জাইবাৎসুর স্থান কিরূপ ছিল তা নীচের তালিকা থেকে বুঝতে পারা যায় :[৪]

শিল্প	চারটি বৃহৎ জাইবাৎসুর অংশ শতাংশ	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইবাৎসুর অংশ শতাংশ	অবশিষ্ট কোম্পানী সমূহের অংশ শতাংশ
ব্যাংক ও বীমা	৪৯.৭	৩.৩	৪৭.০
খনি	২৮.৩	২২.২	৪৯.৫
ধাতু	২৬.৪	১৫.৪	৫৮.২
যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম	৪৬.২	২১.৭	৩২.১
জাহাজ নির্মাণ	৫.০	৭.৫	৮৭.৫
কেমিক্যাল	৩১.৪	৭.১	৬১.৫
সুতিবস্ত্র	১৭.৪	১.৪	৮১.২
কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্য	২.৭	৭.৭	৮৯.৬
বিদ্যুৎ ও গ্যাস	০.৫	০.৭	৯৯.৫
স্থল পরিবহন	৪.৯	০.৬	৯৪.৪
জাহাজে আমদানি রপ্তানি	৬০.৮	৬.৭	৩৮.৬
দেশী ও বিদেশী ব্যবসা	১৩.৬	১০.৭	৭৯.৭

১৯৩৭ থেকে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ—এইকালে জাইবাৎসুর অর্থনৈতিক তৎপরতা এবং ভাগ্য-বিবর্তন।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ চলাকালীন (১৯৩৭-৪৫) জাইবাৎসুর প্রভাব-প্রতিপত্তি চরম শিখরে উন্নীত হয়। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে জাইবাৎসু ভারী শিল্পের উৎপাদনে তৎপর হয়, শিল্প নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে, এমন কি

(৩) Clyde and Beers, তদেব। পৃ ১৩৪

(৪) Encyclo. of Japan, তদেব Vol. 8 পৃ ৩৬৪

সম্ভাব্য বোমা নিক্ষেপের ফলে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় সরকারের নিকট হতে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিসূচক বীমা আদায় করে। সামরিক নেতৃবর্গ ক্ষমতাশালী জাইবাৎসু-গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হয়ে তাদের ক্ষমতার অংশ দিতে বাধ্য হয়। জাইবাৎসুকে সরিক না ক'রে সামরিক নেতাদের পক্ষে এককভাবে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ভোগ করা তখন অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই যুদ্ধকালীন জাপান থাকে যুগপদ সামরিক শক্তি তথা ধনী বণিক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রাধীন।

যুদ্ধকালীন জাপানে শিল্পাদি নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত নয় মিৎসুই, মিৎসুবিশি বা সুমিতোমোর উপর। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধকালে (১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে) সাংহাই-এর কিয়াং-নান (Kiang-Nan) নামক জাহাজ নির্মাণের কারখানার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত হয় মিৎসুবিশি ভারী শিল্প কোম্পানীর উপর (Mitsubishi Heavy Industries Company)। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে উক্ত মিৎসুবিশি কোম্পানীর উপর অর্পিত হয় শোনান (Shonan) জাহাজ নির্মাণের কারখানার তদারকি ভার। এইভাবে ১৯৪১—৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রথম সারির চারটি জাইবাৎসু গোষ্ঠীর জাপানের যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে গুরুত্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধকালীন রাজনীতিতেও জাইবাৎসুর প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কোইসো (Koiso) এবং সুজুকির (Suzuki) নেতৃত্বে গঠিত যুদ্ধকালীন সর্বশেষ মন্ত্রীসভার উপর জাইবাৎসু প্রতিনিধিদের বিশিষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধোত্তর জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী য়োশিদা শিগেরুর (Yoshida Shigeru) সুচিন্তিত মতে, আধুনিক জাপান তার শ্রীবৃদ্ধির জন্য মিৎসুই ও মিৎসুবিশির নেতৃবৃন্দের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনি এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে এই সব অর্থনৈতিক নেতাদের 'এক গুচ্ছ অপরাধী' হিসাবে চিহ্নিত করলে গুরুতর ভুল করা হবে।[৫]

(৫) Mr Yoshida, four-time Prime Minister of post-war Japan and a master politician, wrote in his memoirs of a press conference he held shortly after the start of the Occupation : ...I was confronted with a kind of questions one might expect. The general purport was that since the financiers had been behind the war, the strictest measures should be taken against them. I answered that it would be a great mistake to regard Japan's financial leaders as a bunch of criminals, that the nation's economic structure had been built by such old established and major financial concerns as Mitsui and Mitsubishi, and that modern Japan owed her prosperity to their endeavours, so that it was most doubtful whether the Japanese people would benefit from the disintegration of these concerns.

Japan Reader, ঐদেব, Vol I, পৃ. ৪৫৪—৫৫

মোটকথা, যুদ্ধকালে জাইবাৎসু গোষ্ঠী ভারীশিল্প উৎপাদনে অগ্রণী না হলে এবং সরকারের যুদ্ধকালীন ব্যয় সাধ্যমত নির্বাহে অগ্রসর না হলে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই জাপানকে ম্যাকার্থার সমীপে আত্মসমর্পণ করতে হত। যুদ্ধকালে জাইবাৎসু দুইভাবে জাপান সরকারের সহযোগিতা করে প্রথমতঃ, সরকারের যুদ্ধকালীন অর্থনীতি নির্ধারণ ক'রে এবং দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধোপযোগী সাজসরঞ্জাম উৎপাদন ক'রে। আমেরিকার চক্ষে জাইবাৎসুর এ হেন সহযোগিতা অপরাধমূলক হলেও জাপানী জাতির পক্ষে এই সহযোগিতা ছিল অতীব কল্যাণমূলক।

যুদ্ধশেষে ১৯৪৫ থেকে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপান আমেরিকার শাসনাধীন থাকে। এই সময় মার্কিণ জেনারেল ম্যাকার্থার জাইবাৎসু গোষ্ঠীগুলি বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে সকলপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং সাময়িকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সফল হন। কিন্তু সামরিক শাসন অবসানের পর জাইবাৎসু গোষ্ঠীগুলি পুনর্জীবন লাভের জন্য সচেষ্ট হয় এবং কিছুটা সাফল্যও অর্জন করে।

জাইবাৎসু প্রথার ফলাফল :

জাপানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারার উপর জাইবাৎসুর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যণীয়।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া : জাইবাৎসু পদ্ধতি ছিল অগণতান্ত্রিক, এই অর্থে যে পদ্ধতিটি ছিল প্রভুত্ব-তথা আনুগত্য-ভিত্তিক। নেতৃস্থানীয় পরিবারের প্রভুত্ব স্বীকার এবং সেই পরিবারের প্রতি আনুগত্যপ্রদর্শন—জাইবাৎসুর এই দুইটি বৈশিষ্ট্য গণতন্ত্র-সুলভ নয়। বরং বলা যেতে পারে যে জাইবাৎসু পদ্ধতির কাঠামো ছিল আমলাতান্ত্রিক। জাইবাৎসুর অর্থ-সাহায্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে সামরিকতন্ত্র প্রশ্রয় পায়।

সামাজিক প্রতিক্রিয়া : মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার-গোষ্ঠীর হস্তে দেশের সম্পদের বহুলাংশ কেন্দ্রীভূত হওয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবে বাধার সৃষ্টি হয়, এরূপ ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। যাঁরা এরূপ ধারণার সমর্থক তাঁদের যুক্তি এই যে জাইবাৎসু প্রথায় বিত্তই ছিল শ্রেণীবিভাগের মাপকাঠি কিন্তু সাধারণ অর্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিত্তশালী না হওয়ায় বিত্তহীন শ্রেণী জাইবাৎসু সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসাবে স্বীকৃতি পাই নি। কিন্তু জাইবাৎসু যুগে সাধারণ অর্থে কোন কোন শ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসাবে গণ্য হত, যথা চাকুরীজীবী, জমির মালিক, আমলাতান্ত্রিক ইত্যাদি, যদিও এই জাতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষ বিত্ত-সামর্থ ছিল না।

অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া :

মুষ্টিমেয় জাইবাৎসু পরিবারগুলি দেশের সম্পদের বৃহত্তম অংশ করায়ত্ত

করে। ফলে জাইবাৎসু পরিবারগুলির নীট অর্থনৈতিক লাভ হয়। পরিবারগুলি ছিল সংখ্যায় অল্প। পরিবারের সভ্যদের জীবনযাত্রা ছিল সরল ও ব্যয়-বহুল্য বর্জ্জিত। সুতরাং তাদের ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনফার সিংহভাগই সঞ্চিত হত এবং সেই সঞ্চয় ব্যবসায়ে পুনর্নিয়োজিত হত। এতে ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ঘটত এবং পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনৈতিক লাভ ব্যতীত লোকসান হত না। ব্যবসায় থেকে যে পরিমাণ লাভ হত তার বেশীর ভাগই নূতন নূতন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হত, যার ফলশ্রুতি ছিল বর্ধিত মূলধন গঠন। এইভাবে জাইবাৎসু পরিবারগুলি বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করত। ফলে ক্রমশঃ দেশে বিভিন্ন ধরণের একাধিক ব্যবসায়-সংস্থা গড়ে উঠত এবং একটিমাত্র বৃহৎ কোম্পানীর পরিবর্তে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন কোম্পানী বা কম্বাইন (Combine) গঠিত হত। এই সমস্ত কোম্পানী বা কম্বাইন যৌথ কারবারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করত। এই সমস্ত কোম্পানীর কর্মতৎপরতায় দেশের মধ্যে দক্ষ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কর্মী হিসাবে বিভিন্ন ব্যবসায়ে যোগদান করত। যোগদানের পর নবনিযুক্ত কর্মীদের ব্যবসায়-সংক্রান্ত শিক্ষা দিয়ে পারদর্শী ক'রে তোলা হত। এইসব নিপুণ অথচ অনুগত কর্মীরা ব্যবসায়ে বহুমুখী উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করত।

জাইবাৎসু প্রথার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার দিকে। এ হেন একচেটিয়া অধিকার ব্যবসায়ে নিশ্চলতা বা গতিহীনতা আমন্ত্রণ করে। তাই একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের দিকে জাইবাৎসুর প্রবণতা ব্যবসায়ের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয় না। কিন্তু জাপানকে বিদেশ থেকে শিল্প-সংক্রান্ত বহুবিধ দ্রব্য আমদানি করতে হত, যেমন তুলা, রেশম, পশম, রবার, এলুমিনিয়াম, লৌহ, সীসা, দস্তা, টিন, পেট্রোলিয়াম, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি। এই সমস্ত আমদানির বিস্তৃত আয়োজন একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের প্রবণতাকে অনেকাংশে দমিয়ে রাখে। জাইবাৎসু ব্যবসায়ে বৈদেশিক আমদানির তথা বৈদেশিক বাজারের বিশিষ্ট গুরুত্ব থাকায় দ্রব্যাদির মূল্য অতীব প্রতিযোগিতা-মূলক হয়। কার্যতঃ জাইবাৎসু প্রথার ফলে জাপানের অর্থনীতিতে এক-চেটিয়া অধিকার (Monopoly) প্রতিষ্ঠিত হয় নি, প্রতিষ্ঠিত হয় 'অলিগোপলি' (Oligopoly) বা একই শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর একাধিক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ-স্থাপন। শিল্পদ্রব্যের উপর এরূপ নিয়ন্ত্রণকে অর্ধ-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বলা যেতে পারে। জাইবাৎসু যুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ছিল অলিগার্কি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি 'অলিগোপলি।'

জাইবাৎসুগোষ্ঠীর শ্রমিকশ্রেণীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই প্রথায় শ্রমিকশ্রেণীর অভাব অভিযোগ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হত। সেই কারণে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে নি। আরও কিছু কারণে ট্রেড

ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠে নি, যথা কারখানায় মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য, দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে শিল্পোৎপাদনের কারখানাগুলির অবস্থান, শ্রমিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার অভাব, এবং দেশে কলকারখানা ও শ্রমিক-সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ আইনের অভাব। সর্বোপরি, শ্রমিক আন্দোলন দমনে জাইবাৎসু-গোষ্ঠীর সম্মিলিত তৎপরতা আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে।

অনেক অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে জাইবাৎসু পদ্ধতি যথেষ্ট নিপুণ ছিল এবং শোগুন শাসনাবসানের পরবর্তী যুগে এই পদ্ধতির অভ্যুদয় ছিল অনিবার্য। যখন কোন অনগ্রসর দেশ শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতি গ্রহণ করে তখন সে দেশের আশু প্রয়োজন হয় মূলধন, দক্ষ শ্রম এবং প্রযুক্তিবিদ্যা। মেজীযুগের গোড়ার দিকে জাপানে এ সবের অভাব ছিল। জাপান তখন সমাজতান্ত্রিক দেশ ছিল না—বর্তমানেও নয়। দেশে তখন অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়ের দিকে প্রবণতা ছিল প্রবল। এরূপ পরিস্থিতিতে মূলধন ইত্যাদির অভাব মেটাবার দায়িত্ব স্বাভাবিক কারণেই এসে পড়ে দেশের উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের উপর। জাইবাৎসু পরিবারগুলি ছিল এরূপ উদ্যোগী ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী, যারা জাপানী সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সার্থক ক'রে তুলবার গুরু দায়িত্ব বহনে ব্যক্তিগতভাবে সোৎসাহে অগ্রসর হয়। সরকারের পক্ষে জাইবাৎসু-গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ না করে উপায়ান্তর ছিল না। তাই জাইবাৎসুর উদ্ভব হয় অনিবার্য।